

১৫৭৮

কোষের পরিচয়

- কাঠ্যব্দ চট্টোপাধ্যায়

আব্দ ১৩৩২

বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটা আলমারি,—একটা বইয়ের, অল্পটা কাপড়-জামা পোষাকে পরিপূর্ণ। একটা দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেয়ালের ঘড়িটাও নেহাৎ কম মূল্যের নয়,—এমন, আরও কত-কি সৌধীন ছোট খাটো টুকি টাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ী-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজ-সরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুখাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্কনের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা বাছা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকি সমস্ত দিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গও-গোলে তাহাদের সাধনার বিষ ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নিচের ক্লাসের। পূর্বে চাকুরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায়না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাংসাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নান খুঁজিয়া নেননা। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলো যে কি করে কাহাকেও বলেনা। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাঠ করিয়াছে কেহ জানেনা, প্রশ্ন করিলে এমন একটা আব দারণ করে যে সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত বা-কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোট মোট বাছা বাছা বই। কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণ-

চোরা মহানহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক-তরঙ্গ প্রবাহের জ্ঞান মার্কোনির অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয়না। কম্বিনেন্টাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কর্ণস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোন্‌খানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর এ সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতোই প্রকাশ করে। ব্যার-ওয়ারের সেনাপতি কে-কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্ত রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল এ সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভাস' কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড ষ্টাণ্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কেরেন্সি আদ্যমতে কত টাকা থাকা উচিত এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি নিউটনের সহিত আইন্‌স্টাইনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধেনা। শুনিয়া কেহ-কেহ হাসে, কেহ বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে রাখাল পরোপকারী। মাঝে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয়না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অব্যাহত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়েনা। বে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মধ্যে অনুবোধ করিয়া বলেন, রাখাল এ তোমার ভারি অত্যাচার, এইবার একটা বিয়ে-খা কোরে সংসারী হও। কত কাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে আর যা বলেন, বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেননা। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটেনা। যাহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা হুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুন্বে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগ্লামি সারে কি না যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাজ্জী দেখে নাই। কেহ বলে নাই রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি তোমাকে রাজী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে বাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে। তাই তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে। তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশিতে প্রলুব্ধ হয়না। এক ধরণের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার এখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচানো কাপড়টা পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিন্ধের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করি। এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম পরামর্শ? না? কোথাও বেরুচ্চো না কি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকিবো।

না সে হবেনা। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বোসো।

না হে না—তার যো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাহলে পরামর্শ

শেষের পরিচয়

থাক্‌লো। কাল সকালে আমি অনেক দূরে গিয়ে পড়বো। হয়ত আর কখনো,—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইলনা।

রাখাল ধপ্‌ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে ?

তার মানে আমি একটা চাক্রি পেয়েছি। বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নূতন ইন্সুলের হেড্‌মাষ্টারি।

প্রাইমারি ?

না, হাই-ইন্সুল।

হাই-ইন্সুল ? ম্যাট্রিক ? মাইনে ?

লিখ্‌তে তো নব্বই টাকা। আর একটা ছোট-খাটো বাড়ী—থাক্‌বার জন্তে অমনি দেবে।

রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাসা করেছে। এ তো একশ টাকার ওপরে গেলো হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলেনা ?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায় ?

না চায়না ! একশো টাকার যমের বাড়ী যেতে চায় এ তো বর্দ্ধমান ! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগ্‌লামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে। দেখা যাবে কে লিখেচে আর কি লিখেচে। এটা বুঝ্‌চোনা যে একশো টাকা ! অজানা—অচেনা—হ্যৎ ! আপলিকে-শনের জবাব তো ? ও ঢের জানি, হাড়ে যুগ ধরে গেছে। হ্যৎ ! চল্লুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে বাই হোক রাত্রে গাড়ীতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হোলোনা বুঝি?
তারক ইহার জবাব দিলনা, কহিল,—অথচ, এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে
যে দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা' হয়না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি বড়দিনের ছুটিতে হয়ত আবার
দেখা হবে। ততদিন—

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙুটি খুলিয়া
টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে
আমি কুড়িটা টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল-না—এ কি তার বন্ধক না কি? বলিতে বলিতে
রাখাল ছৌ মারিয়া আঙুটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা
দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,
আরে না না বন্ধক নয়,—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবেনা,—
এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিষে
বাবো, এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল,
দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পোনের মিনিট হয়ে গেছে, এবার
তোমার ছুটি। নাও, পোষাক টোষাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে স্নান হইয়া
গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়
পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোল-গাল, গৌরবর্ণ,
তাহার পরিপুষ্ট মুখের পরে একটা সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—
মাহুষটি যে সত্যি ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মানা, কিন্তু তারকের
হারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রঙটা প্রায়

কালোর ধার ঘেসিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধহয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু ননে হয় যেন নির্ভর করা চলে। স্তূখে দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ আটাশ, রাখালের চেয়ে দুই-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বল্চি তোমার বাওয়া উচিত নয়।

কেন ?

কেন আবার কি ? একটা হাই-ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা ! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাশ করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে যুনিভারসিটির ছাপ ছোপের বিবরণ। সে সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়বার ভার আমার, কিন্তু পাশ করার ণয় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বল্লে হয়না হে হয়না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো ভূমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু কুরোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বল্চি। ছাপ-ছোপ আছে, কিন্তু পড়া-শুনা করিনি। তার সময় পেলাম কই ? পড়া-মুখস্তর পালা সাক্ষ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে,—কাটলো বছর দু'তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে পরতে পাচ্ছি।

ত্যাগে তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ, আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই কিরিয়া চাহিয়া দেখিল একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়ত যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়েনা। বর্ণ অত্যন্ত গোর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বদা বেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরণে গরদের শাড়ী, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চার খানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধ বিষ্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাকাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহেনা।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিন্তে পারিনি মা।

না পারবারই তো কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙা আঁচলের পাড় ভিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলতো এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বলিলেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুযো। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বলিলেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রাখাল বলিল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেকেনা। ও আজই চলে যেতে চাচ্ছে বন্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে,—ইস্কুলের হেড-মাষ্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম-এ, পাশ করেছেো বখন, তখন মাষ্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায়না। বলুন তো অত্মায়।

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্তে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অত্মায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্ছেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অত্মায় হোলো। রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট্ট একটুখানি রাজু, আর আমারই অদৃষ্টে এসে জুটলো এক উটকো বাবু? ভার সইবেনা নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সঙ্কতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইলনা, তাঁহার সম্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষন্নতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদলাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়ীতে কি তুমি বড়-একটা যাওনা?

যাই বই কি নতুন-মা। তবে, নানা ঝগড়াতে দিন পনেরো কুড়ি—

রেণুর বিয়ে,—জানো?

কই না! কে বললে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন ?

হওয়া অসম্ভব বলে । বরের পিতামহ পাগল হ'য়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভালো । হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো ।

কি সর্বনাশ ! কর্তা কি এ সব খোঁজ করেননি ?

রমণী কহিলেন, জানেই ত কর্তাকে । ছেলেটি রূপবান, লেখা-পড়া করেছে, তাছাড়া ওদের অনেক টাকা । ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা' বলেছে তিনি বিশ্বাস করেছেন । আর জান্লেই বা কি ? সমস্ত শুনেও হয়ত শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারবেননা এতে ভয়ের কি আছে !

রাখাল বিষম-মুখে কহিল, তবেই তো !

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসাহ কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—তবেই তো মানে ? বাধা দেবার চেষ্টা করবেনা, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে ? এত বড় ভীষণ অন্তায় ?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই ? আর কর্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন ?

তারক বলিল, কেন হবেনা ? বরের বাড়ীর মত মেয়ের বাড়ীরও কি সবাই পাগল যে বল্লেও শুনবেনা,—বিয়ে দেবেই ?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে ! এটা ভুল্চো কেন ?

হলোই বা গায়ে-হলুদ ! মেয়েকে তো জ্যাস্ত চিতায় ভুলে দেওয়া যায়না ! বলিয়াই তাহার চোখ পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন । লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শাস্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এ'রা কে, হয়ত কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু সূনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্তব্য । কোন মতেই এ ঘটতে দেওয়া চলেনা ।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎ-মা তো?
তার আপত্তি করার কি অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া
কহিলেন, তোমাকে তাহলে একবার বাগবাঁজারে নেতে হবে, ছেলের
নামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের
ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ
হবে; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি
এগারোটার পরে আবার আসবো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি
উঠিয়া দাড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে
যে রেগুর আর বিয়ে হবেনা নতুন-মা। জানা-জানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিলনা, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিতরে প্রণাম
করিল। তাহার দেখা-দেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া
নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া
দাড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়ত আমার উচিত নয় কিন্তু
তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেওনা। এই
আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিলনা।
কিন্তু এ জন্ত তিনি অপেক্ষাও করিলেননা, বাহির-হইয়া গেলেন। রাখাল
জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু
গলির বাঁকের কাছে দরওয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল
সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমান?

না। তুমি কি করো দেখ্‌বো,—স্বৈচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেবলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনিগে,—কি বলো?

রাজি।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয়না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পরে আলো জালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা-চার-পাঁচ দিন আগে একবেলার কলেরায় মায়া গেছেন, সবাই বল্লে বাবুদের মেজ মেয়ে সবিতা বাপের বাড়ীতে পূজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্তরে গিয়ে উপস্থিত হোঙ্গে। তিনি পৈইটের একধারে বসে কুলোয় কোরে তিল বাছছিলেন, সরকার বল্লে, মেজ-মা, ইটি বাবুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে তাকে

চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ নারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করে এলো, বল্লেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বল্লুম, মাসী আছে কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বল্লুম পুরুত মশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেস করলেননা। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকায় পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বল্লেন, তোমার নাম কি বাবা? বল্লুম রাজু, ভালো নাম রাখালরাজ। বল্লেন, তুমি যাবে বাবা আমার সঙ্গে আমার ঋণুরবাড়ীর দেশে? সেখানে ভালো ইন্সুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবেনা। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হোলোনা, সরকার মশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো, বল্লে, যাবে না, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এত বড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গায়ে আর কেউ নেই মা,—মা দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চির-সুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃ শ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পূজো দুই-ই শেষ হলো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা ক'রে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামী-গৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বল্লুম নতুন-মা। ঋণুর শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সঙ্কল, ধনী বল্লেও চলে। এ বাড়ীর শুধু তো তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মামুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি,—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে

নিলেন। দেশে জমি-জমা চাষ-বাসও ছিল, দু-একখানি ছোট-খাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়ীতে, তখন দিনের অধিকটা কাটতো তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আত্মিকে, জপ তপে।

আমি ইস্কুলে ভর্তি হোলাম। বই, খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এসো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাষ্টার নিযুক্ত হলো, যেন আমি এ-বাড়ীরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-স্বথের দিন আর ফিরবেনা। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন চিপ্-চিপ্ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তারপরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন সমস্ত উন্টে-পাল্টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে চুরতে কোথাও কিছু আর বাকি রইলনা। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলনা, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলিনি। আর, বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

‘চাহিয়া দেখিল তারকের মুখে অপরিণীত কোতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিলনা। রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে

আমার নতুন মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যি তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়ত তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা,—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তারপরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ঔঁদের কলকাতার আশ্রয় প্রায়ই বাড়ীতে আসতেন। কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসতো তেল-মাখাবার খানসামা, তামাক মাজবার ভূতা, ট্রেনে খবরদারি করবার দরওয়ান,—আর, নানা রকমের কত-ধেঁ ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্কিং উপলক্ষে উপহারের পরিমাণ থাকতোনা। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার স্বেচ্ছা। শুধু কোম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধকরি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়ীতে আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি প্রকার সন্দেহ করতে লাগলো। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, উন্টে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এ পিসতুতো বোনকে যেতে হোলো তার খুশুরবাড়ী। শুনেচি, এমনিই নাবি হয়ে থাকে,—এই হোলো ছনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তাছাড়া, এইমাত্র তেঁ গুর নিজের মুখেই শুনতে পেলো কর্তার মতো সরল-চিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে। ছি।

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহ-কোণে। বাদেব সবচেয়ে বড় কোরে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন মা-ই নিজেকে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন ‘বাবে বাবা আমার কাছে?’ বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসি রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সাই দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিলো তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপা-গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙে ঘরের বাইরে এসে দেখি স্নমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শিকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ ছয় লঠন। বারান্দার একধারে বসে শুদ্ধ-অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু,—কর্তার গুড়তুতো ছোট ভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিন কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাক্‌চেন,—রমণী বাবু, দোর খুলুন। বরটা আনরা দেখবো। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হোলো বাড়ীতে এসে বসেছেন।

বাড়ীর মেয়েরা বারান্দার আশে পাশে দাঁড়িয়ে, মনে হলো চাকররা কাছাকাছি কোথাও যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে;—ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাণ্ডর পেলামনা কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি স্তব্ধ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বদ্বিগ্ন ঘেমে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার বনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম, কিন্তু তা’ আর হোলোনা। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে মতুন-মা বেরিয়ে এলেন।

বল্লেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়োনা, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ী থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রপাত হয়ে গেল। এ কি সত্যসত্যই এ বাড়ীর নতুন-না! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়ীশুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় নয়ে গেল। যে যেখানে ছিল সেইখানেই শুক্ন হয়ে দাঁড়িয়ে,—তাঁরা সদর দরজা বখন পার হয়ে যান, কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউ হাউ ক’রে কেঁদে উঠে বল্লেন, নতুন-বোঁ, তোমার রেগু রইলো যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাবো!

নতুন-না একটা কথাও বল্লেননা, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেগু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হ’য়েছে তার ষোল। এই তেরো বছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেরেকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্তে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক,—নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটা বছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেননি। এবং শুধু মেয়েই নয় খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাইতো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছো এমন ব্যাপার?

না, শুনিনি, কিন্তু বইতে পড়েছি। একখানা ইংরিজি উপন্যাসের আভাস পাচ্ছি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেননা আর তার মতো হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপুত হইলনা, বরঞ্চ

মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এরপরে দেশে থাকা আর চল্‌লোনা। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে আবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এইখানেই আছেন।

আর তুমি ?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসিমা তাড়াবার সুপারিশ করে বল্লেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল,—ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার মেহের পাত্র ব'লে আমার 'পরে পিসিমা সদয় ছিলেননা।

ব্রজবাবু শান্ত নাহুয, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুদ্ধ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বল্লেন, ওই তো তার রোগ ছিল পিসিমা। আপদ-বালাই তো আর একটি জুটোয়নি,—কেবল ও-বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে ?

পিসিমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরণো,—সে বোধহয় আর মনে নেই। বল্লেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে না কি ? না না, ও বেখানের মার্জুষ সেখানে থাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুদ্ধক। নিজেদের বংশ-পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, তিনি, ও ছেলেনাহুয, শুছিয়ে তেমন বলতে পারবেনা পিসিমা, তার বন্ধু তুমি অগ্র ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসিমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা' ভালো বোঝো বাছা কোরো, আমি আর কিছুই মধ্যেই নেই।

নতুন-মা যাবার পরে এ বাড়ীতে পিসিমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েছে। এতকালের লক্ষী-শ্রী তো যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুণ যে কারবারের

লোকসান তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কই এমন মতি বুদ্ধি তো নবীনের আগে হয়নি! পিসিমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এসব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে। হ'য়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়ীতেই কি তুমি থাকতে ?

হাঁ, প্রায় বছর দশেক।

চলে এলে কেন ?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হলনা।

তার বেশি আর বলতে চাওনা ?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিলনা, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুন-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি ? যাবেনা একবার ব্রজবাবুর ওখানে ?

সেই কথাই ভাব্‌চি। না হয় কাল—

কাল ? কিন্তু, তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বল্বে ?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে ? বলতে চাও তিনি আসবেননা ?

তাই তো মনে হয়। অন্ততঃ, অত রাত্রে আসতে পারা সম্ভবপন্থী মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না

হলে তিনি কিছুতে বলতেননা। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবেনা।

কেন ?

কেন কি ? তাঁর এতবড় দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য কোরে তুমি একটা পা-ও বাড়াওনি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন মুখে ? না, সে হবেনা রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবেনা তারক। আমার কথা ও-বাড়ীর কেউ কানেও তুলবেনা।

তার কারণ ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক নামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক নামা বিদ্যমান। ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড়-কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ, সে-মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসিমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, কিন্তু এঁর চোখের একটা ইসারার খাঙ্কা সামলানো গেলনা, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হোলো। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ,—ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসৎ পেলে অবলা সবলা নির্বিশিষ্টে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি,—বক্শিশের আশা করিনে—সে সব ভাগ্যবানদের জন্তে। নিজের কপালের দোড় ভাল কোরেই জেনে রেখেচি,—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটেনা, কিন্তু তাই ব'লে মল্লভূমি ঘেঁসে দাড়িয়ে মামায়-মামায় কুন্তি লাড়িয়ে তার বেগ সম্বরণ করতে পারবোনা।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাৰ-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্ল যুদ্ধ বাধ্বে কেন ?

রাখাল কহিল, তাহলে একটু খুলে বলতে হয়। মামা মশায় আমাকে বাড়ীটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেননি, কাজেই অল্প-স্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল ভগিনীপতির কতাদায়ে স্থালকের আরামেই বেশি বিদ্ব ঘটাচ্ছে,—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবেনা, এবং সম্ভবতঃ, কাউকে দিয়েই না। পাকাদেখা, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কত্কার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে; এবং তারপরে ঘটনাটা মুখে-মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবেনা। এবং, তার অবশুস্তাবী ফল ও মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবেনা।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্য্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ তো আজও বেঁচে আছেন ?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলোনা একবার বাই বাপটা একেবারেই নরেকে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকি আছে দেখে আসিগে।

তুমি যাবে ?

ক্ষতি কি ? বলবে ইনি পাত্তের প্রতিবেশী,—অনেক কিছুই জানেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্য নয়, দ্বিতীয়তঃ, জেরার দাপটে তোমার গোলমালে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি

পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা বশে ভাঙ্টি দিতে এসেচো। তাতে কার্য্যসিদ্ধি তো হবেইনা, বরঞ্চ, উন্টো ফল দাঁড়াবে।

তাই তো। তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বৃদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠক্তে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশি খবর নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিষয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই নামাটিকে একবার চোখে দেখেও আস্তো পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়ত দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ, অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল ?

রাখাল কহিল, বেশ ফর্সা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই গুঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি ?

মানুষটি তো বাঙালী-ঘরের মেয়ে। স্নতরাং, তাঁদেরই আরও নশজনের মতো। কাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরতঃসকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান, এবং পরকণ্ঠেই সমস্ত বিশ্বরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয়না। অল্প-স্বল্প কুদ্রতা, ছোট খাটো উদারতা, একটু আধটু—

তারক বাধা দিল,—থামো থামো। এসব কি তুমি ব্রজবাবুর জীৱ উদ্দেশ্যেই শুধু বোল্চো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা' মূখে আস্চে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোনটা ?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই দুটোই। শুধু তাৎপর্য গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচি সাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে-মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতামনা। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখাল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। গুঁরা ডাকলেই ছুটে বাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অল্পগ্রহও করেন বখেষ্টে, তাঁদের নিন্দে করতে পারবোনা।

তারক বলিল, অল্পগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাওতো শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেল্লে মুদ্রিলে। জেরা করলেই আমি বাবড়ে উঠি। এ বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ পরিচয়ও ব্যর্থ কম নেই, কিন্তু এমনি বিশী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকেনা। না তাঁদের বাইরের চেহারা না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এলেই সব চেহারা লেপে মুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্নের প্রভেদ ঠাউরে পাইনে।

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয় প্রতিবেশীর ঘরের ছ'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিওনে, জানিওনে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের এই তো জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড সহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া ধামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা কোরোনা তারক, আমি হৃদয় বাৎসে দেব। পাড়ারগায়ের বলে যাদের অবজ্ঞা কোরচ কিম্বা মনে মনে যাদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো তাঁদেরকেই সহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস দুই খানকয়েক বাছা

বাছা নাটক-নভেল এবং সেই সঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—বাস্! ইংরিজি জানে না? না জাহুক, আগাগোড়া বলতে হয়না, গোটাকুড়ি ভব্য কথা মুখস্থ করতে পারবে ত? তা' হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল,—তারপরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটার যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক তোমার কিছুই যায় আসেনা। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সেকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলা-মেশাটা একটু কম করো,—যা' হারিয়েছে তা' হয়ত একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এই জন্তেই নতুন-মার অমুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হোলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়ত কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশি। এখন থেকে তোমার কথা শুনো। কিন্তু বীদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে,—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরানব্বই। তার মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকি রইলেন তিনিই উনি। খুঁটকে অবহেলা করা যায়না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্তে আজ তুমি বর্ধমানের যেতে পারচোনা সে তুমি জানানো কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলে-ঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গল্পেরে তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি। গুর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিল তারক

অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক,—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিজ্রপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশি জানি এটুকু দাবী করলে রাগ কোরোনা রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই,—এ থাক্। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্য্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওর নাগাল পাবোনা রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকি ন'শ-নিরানব্বু ইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা ঝাঁটিয়ে যদি চলে যেতে পারি তাতেই আমাদের মত সামান্য মানুষে ধন্ত হয়ে বাবে।

রাখাল তর্ক করিলনা,—জবাব দিলনা। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে বাবে ?

চলো।

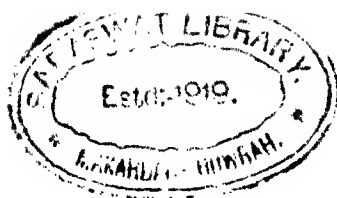
গিয়ে কি বলবে ?

মোটের ওপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তহুত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা! অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবেনা। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।



৩

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি তই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের-জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চাম্চে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো ?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস ক'রে মা দুর্গাকে তুগি থাগোকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হলো,—নইলে হোতোনা।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ী ছিলেননা, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল-সকাল আহালাদি সারিয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটার মধ্যে দেখা করিতে গেলে সে যে এখনো তাঁহাদের ননে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং ফিরিবার সময়ে অস্ত্রের চোপের অন্তরালে রেণুও কাছে আসিয়া মৃদুভাবে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

—তোমার বাবাকে বলতে ভুলোনা যে আগি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

—আচ্ছা। কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো এক-টুকরা কাগজ; তাহাতে

পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হোলোনা, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু, এখনো তা'র মিনিট কুড়ি বাকি। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে চালো। তাঁর আসবার আগে এ সমস্ত পরিকার করে ফেলা চাই।

কেন? মাছুষে চা খায় এ কি তিনি জানেননা?

ছাথো রাখাল, তর্ক কোরোনা। মাছুষে মাছুষের অনেক-কিছু জানে, তবু, তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয়না। তা ছাড়া এ গুলোই বা কি? এই বলিয়া সে অ্যাষ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ ক'রে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল,—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অল্পভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু, আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মাছুষ কোরে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্ধ্য হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিলনা, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা টালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপ্‌চাপ্‌ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শো নিরানব্বুয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখছি ভাই, এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা অলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চূপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-না অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি-বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। বাদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাম্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইলনা।

—রাজু, আসতে পারি বাবা ?

উভয়েই সসন্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আনুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সেও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সব দিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল; কাকাবাবু বাড়ী নেই, মানাবাবু গুরু-ভোজনে অস্থিত এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল; কিন্তু এর জন্তে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্তে আমি ভৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটা খুলিয়া বলিল। নতুন-মা হাসি-মুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করেনা ?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম আজ বোধ হয় কিছু আর হবেনা।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার সঙ্গেই দেখা হোলোনা ?

রাখাল কহিল, তা' হয়েছে না। বাড়ীর গিন্নী আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো। আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যে-ই বলতে ভুলুক, সে ভুলবেনা।

তোমরা আজ আবার বাবে ?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে ?

তা' আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু ?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, প্রশ্নটি তো শুধু বাহ্যিক নয়, মা,—হোলো অস্তায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না ? তবে রঙটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার বেঁধে গেছে ;—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলেনা। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা ?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল ; দেয়ালের ঘড়ির দিকে এক মুহূর্ত্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয়-যদি এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন নন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গল-নয় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহার গ্রহণ করিয়াছে, সে কেনন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিলনা, কিন্তু, এই যে রাখাল বর্ণনা করিলনা, শুধু অল্পবোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ইঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ ননের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন নায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিশ্বয়ের সীমা রহিলনা।

নতুন-নার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁং নাই তা' নয়, স্নমুখের দাঁত দুটি উঁচু, তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার নতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী নাথনের সহিত কোন মতেই তুলনা করা চলেনা। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব; কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে স্নমমা ধরেনা। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন নর্যাদায় এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সব চেয়ে চোখে পড়ে নতুন-নার আশ্চর্য্য কর্তৃস্বর। নাধুর্য্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক্ ভাজিল নতুন-নার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে কথা তো বলা যায়না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন নানাবাবুর চোখে, শোনেন গিল্লীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই কোরেছেন।

কর্তা তবে কি করেন ?

যা' চিরদিন করতেন,—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে বাবারও বড় সময় পাননা। তাঁকুর-ঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয় আশয়, কারবার, বর-সংসার দেখে কে ?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আনাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আনরা আজও বাবো সতি, কিন্তু তার নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বোধহয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে-যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি কি রাজুবাবুর ঘর ?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না নশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাঁকেই খুঁজ্ছি, এই বলিয়া এক প্রোড় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো ? বাঃ—এই তো হে ! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ হাস্তে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবোনা। বাঃ—দিব্য ঘরটিতো।

হঠাৎ শেল্ফের ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হাঁটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া

দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না ? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার গর্ভস্থ দৃশ্য বিহ্যদ্বয়ে রাখালের মনঃক্ষেপ ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মতো ক্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিলনা, তথাপি অজানা ভয়ে সেও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন,—তোমরা করছিলে কি ? ষড়যন্ত্র ? গুণির আড্ডায় কনেষ্টবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠেনা। খয়েছে কি ? নতুন-বৌ ত ?

মহিলা চোঁকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বোসো, বোসো। ভালো আছো ? বলিয়া তিনি নিভেহ যন্ত্রণার হইয়া চোঁকি টানিয়া উপবেশন করিলেন ; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় তাড়লে আমি চিন্তে পারামাত্র তোমাকে বুকে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরের জিনিসপত্র আর থাকবেনা, ভেঙে ভেঙে হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এককণ্ঠে নিঃশব্দেই বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিলনা।

ব্রজ বাবু অহরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকোনা নতুন-বৌ, বোসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরণ্ড রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখা-পড়া করছে,—আমাদের জানা-ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কল্যাণতা

সহরেই খান চারেক বাড়ী আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয়তো সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বো, সাধিা ছিলনা নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা! এই বলিয়া তিনি ডানহাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কস্তার সুখ-সৌভাগ্যের হুনিশিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিকৃত প্রস্তাবে এই মায়া-জাল তাঁহারই চক্ষুর সম্মুখে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইলনা।

এজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে তো আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায়না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কণ্ঠাবেই বা কে? কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর মুখে যখন খবর পেলাম যাকু এসেছিলো, কিন্তু দেখা হয়নি,—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির কোরলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবেনা—যেমন কোরে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ একটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুর বেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু, কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলান মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

শেষে বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কস্তার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। যেহেতু যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বকালে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় নামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে ?

কেন বলো ত ?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়ত—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। বাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বোয়েরও ভাই হন; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সহিতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কি না।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই, এ লোভটা সে সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেননি নিশ্চয়ই ?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কই না। অভ্যাস মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়ত তাঁকেই ডেকে থাকবো।

তারক কহিল, তাতেই বাত্মা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে সুধু-হাতে ফিরতে হতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কল্যাণের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না গেল

আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ, বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়ত এ রকম দুর্ভোগ এর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাভীর্ষো মুখখানা অতিশয় ভারি করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখালরাজ হয়,—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানেনা। আমিও একজন রীতিমত ভুক্তভোগী। ‘ফুট-কড়াই’ নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল ; রাখাল সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোন। ব্রজবিহারী বলে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভুগ্‌তামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কক ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

ব’লাই, কলাই খেয়ো না—

জানালা ভেঙে বৌ পালাবে দেখতে পাবেনা।

ভেবে দেখ দেখি ছেলে-বেলায় ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো ! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয় ? যেমন দ্রব্যের তেমনি নামেরও আছে বৈকি !

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-না ঈষৎ মুগ্ধ কিরাইয়া চাপা গলায় ভৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সাম্নে এ তুমি
কি করচ কি ?

কেন ? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি । প্রাপ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায় ।

তবে, তাই করো, আমি উঠে যাই ।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বো, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না । ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে,—তা হোলো উল্টো ।

নতুন-মা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো । রাজু ?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল । নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে জন্তে কাল গিয়েছিলে শুঁকে বলা ।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ স্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারেনা ।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য কোতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন, কেন পারেনা ?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল ।

কে তোমাকে বল্লে ?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা ।

শুঁকে কে বল্লে ?

আপনি শুঁকেই জিজ্ঞাসা করুন ।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বো, কথাটা কি সত্যি ?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিলনা। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা'হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, পশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায় ?

নতুন-মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনেবে কেন ? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হকুম করতে আমি জানিনে,—কেউ আমার তাই কথা শোনেনা। তার তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি ক'রে বলো দিকি ?

হয়ত' বিগত দিনের কি একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানেননা। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেননা, গভীর লজ্জার মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মুহূর্তে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু ?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানেনা, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অকথ্য কথায় যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেননা।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানেনা, তাকে বুঝিয়েই বলোনা মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জ্ঞে ? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার বাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব ? কিছুতেই ঠাকানো যায়না এই কি তোমার

শেষ কথা ? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ, করুণা, না তাজিল্য কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন ।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্বরণ হইল যে-অবাধ্য নতুন-বোয়ের বিকটে এইমাত্র তিনি অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই । রাখালের মনে পড়িল যে-নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামী-গৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই ।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসংকীর্ণ যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধহাস্য-পরিহাসের মুক্তশ্রোতে অভাবনীয় সহনীয়তায় উজ্জল হইয়া আসিতেছিল, এক মুহূর্ত্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অনানিশায় অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল । রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পাণ খাননি ? আমার মনে ছিলনা মা, অপরাধ হয়ে গেছে ।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—পাণ ? পাণের দরকার নেই বাবা ।

নেই বই কি ! ঠোট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে । কিন্তু আপনি ভাবচেন এখনি বুঝি হিন্দুস্থানী পাণ-বালার দোকানে ছুটবো । না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে । এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া ক্ষতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল ।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন । নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ত্রায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই বিনিমুক্ত রবিকরে ব্যাপ্সা কিছুই আর রহিলনা । স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল । ইতিপূর্ব্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল,

এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুপ্তিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবশিষ্ট ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা বেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল, ছি ছি, করিয়াছি কি !

পাশ আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। ক্রান্ত সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়ত তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন মনে কথা কহিলেন, নতুন-বৌ প্রথমে। মথ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো ?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়ত পারেনা, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে ?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন নেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয়না ? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো ?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি ?

যতদিন বাঁচবো নাথায় ভুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজকর্তা ?

তোমার মনে কি হয় বলা ত নতুন-বৌ ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিলনা। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়েনা নতুন-বৌ, না আমি পারবোনা। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান

স্বামীর যাবেনা। তবু, পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নতুন-বৌ ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন,—তা’হলে আর আমি দুঃখ কোরবনা। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নিবোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায়না, প্রশ্ন করে দিলেও যে বিশ্বাস করেনা তার দুর্দশা এমন হবেনা তো হবে কার ! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে মনে নিতে হবে নতুন-বৌ ? বলতে হবে বা’ করেছি আমি সব ভুল ? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েছে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী কর্মচারী,—ঠকিয়েছে অনেকই। কিন্তু, যখন সব যেতে বসেছিল সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ ক’রে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো,—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হোলাম অন্ধ, আর বারা চক্রান্ত কোরে, বাইরের লোক জড়ো করে তোমাকে নিচে টেনে নামিয়ে বাড়ীর বার করে দিলে তারাই চক্ষুস্থান ? তাদের নালিশ, তাদের নোঙরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি ? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্য ইতিহাস ? তুমিই বলো ত নতুন-বৌ ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া তাকিয়াছিল বোধহয় তাহা নিজের জানিতনা, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা শামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নিচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী ? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্তা, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড়,—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি আমাকে কে কবে করেছে ? এমন কোরে

নতুন কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায় ভাবি নতুন-বো, কিছুতে জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েছি বলো ত সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনান্ন হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি তো কখনো কিছু করোনা,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়ত আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বো মুখ তুলিয়া চাহিলনা, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বলো? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বো চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না, মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবনা, মুখেও বোলবনা।

তবে, জানবো কি করে?

জানবে বেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হৈয়ালি হোলো।

তা হোক্। আজ আশীর্বাদ করো এর মানে বেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

ঘরের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ডো দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, একডিকা পাগ সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেছি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ বটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বো ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল। বজ্রবাবু বলিলেন, আমি তেরো বছর পাগ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, নতুন-বো, এখন তুমি হাতে ক'রে দিলেও মুখে দিতে পারবোনা।

সুতরাং, পাণের ডিবা তেমনই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেননা।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ বায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে-কারণেই হোক সে দীর্ঘক্ষণ অন্তর্পস্থিত থাকিতে চাহেনা। তাহার এই অবস্থিত কোতুহল : রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বো, তোনার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভট্টাচার্য্য মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময়ে দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলে-মেয়েও হয়েছে, এতকাল সন্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল,—দেবো?

নতুন-বো বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ে।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল সুদে আসলে সেটা হাজার পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেবো?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুকনা।

না নতুন-বো সাহস হয়না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে,—থাকলেই হয়ত টান্ ধরবে।

নতুন-বো একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুনি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবেনা।

ব্রজবাবুর চোখ দুটা হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও তো বুড়ো হোলাম গো, আরও পাটবো কত কাল? ভাব্চি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবেনা,—এই তো ? না, সে হবেনা ।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না । মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধ হয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল ।

হঠাৎ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, দেখো নতুন-বৌ, সোনাপুরের কতটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনো করো ?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই । সবটাই ছেড়ে দাওনা ।

সবটা ?

কতি কি ?

বেশ, তাই হবে । তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড় মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল । জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি নেয়ে আছে, অবস্থা ভালো নয়, এরা ভাগ্যীকে কিছুই দিতে চায় না । তুমি কি বলো ?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর । জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মতো ব্যবস্থা করে দিলে অন্তায় হবেনা ।

ভালো, তাই হবে ।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল ।

হাঁ, নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে ? কেবল তৈরিই কুরালে, কখনো প'রলেনা । দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে ?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তারপরে মাথা ঝেঁট করিলেন । একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল ।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক্ থাক্, নতুন-বো তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আত্মিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলেনা তাহা রাখাল জানিত। সেও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রোঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যাহের প্রধান কাজ নতুন-বো তাহা জানিত না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলোনা মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাওনা তখন ও-বাড়ীতে যবেনা।

নতুন-বো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবেনা। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড় ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারোনা? এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবেনা।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বো বলিলেন, এত তাড়াতাড়ির দরকার কি মেজকর্তা।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয়না নতুন-বো। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে,—দেশাচার অমান্ত করতে পারবোনা। তা'ছাড়া আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

.. কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগুলের বদলে বাদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল ।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিয়ে। তাই তো দিচ্ছিলে ।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কঁধা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু ?

ব্রজবাবু স্নান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বই কি । হেমসন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু । সহজে ছাড়বেনা ।

রাখাল খুব জানিত,—তাই চুপ করিয়া রহিল ।

নতুন-বৌ হঠাৎ জুঁক হইয়া কহিলেন, তোনার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবেনা, তাতে হেমসন্তবাবু বাধা দেবেন কেন ? দিলেই বা তুমি শুন্বে কেন ?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু ‘না’ বলিলেন বটে কিন্তু গলায় জোর নাই তাহা নকলেই অনুভব করিল । নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে । এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা সহরে স্বপ্নারের অভাব হবেনা, কিন্তু সে ক’টা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে । আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভৃত-প্রেত, পাগল ছাগলের গায়ে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবেনা । এর মধ্যে হেমসন্তবাবু বলে কেউ নেই । বুঝলে মেজকর্তা ?

ব্রজবাবু বিষম মুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ ।

রাখাল কথা কহিল । বলিল, এ হোলো সহজ যুক্তি ও স্তায়-অস্তায়ের কথা মা, কিন্তু হেমসন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না । রেণু অনেক-কিছু পাবে বলেই তার অন্তরে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতোনা—ও নিখাস ফেলবার সময় পেতো । মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা ।

কি করবেন তিনি শুনি ?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু, বলো। আমি অহুমতি দিচ্ছি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটেনা, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্য্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু ? মেজকর্তার ?

হাঁ, একবার ঠেলে কেলে দিয়েছিল, পোনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধ্বক করিয়া জলিয়া উঠিল, -- তারপরেও ও বাড়ীতে আছে ? খাচ্ছে পরচে ?

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্য্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাস্তি। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে এসে হাজির হতেন। শেকড় গেড়ে ওরা বসেছে মা, নড়ায় সাধ্য কার ? আমরা একদিন নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রুকুটির ভার সইলোনা, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিকুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ীর কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় বোচেনা। অথচ, পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার স্বামী বিপদে-কুল-কিনারা পায়না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেননা, শুধু সম্মুখের টেবিলের পরে ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছটফট করিয়া উঠিল। সংসারে এতবড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর ঐ নির্ঝাক, নিপান্দ, পাষণ্ড মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে বা পড়িল। বুড়ি-কি মনে করিয়া রাখাল কবাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যাকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল,—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাইলেন,—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ডাইভার নিয়ে এলো মা। শীগ্গীর চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করেচেন।

কথাটা মানান্ধই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিলনা। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহেনা, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল,—উঠে পড়ুন মা, শীগ্গীর চলুন। গাড়ী এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুননা মা, পথেই বোলব।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চোল্‌লান মেজকর্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে জোর করে, রাগ করে বোলব,

এখন যাবার সময় নেই তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন-বোঁকে আজ একবার মনে করে দেখো ত মেজকর্তা, দেখো ত তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বোঁ বলিলেন, মার্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি,—উপেক্ষা করে বল্লে এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে,—অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-বাই বলুক মেজকর্তা, অমন কথা তুমি কখনো আমাকে বোলোনা। বলবেনা বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূনিকম্প হইয়া গেল। বহুদিন পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল,—তখন রেগুর জন্মের পর নতুন-বোঁ পীড়িত। কি-একটা জরুরি কাজে তাঁহার ঢাকা বাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বোঁ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল,—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবেনা বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা বাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রী বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ক্রটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিলনা কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া হঠাৎ কেনন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েছে,—তাই এসেচি ডাক্তারে।

নতুন-বোঁ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আটদিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিংসর চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন।

তোমার বাড়ী, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা। বউটা হয় ত আর বাঁচবেনা।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-না বলিলেন, কেন পারবেনা বাবা, এসো।

যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা দুটি স্পর্শ করিয়া নাথায় ঠেকাইলেন?

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-নার অনুসরণ করিল।

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখালরাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তেরো বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর কিন্তু তাহাকে না-চিনিবারও হেতু নাই; অন্ততঃ, সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল হয়ত তিনি দোকানে যান নাই, হয়ত, ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়ত বাড়ীতে না-থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন;—তখন, লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাই থাকিবেনা,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাহার এই অভাবিত আকির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যাভরে নতুন-মার বেদনা-স্কন্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়ীটা থামাতে বলুন আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিশ্বয়াপন্ন হইলেন,—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরি কাজ আছে ?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক ।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু ।
অতদিনে তো হবেনা ।

বলা কঠিন । রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মুহূ-কণ্ঠে বলিল, না, আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন ।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন, ওঃ—তাই বটে । কিন্তু, কে-একটা-লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা ? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে ! তাছাড়া শুনলে তো তিনি বাড়ী নেই, পুলিশ-হাস্কামার ভয়ে পালিয়েছেন । হয়ত, দু-তিন দিন আর এ-মুখো হবেননা ।

রাখাল আশ্বস্ত হইলনা । ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিলনা, প্রতিবাদও করিলনা । ইতিমধ্যে গাড়ী আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল । দেখিল তাহার অনুমানই সত্য । একজন প্রোট গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুতপদে নামিয়া আসিলেন । রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল ।

তাহার চোখে-মুখে-কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে ?
শুনেচো তো জীবনের স্ত্রী কি সর্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইলনা, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন । নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিন্তে পারলেনা ?

তিনি একমুহূর্ত্ত তাহার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু । আমাদের রাখাল । বেশ,—চিন্তে পারবোনা ? নিশ্চয় ।

রাখাল পূর্ব্বেকার প্রথা মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল । রমণীবাবু

তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা। পুলিশে এবার বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, থাকে-তাকে ভাড়াটে রেখোনা। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, এঁকে হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেননি কেন?

হাঁসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো বাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে তো জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই তো হবেনা। একটা পরামর্শ করা তো দরকার? পুলিশের ব্যাপার কি না।

নতুন-মা বলিলেন, তা'হলে চলো; কোন ভালো এটর্নির আফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জলিয়া গেলেন,—তামাসা করলেই তো হয়না, নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতোনা।

এ সকল অনুরোধ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয় তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেননা, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা দেখিগে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসোগে সেজবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা' পারি করিগে। কেবল এইটি কোরো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিভ্রত করে তুলোনা।

নিচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দু'খানি করিয়া ঘর, বারান্দার একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র, তদ্র কেরানী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ বাটীতে নাই,—সকলেই প্রায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নূতন, এ বাড়ীতে বোধকরি বছর দুইয়ের বেশি নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বউটির নিজের ছেলে-পুলে ছিলনা বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলে-মেয়ের ভার ছিল তাহার পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা,—এ সব সেই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবন দেব বউকে,—কারণ, সে ছিল ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব, তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুড়েমি ভালো নয় বউটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদি-সম্মত অভিমত। সে বাই হোক, শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়া সবাই তাহাকে ভালোবাসিত, সবাই স্নেহ করিত। কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সেও যে আজ সাত-আট দিন নিরুদ্দেশ এ খবর ইহাদের কানে পৌছিল শুধু আজ,—সে যখন মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহেনা,—জীবন দেব বউ যে আফিং খাইতে পারে এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিলনা। বোধকরি পুলিশ হাজামার ভয়ে সবাই একটু খানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্তের প্রতিমূর্তি।

দেয়ালের কাছে দুখানি ছোট জল-চৌকি, একটির উপরে দুই একখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অশ্রুটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তাপোষের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বউটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আদ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাওনি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বলিলেন, সত্যি কোরে বলো ত মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখনু খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রোচা স্ত্রীলোকটি বলিল, পরমা তো বেশি ছিলনা মা, বোধহয় সামান্য একটুখানিই খেয়েচে,—আর, খেয়েচে বোধহয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ি দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধহয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ী ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বউটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এ ভাবে মরে লাভ কি বলুন ত? আর, আত্মহত্যার মত পাপ নেই তা কি কখনো শোনেননি? যে-স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল বাড়ীতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্তে ভাবনা নেই,—একজনের বায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি, কিন্তু তাতে সুবিধে হবেনা নতুন-মা। আর, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ী আমার দাড়িয়েই আছে তুমি নিয়ে যাও ।

তাহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌছাইয়া দিতে রাজি হইল, এবং নতুন-মা রাখালের হাতে কতকগুলো টাকা গুঁজিয়া দিলেন ।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অন্ধ-নচেতন এই অপরিচিত বধুটিকে জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া হাঁস-পাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল । পথের মধ্যে উজ্জল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথ-মাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনো দেখে নাই । তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে । নানা বয়সের, নানা অবস্থার, নানা চেহারার । একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—প্যাংরা-কাঠির ছায়,—ঢাঙা, বেঁটে,—কালো, শাদা, হৃদে পাঁশুটে,—চুল-বালা, চুল-ওঠা,—পাশ-করা, ফেল-করা,—গোল ও লম্বা মুখের,—এমন কত । আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাাপ্তেরও অধিক । এঁদের সম্বন্ধে এই বয়সেই তাহার আদেখ্লে-পণা ঘুচিয়াছে । ঠিক বিতৃষ্ণ নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার ননের এক কোণে অত্যন্ত সংগোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথম ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া । তেরো বৎসর পূর্ব্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর এক প্রাস্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার বরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন স্কৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেইনা । আজ গাড়ীর মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর

একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স-উনিশ-কুড়ি, সাজ-সজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্দ্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে,—কিন্তু রাখালের মুক্ত চক্ষে মনে হইল মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ স্বৰ্ণময় না অন্তরের নীরব মহিমায় রাখাল নিঃসংশয়ে বঞ্চিত পারিলনা। হাঁসপাতালে সে তার বথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সংকল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখ-সাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ, সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-বরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত কুখ্য। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আরোজন, কত মহার্ঘ প্রসাদন,—কি তার অপব্যয়! পরম্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য-আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বারবার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-এক-প্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিত-শ্রী, এই অদৃষ্ট-পূর্ব মাধুর্য্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মস্তরিতায় তাহার উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি-জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্ঝাঁক মেয়েটি আজ ধৈর্য্য হারাইয়াছে, তথাপি, যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই ভিক্ষা-পাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। বতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়ত,

সে-শক্তি আর নাই,—সে-শক্তি নিঃশেষিত,—তাই কি আজ এ ধিকারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ-সংসারে পাঠাইয়াছিলেন ?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ী আসিয়া থানিয়াছে। ছেঁচোরের জন্ত ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র-শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিনীর দেহের পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

* * * * *

এখানে বউটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ না লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ী চলুন ?

মেয়েটি শান্ত কালো-চোখ ছুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিলনা।

রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবোনা। অথচ, মুন্সিল এই যে কিছু-একটা বলে ডাকাও তো চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই তো। আগি বয়সে কত বড়। তাহলে, বাবার প্রস্তাবটা আমাকে এই ভাবে করতে হয়,—সারদা, এবার তুমি বাড়ী চলো ?

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো ? নাম তো করা চলেনা।

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল,—রাখাল-রাজ। তাই, ছেলেবেলার নতুন-মা ডাক্তেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা ‘বাবু’ জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি নাথা নাড়িয়া বলিল, ও এক-ই কথা। আর, গুরুজনেরা বা’ বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেবতা। আমিও আপনাকে দেবতা বলে ডাকবো।

—ইঃ! বলো কি ? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কাণা-কড়ির নেই সারদা।

—নেই থাক্। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল-আনার আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভাল-মন্দর আমরা বিচার করিনে। করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরণটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। সারদা পল্লীগ্রামের কোন-এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, স্তত্রাং বতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিলনা। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্ঠার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে, এ ক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা।

কহিল, বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ী চলো ? এরা আর তো তোমাকে এখানে রাখবেনা।

নেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ঋণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ী চলো ?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আশ্বে আশ্বে বলিল, আমি বাড়ী-ভাড়া দেবো কি ক'রে ? তিন-চার মাসের বাকি পড়ে আছে আমরা তাও তো দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্তে ভাবনা নেই।

সারদা সন্মুখে কহিল, নেই কেন ?

—না থাকার কারণ, বাড়ী-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধহয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন। কিহা, হয়ত এসেছেন আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

—না, তিনি আসেননি।

—না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেননা।

—আসবেননা ? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন,—এ কি কখনো হতে পারে ? নিশ্চয় আসবেন।

—না।

—না ? তুমি জানলে কি করে ?

—আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিলনা। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা'হলে হয় তোমার স্বশ্রববাড়ী, নয় তোমার বাপের বাড়ীতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিলনা।

রাখাল একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, স্বশুরবাড়ী ?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

—তবে কি বাপের বাড়ী যেতে চাও ?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল,—এতো বড় মুস্কিল। এখানকার বাসাতেও যাবেনা, স্বশুর-বাড়ীতেও যাবেনা, বাপের ঘরেও যেতে চাওনা,—কিন্তু চিরকাল হাঁসপাতালে থাকবার তো ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে তো ?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

—ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্ডায় তো কিছু বলিনি।

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিলনা। রুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে,—আমাকে মরতেও কেউ দিলেনা।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু, শেষ কথাটার বিরক্ত হইল,—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি, কণ্ঠস্বর পূর্ব্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মাহুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারেনা। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায়না। আর, ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ী ডেকে এনে তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অল্পভব করিল কি না বুঝা গেলনা, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমি যে ভাড়া দিতে পারবোনা দেবতা ।

—না পারো দিওনা ।

—আপনি কি মাকে বলে দেবেন ?

রাখাল কহিল, না । ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে বাই । ভিক্ষে কি দিলেন জানো ? যা' প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত । তারপরে হাত ধরে স্বশুরবাড়ীতে নিয়ে এলেন, অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে, বিড়ে দান করে আমাদের এতবড় করলেন । আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে ? না, তা কোরবনা । যা' করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবেনা ।

মেয়েটি অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়ীতে দেখিনি ?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়ীতে এসেছো ?

—প্রায় ছ' বছর ।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি ।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ জোগাড় হতে পারেনা ?

রাখাল বলিল, পারে । কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার ওপর উপদ্রব ঘটতে পারে । তোমাদের ঘরের ভাড়া কতো ?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ'টাকা,—কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা ।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ী-আলাদের তো এ স্বভাব নয়?

সারদা বলিল, জানিনে। বোধহয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলছি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চলো। আচ্ছা, তোমার খেতে-পরতে নাসে কতো লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধহয় আরও তিন চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধহয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবেনা। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখা-পড়া জানোনা?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশি হইয়া উঠিল, কহিল, তা'হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো। কিন্তু যত্ন ক'রে লিখতে হবে,—বেশ স্পষ্ট আর নিভুল হওয়া চাই। কেনন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদীপালোকে এই নেয়েটির আশ্চর্য্য রূপের যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য্য মূর্ত্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই এবার গাড়ী ডেকে আনিগে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ, আছেন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধহয়, এই জন্তেই আমি বেতে পেলাননা, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ী আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই ক'টি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িলনা।

বাসায় পৌছিয়া রাখাল নূতন-নার সন্ধান উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ী নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিলনা। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে বাড়ীর মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ী পথের মধ্যে ভাড়া করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউনা। দরওয়ানজিকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর রমণীবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু? তিনি তো রোজ আসেননা। এলেও রাত্রি ন'টা দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেননা তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ী-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলনা, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নিচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, বাহারা তখন পর্য্যন্ত ঘুমায় নাই তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল,—যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি

ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল,
তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি ?

সারদা কহিল, না।

—আশ্চর্য্য।

—না, আশ্চর্য্য এমন আর কি।

—বলো কি সারদা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য্য আর কিছু আছে নাকি ?

সারদা ইহার জবাব দিলনা। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি,
আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম
করে আসিগে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ী নেই।

সারদা কহিল, নেই ? কোথাও গেছেন বোধকরি। হয় কালীঘাটে,
নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন। আমি
আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার
ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্ত্রে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকি নেই সারদা, সে
আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে,—আজ সজ্ঞানে
পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইলনা। কথাটা অভাবনীয়ও নয়,
অবাক্ হইবার মতোও নয়,—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে,
এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে,—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের বত অল্প
শিক্ষিতই হোক তাহার সঙ্কতজ্ঞ চিন্ত-তলে এমন একটি সঙ্কল্প প্রার্থনা
নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু কথাটির জ্ঞান তো নয়, বলিবার অপরূপ
বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল ! এবং বহু পরিচিত রমণীর

মুখ ও বহু পরিচিত কর্তৃপক্ষ তাহার চক্ষুর পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা, আলো জ্বালো। কিন্তু আজ আমার কাজ আছে,—কাল পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্ত-পোষে বসিল, পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

—কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই তো। প্রথমে হয়ত খারাপ হবে, কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমার হাতের-লেখা? আনবো কালি কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের-লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়ীতে কে-কে আছে দেবতা?

রাখাল ভাবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ী নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

—তাদের আনেননা কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে, ইহারও উত্তরে বলিল, সহজে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়ত তাহারও কোন্ পল্লীঅঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঐ আছে।

—রাঁধে কে? বামুন-ঠাকুর?

রাখাল সহাস্ত্রে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্তে একটা গোটা বামুন-ঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হলো।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে কি মেজে-দুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

—হাঁ, ঠিক তাই।

—সে আর কি-কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোন-কিছু ভাবতে হয়না। আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলা ত? ঘরে জিনিস-পত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না। আজ আমার সকলের ঘরে নৈমত্যন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে তো রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবেনা। যে করবার সে করে রেখেচে।

—আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?:

—না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙে পড়েনা।

—কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায়না, হতেও তো পারে,— তা'হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা'হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালোবাসে, কষ্ট পেতে দেয়না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালোবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালোবাসেন—

—কে তোমাকে বললে ?

—আপনি নিজেই সেদিন হাঁসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খান্নি, তৈরি করে আনবো ? একটুখানি বসবেন ?

—কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে ?

—সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয়না।

—তবে, কিছু খাবার আনিয়া দিই,—দেবো ? অনেকক্ষণ কিছু খান্নি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

—কিন্তু কে এনে দেবে ? তোমার ত লোক নেই।

—আছে। হারু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বল্লেই ছুটে বাবে বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারেও রাখাল বারণ করিল। সারদা জিদ করিলনা বটে, কিন্তু তাহার বিষম মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জ্ঞানান্তনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিসটি সে যেন অনেক দিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, —একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ার বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙা-পাড়ের কাপড় পরা কে যেন রন্ধন করিতেন,—হয়ত ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু সে তাহার মা,—সেই মায়ের একান্ত অশ্রুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমন ধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া

দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে কোরোনা সারদা আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা তোমার জল-খাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

—এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

—আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্ত সে বেন ইতস্ততঃ করিতেছে অসুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়ত আমার চের ভুল হবে, আপনি কিন্তু রাগ করবেননা। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার যায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সঙ্কাতের প্রার্থনায় কল্পনায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না, সারদা আমি রাগ করবোনা। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু নাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়ীতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইলনা।

সে গরিব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিঘার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই সহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপন-জন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের মেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিলনা, অসুস্থকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার

ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল,—তার বেশি নয়। ছেলে-টেলে পড়ায় মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোনখানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরাহুগমনের আমন্ত্রণ-লিপি ডাক যোগে অনেক আসে। প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায়না। এবং না গেলে সেদিনে না হোক, দুদিন পরেও একথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়ীতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ। জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে,—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাশ্রুত পিতা-মাতা সাধুবাদে ছই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। রুতজ্ঞতার পারিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হরত চাকুরীর নিষ্ফল উমেদারীর দিনগুলো মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনিই বা কি!

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, হাস-ভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়া-শুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি। ব্যস্ত-অব্যস্ত কত না চঞ্চল প্রণয়-কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ।

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়,—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেবতা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই।

হয়ত, সত্যই নাই। কিম্বা—? হঠাৎ তাহার ভারি হাসি পাইল। নিজের মনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক,—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল,—দুই-ই বিবাহের
 ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছে রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত
 রহিল এবং সম্বাদটা নতুন-বোকে যেন জানানো হয়। অন্তান্ত কয়েকটা
 নামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাদ্দামায়
 সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারে বিকালের দিকে নিজে তোমার
 বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে
 কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ, যাহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাই-
 পোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার
 নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই, স্নতরাং
 বরকর্তা গাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে
 যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব, শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের
 কামাইয়ের জন্ত যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন
 নাই, ইহাই রাখাল বখেষ্ঠ মনে করিল। সে যাই হোক, মোটের উপর
 দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহ ব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে বখেষ্ঠ
 উদ্বেগ ছিল। ‘এখন স্থগিত’ থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও, পাগল
 বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল।
 দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীন দিনের
 বহু স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে
 ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।
 পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি
 হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সম্বাদ পূর্ব্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু

বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অল্পক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শাস্ত, দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিলেন তাহা নতাই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতোনা।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো না, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ খামাতে পারতোনা।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেননা, বলিলেন, বাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাক্বো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুন্বো। আরও একটা কাজ হবে বাবা,—আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাহার নিকট বিদায় লইয়া সে নিচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিলনা, বরঞ্চ, বথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তত্ত্বপোষে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেবতা, এতে কি আপনার কাজ চলবে ?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বারবার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভালো সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখা-পড়া

শেখো, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবেনা। হয়ত, তুমিই কতলোকের খাওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্ছি, ফিরতে বোধহয় দশবারো দিন দেরি হবে,—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিচ্ছু ভেবোনা,—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিলনা দেবতা,—সে-ই এখনো খরচ হয়নি।

—তা হোক, তা হোক—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয় কার কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্তে চিন্তা কোনোনা যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদামুবাদের পর স্থির হইল সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়ীতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা,—টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি, জিনিস-পত্র সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁসিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবেনা। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার এক-ঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে।

সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজি করানো কঠিন হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাষ্টারি লইয়া বর্ধমান চলিয়া বাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইলনা। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া বাইবেনা এমন হইতেই পারেনা। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকি, ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, নাহয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সে সৌখিন মানুষ, এক কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খল ঘটিয়াছে—বাবার পূর্বে সে সকল ঠিক করিয়া ফেলা চাই। সাহেব-বাড়ী হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামাকাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার,—না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক তো নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেক দিনের সখ কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন নাই। আফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিব গৃহেও অন্ততঃ একবারও বাওয়া চাই, না হইলে ছোট-খাটো ভুল চুক ধরা পড়িলে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইলনা। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্মই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়ত কিছুই করা বাইবেনা। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোষ্ট-আফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে

ঘেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে তারকের কড়া-নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতির পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোষ্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে ঘাইবার মতো জানা কাপড় নাই তা' হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুন্সিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবেনা। পোষ্ট-অফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে,—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ী ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল,—লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল সে বর্দ্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ్రাম হইতে সেই হেড-মাষ্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে এবং পত্নের উপসংহারে আশা করিয়াছে অনতিকাল মধ্যেই দিন কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধের স্বয়ং গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সম্বাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিব্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, ট্যাক্সি ভাড়াটা বাঁচলো।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন দশেকেরি হইবে, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চোঁকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা ?

—হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

—ফিরতে দিন আষ্টেক দেরি হবে বোধ হয়?

—হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মোন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়ত বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকা-বাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার তো আর কিছু নেই মা। তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেগুই তো নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি ঐ নিরীহ শান্ত মানুষ না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মানাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো নত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেছেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্তে না চিরদিনের জন্তে সে তো এখনো জানতে পারা যায়নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্তে মা, চিরদিনের জন্তে। ঐ পাগলদের বরে আপনার রেগু কখনো পড়বেনা আপনি নিশ্চিত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন। কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির

কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্চিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে ?

রাখাল বলিল, কিন্তু ঠুকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় না ?

নতুন-না একটুখানি স্নান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল প্রকৃতির উনি তো চিরদিনই রাজু ! তাতে আর সন্দেহ কি !

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সহিতে পারে না ? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেননা, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসছেন।

খোলা জানালার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-না কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিইনি শুনেছো নতুন-বো ?

—হাঁ, শুনেচি। বোধহয় খুব গোলমাল হলো ?

—সে তো হবেই নতুন-বো।

—তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি কোরে তুমি এ বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালোবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায়না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার নেয়ে অথচ, তোমারই বাধা দেবার হাত নেই। কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বহিতে হলো। সেদিন আনার বারবার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বো, মনে হচ্ছিল আজ তুমি যদি বাড়ী থাকতে

সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আমি গড়ের মাঠের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশ্যে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে,—সকলের ওপরেই সব কিছু চালানো যায়না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইলনা। রাখালও তেমনি নির্দ্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতেই ইহার অধিক ভাঙিয়া বলিলেননা।

মিনিট দুই তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু, আজ আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ'-সাত দিন কারবারের কাগজ-পত্র নিয়ে ভারি খাটুতে হয়েছে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখছি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বই কি নতুন-বৌ,—বলা তো যায়না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট দুই নিরন্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো

মেজকর্তা। টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় তো বাবে। কিন্তু আগারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বউ, এ দুঃসাহস করা আমার চলেনা। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেননা। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি আমি রাগ করে,—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন। ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইছি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক্, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন,—কোন জবাবই দিতে পারিলেননা।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা'হলে বাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করোনা নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়ীতে আমি দিল্লী যাচ্ছি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট দশ দিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবেনা ?

রাখাল সহাস্ত্রে কহিল, আমাদের মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু ?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। বারা আমাদের মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশি নয়। বিশ্বাস না হয় তোমার নতুন-নাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞেস করো, তিনি সায় দেবেন। চল্লাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন, তিনি অশ্রুতে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিল-মোহর করা একটা টিনের বাস্ক। সবিতা পূর্বাঙ্কুটে আসিয়াছিলেন, বাস্কটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতর তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস পেলাম নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাদ্দ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ সব গয়না তোমার রেণু পরবে ?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে বড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু ?

রাখাল গলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ী হয়ে সকলকে নিয়ে ঠেসনে যেতে হবে কিনা—

—তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা কোরো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন, কিন্তু আজ তো তোমার নতুন-মার একলা যাওয়া উচিত নয়। কেউ পৌছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মার দরওয়ান, নিজের মোটর সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

—ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তা' হলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা নইলেন, আন্তে আন্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্তা?

—যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

—না, কাজ কিছু নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ সবে প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্তে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখোনা, বা' কপালে লেখা ছিল ঘটেছে,—গোবিন্দ নীমাংসাও তার এক রকম করে দিয়েছেন, —অশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস কোরোনা নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলছি।

সবিতা তেননিই অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সম্ভব নয়। অবিলম্বে গাড়ী

ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্ত-সমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বো?

—না মেজকর্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

—তবে কঁাদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

—যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেননা, শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেননা, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ সাড়া পাওয়া গেল। সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেস করছিল আর দেরি কতো? চলুননা ভারি বাস্‌ট্যা আপনার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে, আমি ওর আপদ-বালাই।

রাখাল হাত জোড় করিয়া জবাব দিল,—মায়ের মুখে ও-নাশি অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া,—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ্ঞার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে না,—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় ঘেন নরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেননা। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাস্কাটা তোমার গাড়ীতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাস্কাটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বারো পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বর-কর্তার কর্তব্যে তাহার ক্রটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ, মনিব ও মনিবগৃহিণী তাহার কার্য্য-কুশলতায় বৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লীপ্রবাস কেবল এইটুকুনাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে বিবাহ-যোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখনো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়া-পীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু বোগেশ। সে বর-বাত্রী দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব-মিনার ইত্যাদি এ-বাং লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব, বন্ধু-কৃত্য বাকি রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ বোলআনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? বোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর সখ। আমাদের নতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্তায়। কল্পাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে উনি কলিকাতায়

করেন কি ? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয় । তারপরে মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি !

এ কথার নানা অর্থ ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে । বাড়ীর মেয়েদের পর্য্যন্ত নাম জানা । নূতন ব্যারিষ্টার, সন্ত-পাশকরা আই-সি-এসদের উল্লেখ সে ডাক নাম ধরিয়া করে । পচু বোস, ডব্বল সেন, পটল বাড়্যে—শুনিয়া অতদূর প্রবাসের সামান্য চাকুরি-জীবী বাঙালীরা অবাক হইয়া যায় । কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তাহার ভয় আছে । কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয় । সে জানে, এই কলিকাতা সহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত । যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাঙ্মুখ । তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে । বসন্তে বিবাহোৎসবের বাণী নাখে নাখে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা গুহত হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদপত্রে কোথায় কোন্ আত্মঘাতিনী অনুচা কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়ত বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয় সংসারে এত প্রাচুর্য্য, এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই-কি কাহারো চোখে পড়েনা ? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই ?

কিন্তু এ সকল তাহার ক্ষণিকের । মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়,—হাসে, আনন্দ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্য-লোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে

ছোট, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিল তেমনি কাটে। এতদিনের এই গনোভাবে এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কল্যাণ দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে-সমাজে ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়ত অনেক বিষয়ে খাটো, স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নূতন অভিজ্ঞতা তাহাকে সাহস দিয়াছে, বল দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের-মুখে-শেখা এই আশ্রয়-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী পুত্র কল্যাণ—তাহাদের কতদিকে কতরকমের প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ী-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই। এ নিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,—অকূল সমুদ্র মাঝে সে বেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও সেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের নতো সেও অনেক কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি

ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল ; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে,—রাস্তিরে আমাদের সকলের নেমস্তন্ন ।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার,—লোক খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে । রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত,—কাজের চেয়ে অকাজই বেশি করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিস-পত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে । রমণীবাবু বেন বাঁচিয়া গেলেন,—এই যে রাজু এসেছে ! নতুন-বো ?

সবিতা অগত্যা ছিলেন চীৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রমণীবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক, বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছে । বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার ।

সবিতা বলিলেন, সেও ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোওগে, আমরা নিস্তার পাই ।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল, রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন ?

—কাল ।

—কাল ? তবে কালকেই এলেননা যে বড়ো ?

—অনেক কাজ ছিল সময় পাইনি ।

সবিতা সহাস্তে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর ওর মন্ত দাবী ।

সারদা সন্দেহের ঝড়িটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল । রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধূমধাম কিসের নতুন-না ?

সবিতা স্মিত-মুখে কহিলেন, এমনিই ।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে । সেই মেয়ে তুমি । পরে তাঁহাকেই দেখাইয়া বলিলেন উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ

করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিদ্ধাপুরের পার্টনার এসেছে কলকাতায়—বি, সি, ঘোষাল নাম শুনেছো? শোনোনি,—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাঁকে দেখতে পাবে,—কোটা টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব, উকিল-এটর্নি, নায় দু-তিনজন ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে,—খাসা গাইছে আজকাল নালতীনালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো! কিন্তু কপাল করেছিলে বটে। দেশে থাকতে কোন্-এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই ইঠাৎ আদায় হয়ে গেল। ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয়না। নিতাস্তই বরাভের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেল্লে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার দশেক কম পড়ে যায়, আমাদের আবদার ধরলেন সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বল্লুন, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি এই অত্যন্ত অকৃতিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজি আছি কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবোনা। আমাদের ও-বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

—কাল গেলে হয়না?

—না।

—তবে কখন আসবে বলা ?

—আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো না ?

—তারক এখানে নেই বুঝি ?

—না, সে তার বন্ধমানের নাষ্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও গরত আসতানা।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, গুঁর ওপর রাগ কোরোনা রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না না রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্তে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার স্বর্ণ মনে রাখা কঠিন।

বদিক, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-নার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানেনা, তথাপি, সেই ধর্ম-প্রাণ মহদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাষা সে ক্ষমা করিতে পারিলনা। অথচ, নতুন-মা আমলই দিলেননা : যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইলনা, বরঞ্চ, উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হান্ধা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে! এই গুঁর প্রাপ্য! আনি নিখে জলে মরি।

বউবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে, —সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তাল দেওয়া, উপরের জানালা শুলা সব স্বন্ধ,—একটা নোটিশ বুলিতেছে বাড়ী

ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেক দিনের, এ-অঞ্চলের সকল ভদ্র গৃহেই সে মাল বোণায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ী ভাড়া কি রকম?

মুদি তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেননা রাখালবাবু?

—না, আমি এখানে ছিলামনা।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্তে বাবু বাড়ীটা বিক্রী করে দিলেন যে।

...বাড়ী বিক্রী করে দিলেন! কিন্তু তাঁরা সব কোথায়?

—গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ী। ব্রজবাবু বেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

—বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটায় দু'খানা বাড়ীর পরেই সতেরো নম্বরের বাড়ী।

সতেরো নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজার কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, কটকের-না, কাকাবাবু কোথায়?

—ওপরে রান্না করছেন।

—বামুন নেই?

—না।

—চাকর?

—মধু আছে, সে গেছে ওষুধ আনতে।

—ওষুধ কেন ?

—দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখতে ।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই । কবে এখানে আসা হলো ?

দাসী বলিল, চার দিন । চার দিনই জ্বরে পড়ে ।

ভিজা স্যাঁত-সেঁতে উঠান-ময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এক কোণে লোহার উল্লুখ আলিয়া ব্রজবাবু গলদ্বন্দ্ব । সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে ।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই ছাখো রাজু, ফটিকের-মার কাণ্ড । উল্লুখে এত কয়লা ডেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না । ফ্যান্টা যেন,—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে না ?

রাখাল কহিল, তা হোক । আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পূজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশি লাগবে না । রেণু কই ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিচের বিছানায় শুইয়া । রাজুদাঁকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল । রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, কান্নাটা কিসের ? জ্বর কি কারো হয় না ? ও দুদিনে সেরে যাবে । আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে ? উঠে বসো । মুখ ধোয়া, কাপড় ছাড়া হয়েছে তো ?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চোঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের-মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে বাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে । সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের-মা, ওতে চলবেনা । তুমি আমি মধু

আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফ্যালো, আমি নিচে থেকে চট করে স্বানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত? আছে। বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারী দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাঁচা কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নিচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেননা, শীগ্গীর উঠুন। রেণু, নেয়ে এসে বেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে। নধু এসে পড়লে বে হয়—

বিষয়, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে বেন চেষ্টামেটির একটা ঝড় বহিয়া গেল।

মানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেঝের পড়িয়া মিনিট দুই তিন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায় অকস্মাৎ বেদিন বিষচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তারপরে উঠিয়া বসিল, ঘটি কয়েক জল নাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ নাহুষ,—কে বলিবে ঘরে কবাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো নাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁপাবাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জ্ঞান এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিলনা। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া নিচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আবার বখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইলে বলিল, রাজুনা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বউ হবে সে ভাগ্যবতী। কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবেনা? .

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে তো ?

—না সে হবেনা। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দিয়ে দেবো।

—তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ-ডাক্তার আজ কি বললে ? অরটা ছাড়চেনা কেন ?

ফটিকের-মা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ তো আসেননি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো ? আর মিছিমিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অস্থখ সেরে যায় ফটিকের-মা ? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিলনা, বুঝিল ছুর্দশায় পড়িয়া সামান্ত গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহেনা।

—তুমি কি চলে যাচ্চো, রাজুদা ?

—আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

—নিশ্চয় আসবে ত ?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্য্যন্ত কাকাবাবুকে উত্তরের কাছেও যেতে দিওনা রেণু।

শুনিয়া রেণু কত বেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার অর না থাকে আমি রাখবো রাজুদা ?

—কিছুতেই না। বিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিওনা ফটিকের-মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ী,—নিচের

তলায় ডিসপেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল, রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর অরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন ছাড়েনি তখন দিন দুই না গেলে ঠিক বলা যায়না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পরে ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল তখন ভাবনা নেই। আনি কাল সকালেই যাবো।

—নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু আমাদের ডাকবার লোক নেই।

—ডাকবার দরকার নেই রাখাল আমি আপনি যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর নানা কাণ্ডের মধ্যে একথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই, নির্জজন ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দুচোখ বহিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কুল এবং এই দুঃখের দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইলনা। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটা ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা করাইবার অর্থও হয়ত হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্ম-বুদ্ধি, ভগবৎ-ভক্তি, সাধুতা সকলের 'পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোষ্ট-

আফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার 'পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলেনা, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মাছুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসায় তাহারি কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে? সে জানে, যে-বাটীতে সে ছেঁলে পড়ায় তাঁহার অত্যন্ত রূপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেননি নিশ্চয়। অনেক 'বড়লোক' গোপনে তাহারই কাছে ঋণী; সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহার ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে! কিন্তু দীপশিখা জলিয়াই স্থিমিত হইয়া আসিল,—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া? এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা-পথও তাহার চোখে পড়িলনা। কিন্তু সে বলিলে তো চলিবেনা, পথ তাহার চাই-ই,—তাহাকে পাইতেই হইবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্ত্র নিমজ্জন আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সেও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল সৌখিন লোক, বেশ-ভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয়না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িলনা, যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-নার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে থানকয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দাঁপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড়-বরে বাত-বস্ত্র বাঁধা-বাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহ-স্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত,—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ক্রটি না বটে—রাখালকে দেখিয়া একমুহূর্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা?

একদিন যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে এ যেন সে নয়,—অভিনব ও বহুমূল্য বেশ-ভূষার পারিপাটো তাঁহার বয়সটাকে যেন দশ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে—রাখাল কেনন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর দিতে পারিলনা। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাতির করে এলে রাজু?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল না। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি ত কিছুই হয়নি।

—না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল, তখন নিজেও জানতামনা নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলামনা।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, পাড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিয়ে বসোগে।

রাখাল কিছুতে সঙ্কোচ কাটাইতে পারেনা, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়, শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধহয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন, টাকা? টাকা তো নেই রাজু,—যা' ছিল ওটা কিনতেই সব পরচ হয়ে গেছে ও বেলাই ত শুনে গেলে।

—কিছুই নেই মা?

—না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর ত নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে এনে দেবো ?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ঋণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে ? আচ্ছা, দাও ।

সারদা বলিল, মিছুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয় ।

—তঁার কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা ?

—কেন পারবোনা,—তিনি ত বুড়ো মানুষ । কিন্তু আমার ত জিনিস কিছু নেই—

—তবু চলোনা দেখিগে—।

—আস্থন ।

তাহাদের যাবার সময় সবিতা বলিলেন, তা বলে না খেয়ে নিচে থেকেই যেন চলে যেওনা রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় থাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই ! আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে । এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নিচে নামিয়া গেল । সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেননা ।

রাখাল চলিয়া গেছে, সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকি কাপড় সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে ঘাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন । তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাওতো মা খাই ।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্জিয়া গেল । তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল ?

কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিধিতৈছিল—
ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে ত নয়।

—রাগ করে বই কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে
আবার টাকা দিতে পারিনি,—তুমি বৃদ্ধি দশ টাকা তাকে দিলে ?

—না মা, আমার কাছে নিলেননা, নিম্নর দিদিমার কাছ থেকে একশ
টাকা এনে দিলুম।

—এমনি ? শুধু হাতে সে দিলে যে বড়ো ?

সারদা বলিল, না এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা
আনাকে খুলে দিয়ে বললেন এর দাম তিনশ টাকা, তিনি বা' দেন নিয়ে
এসো। গুঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে তাই বিক্রী করে এই মাসেই
শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হোলো কিসে ?

সরদা কহিল, কে-একটি মেয়ে বড় পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্তে।

—মেয়েটি কে যে তার জন্তে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয় ?

—সে তো জানিনে মা। কিন্তু, বোধ হয় তার খুব শক্ত অসুখই
হয়েছে। টাকার অভাবে পাছে নারা যায় এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ
নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ্য করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ্য করেছিল
বল্লে ? এ ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ্য করেছে আমি জানি।
তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয়না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে ত মনে
হয়না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো,—বললেন, এঁদেরও বিভ্র-বিতব
অনেক ছিল কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্তে বাড়ী-ঘর পর্য্যন্ত বিক্রী

করে দিতে হলো, অথচ, দিল্লী বাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই,—বুড়ো বাপ আপনি বসেছে রাঁধতে,—কিন্তু জানেনা কিছুই—হাত পুড়েচে, ভাত পুড়েচে, তরকারী পুড়ে গন্ধ উঠেছে,—রাখাল বাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলছিলেন এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই,—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজি হয়ে বলেছি, বা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করবো।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রতিল, জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল? দিল্লী বাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

—হাঁ, তাই তো বললেন।

—অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই,—মরে গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়। আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরণে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে স্তান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে—

—কোথায় মা?

—রাজুর বাসায়।

—এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলছি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন,

কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া বাড়ীতে কাজ, কত লোক এসেছে, সবাই খুঁজবে যে মা?

—কেউ জানতে পারবেনা সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দ্বিষ্টস্বরে কহিল, ভালো হবেনা মা, হয়ত একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবেনা।

সবিতা কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের পাশে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তার পরে দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে বে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুকিলনা কিন্তু আর আপত্তিও করিলনা,— নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা বাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। চোখ পড়িল ঠিক উপরেই,—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত একটি তখন সঙ্গীতে হাত্রে ও আনন্দ-কলরবে সুখের হইয়া উঠিয়াছে। একটি ক্রমালে বাঁধা বাঁগুল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখোত মা, রাজু আমার হাত থেকে হয়ত নেবেনা,—তাকে ভুনি দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহির হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে বসিলেন এবং আরও মিনিট পাঁচেক পরে বড় বাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ী থানিল। নামিতে হইলনা, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাহার মূখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িলনা, গৃহে ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া পাযাণ-মূর্ত্তির ত্রায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অসুমান করা সারদার কঠিন, কিন্তু সে এটা বুঝিল যে রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটনা আছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া দৃষ্টিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ী না। এই বাড়ীই বিক্রী হয়ে গেছে ?

—হাঁ।

—এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন ?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

—কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা ?

—কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন—।

—কিন্তু যদি না আসে ? আমার বাড়ীতে আর যদি নে পা দিতে না চায় ?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই ; এইটুকু নাত্রকে উপলক্ষ করিয়া নতুন-গার এত বড় উৎকণ্ঠা, আবেগ ও আত্মশ্রমিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল। তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্কুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয় এ কথা না-জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়।

সবাই জানিত এ কোন্ বড়-ঘরের মেয়ে, বড়-ঘরের বো—আচারে আচরণে বড়, হৃদয়ে বড়, দয়া-দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্য কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিলনা, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘ দিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালোবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের ভ্রান্ত সবিতার মুখের 'পরে পাড়ল, সারদা দেখিল তাহাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা ?

—কেন মা ?

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন সাড়া নাই,—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সবলে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আগার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেননা শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের 'পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ী ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বপ্নকালের অল্পপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নিচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে যি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা এখন নেয়ে এলে ? মাথা ঘুরছিল বোধ করি ?

—হাঁ।

—তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়োগে মা সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে !

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি না, কোন ভাবনা নেই । দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো ।

—তাই এনো সারদা, আমি একটু শুইগে ।

সে রাত্রে পাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোন মতে চুকিল, অভাগতেরা একে একে বিদায় হইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল ; ক্রুদ্ধ-পদক্ষেপে রমণী-বাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেল্লে ! বাড়ীতে কোন-একটা কাজ হলে তোনারও কোন-একটা চং করা চাই । এ তোনার স্বভাব । লোকেরা গেছে,—এবার নাও, ছলা-কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ পরো—বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন ।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয় । বস্তুতঃ, এমনিই কিছু একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছিলেন, ক্লান্ত স্বরে বলিলেন, দেখা কিসের জন্তে ?

—কিসের জন্তে ! কেন, তারা কি ভিথিরী যে থেতে পায়না ? বাড়ীতে নেমস্তন্ন অথচ, বাড়ীর গিন্নীরই দেখা নেই । বেশ বটে !

সবিতা কহিলেন, নেমস্তন্ন হলেই কি বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি ?

রমণীরাও বিমল করিয়া বলিলেন, প্রথা না কি ! প্রথা নয় জানি,—

করতে কেউ চায়না,—কিন্তু তারা সব জানে ।

সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেলেন । সারদা নিজেও পলাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু উঠিতে পারিলনা । এদিকে উদ্বেজনা পাছে

হাকাহাঁকিতে দাঁড়ায় এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশি, তাই নম্রভাবেই কহিলেন, আমি বড় অসুস্থ, তাঁকে বলোগে আজ দেখা হবেনা।

কিন্তু ফল হইল উল্টা। এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চোঁচাইয়া উঠিলেন,—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটাপতি লোক তা' জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটার খবর রাখো? আমি বলচি—

দরজার বাহিরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আমিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বলিলেন। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া বসিয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধহয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়ত আর ফিরতে পারবোনা; অমনি বোধহই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। তাবলুম, মিনিট খানেকের জন্তে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথেয় আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স বছর চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে কিন্তু সব্ব-দতর্কভায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ, কহিলেন, খবর পেলুম রমণী-বাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকেনা সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চি। আপনার আর-বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইলেন, আমার ফটো আপনি দেখেছেন না কি?

—দেখেচি বই কি। আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু

পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেছি ছবির মালিককে একবার 'চোখে দেখবো। সে সাধ আজ মিটলো। চলুননা একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন কয়েকের সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রসস্ট্রীটে একখানি ছোটবাড়ী আছে তার উপর-তলায় দিনরাত সাগরের হাওয়া বয়, সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসতে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হগো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়ত এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয়তো উদ্যোগ আয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়ীটার কোথাও যেন কোন ক্রটি না থাকে। কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মুহূর্তে কহিলেন, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবেনা।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন,—কেন সুবিধে হবেনা শুনি? লেখা-পড়া কালপরন্তু শেষ হয়ে যাবে, দরওয়ান চাকর বাড়ীতে রইল, ভাড়াটেরা রইল, যাবার বাধাটা কি? না সে হবেনা বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বল্লেই হবে? আমার শরীর ধারাপ—আমার দেখা-শোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিনলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে ?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখোচোখি হইয়া গেল, সবিতা দলজে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিলেন, না। আমি যেতে পারবোনা।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন,—না কেন ? আমি বলছি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই !

বিনলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে ?

—হাঁ, দরকার হয়ত তাই।

—তা'হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অত্যাচারে ভার নিতে পারবোনা। কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাহার ক্ষতিগোচর হইয়াছিল কি না। বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা'হলে উঠি,—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়ত অত্যাচার করে গেলুম,—তবু, বাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইলো,—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে,—দেখি কত বার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু গালিলেন, বলিলেন, নমস্কার,—নমস্কার রমণীবাবু আমি চল্লুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নিচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তা'হা সত্য নয়।

সারদা বলিল, মা, খাবেননা কিছু ?

—না।

—এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো ?

—না, দরকার নেই।

—আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বাবো ?

—তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্ছে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেহি হইতেছিল, রমণীবাসু কিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাবু বাঁচা গেল আজকের মতো কোনরকমে মান রফেটা হলো। উদ্ভলোক থামা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক-অহঙ্কার নেই, তোমার ছেলে ত ভাষি ভাবনা, একশোবার অনুরোধ করে গেলো কাল সকালেই যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়ত বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়,—বলা যায়না কিছু—ওদের ত আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ বিংশ হাজার থাকলেই বা কি গেলেই বা কি ! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টরই বলো আর শেয়ারহোল্ডারই বলো বা' করে ঐ নিষ্ঠার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে লোকটা কোটা টাকার মালিক ! কোটা টাকা ! জারমানি, হল্যান্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দুচারবার এমন যুরোপ যুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক ! জাভার চিনির চালানিতেই গেল বছরে—

মুন্সিফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইলনা,—বাধা পড়িল।
সবিতা ভিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে,—বাড়ী গেলেনা

কোন প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আমন্দবর্দ্ধন করিলনা এবং
বুঝিলেন যে তাঁহার ‘নষ্ট লোকের’ বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ
করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ী? নাঃ—আজ আর
বাবোনা।

—কেন?

—নাঃ—আজ আর—

সবিতা এক মুহূর্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, নদের গন্ধ বেগুচে,—
তুমি কি মদ খেয়েচো?

—মদ? আনি? (ইসারায়)—মাত্র একটি ফোটা—বুঝলেনা—

—কোথায় গেলে, এই বাড়ীতে?

—শোন কথা! বাড়ীতে নয়ত কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে
এলুম?

—মদ আনতে কে বললে?

—কে বললে? এমন কথাও কখনো শুনিনি। বাড়ীতে দু-দশজন
ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিরে রাখলে কি হয়? তাই—

—সকলেই খেলে?

—খেলেনা? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায়
শুনি? অবাক করলে যে তুমি!

—বিনলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু
চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী শুনে বাকি নেই আমার।
জানি সব।

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বই কি। আচ্ছা, যাও এখন। রাত হয়েছে ৩-৪রে গিয়ে শুয়ে পড়োগে।

বলার ধরণটা শুধু কর্কশ নয় রুঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কর্ণস্বরের প্রচ্ছন্ন রুদ্ধতা রমণীবাবুকে বিবিত্তেছিল, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের হ্রায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—আজ তোমার হয়েছে কি বলো ত? মেজাজ দেখি যে ভারি গরম। এতটা ভালো নয় নতুন-বো!

সারদার ভয় হইল এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনিই শুইয়া রহিল একটা কথারও জবাব দিলেননা।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলেচি সবাই জানে তুমি স্ত্রী নয়—তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানেনা কে? সারদা জানেনা, না বাড়ীর লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কত দিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মতো তীক্ষ্ণ ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষ মানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েছে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিলেন না, মুখেও বলিনি মনেও ভাবিনি। তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়েনা সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষু-লজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকার লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালী হয়ে ওঠে।

—কেন? কেন শুনি?

—কি হবে শুনে? এ কি তুমি বুঝবে যে আমি যার স্ত্রী তোমরা
কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও?

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—এত রাস্তিরে কি করচেন
না আপনারা? দোহাই না, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিলেননা। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন,
সত্যি? সত্যি না কি?

সবিতা কহিলেন, সত্যি কি না তুমি নিজে জানানো? সমস্ত ভুলে
গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষে করতে
পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে
করেছিলেন। নিজে কতো বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো
পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি হয়েছে,
এটুকু সইবেনা?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে-কথাটা মুখে আসিল তাহাই
কহিলেন—তবে বল্লে তুমি রাগ করতে বাও কিসের জন্তে?

সবিতা বলিলেন,—শুধু আজই ত বলোনি প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা
কটু তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে কিন্তু অন্তরটা তখন স্বস্তির নিশ্বাস
ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে এ লোকটা আমার কেউ নয় এর
সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধও নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল কিন্তু অশিক্ষিত
রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু
এইটুকু বুঝিলেন যে ইহা অত্যন্ত রূঢ় এবং অপমানকর। তাই সদন্তে
প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে
থাকো কিসের জন্তে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে

হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, বলিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করছেন না, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন ?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিলেন, না সারদা আর আমি ঝগড়া করবোনা। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা নতয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি না ?

—জামিনে সারদা। ওকথা অনেকবার শুনেচি কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

—কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত !

সবিতা মৌন হইয়া রহিলেন। সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি বাই মা।

—যাও মা।

*

*

*

*

সেইমাত্র ভোর হইয়াছে সারদার ঘরের দরজায় বা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলোনা সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরওয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

—তাইতো বলেছিলেন।

—আজই আসবে বলেছিল ত ?

—না, তা বলেননি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অস্থখে তাঁকে সাহায্য করতে ।

—তুমি স্বীকার করেছিলে ত ?

—করেছিলুম বই কি ।

—কোন রকম আপত্তি করোনিত না ?

—না মা, কোন আপত্তি করিনি ।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজ-কর্ম দারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা । এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন ।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয় । তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে । অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গেই তাহার বেশি ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয় । দূর সম্পর্কের এক বোনের বড় অস্থখ তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে ।

বেলা দশটা বাজে সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—রাজু আসেনি সারদা ?

—না মা ।

—তুমি হয়ত যেতে পারবেনা এমন সন্দেহ তার তো হয়নি ?

—হওয়া তো উচিত নয় মা । আমি একটুও অনিচ্ছ দেখাইনি । তখনি রাজি হয়েছিলুম ।

—তবে আসচেনা কেন ? সকালেই ত আসার কথা । একটু

চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরওয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেছে কি না। বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কোতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিলনা, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেননা। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলোগে বাবু বাড়ী নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন একটু ময়লা দেখাচ্ছে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিলনা, দাসীর কথায় হুঁস হইল পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন

তখন ক্রটি ধরিবার কিছু নাই, সবুজ রঙের অল্পজ্বল আলোকে মুখের শুকতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুমনা।

সবিতা কহিলেন, আমি ভালো আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

—না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

—নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

—না নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই, কিন্তু—

—এক বাড়ীতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

—না তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

—না ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে—তবে—

—তাহলে কালকেও হয়ত' যেতে পারবেননা—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছু করেননা?

সবিতা বলিলেন, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে। না আসাই সম্ভব।

—না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

—আজকে নয় কাল রাত্তিরে আপনাদের বাবার পরেই চলে গেছেন।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশি রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধকরি ও-রকম অকারণ জোর জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্তায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারম্বার অনুরোধ করা আমার ভারী অল্পচিত হয়েছে। নইলে এ সব কিছুই ঘটতোনা। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনের চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নানাইয়া বলিলেন, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা তো শক্ত নয়, শক্ত হচ্ছে অমুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

—না, সে আপনি পাবেননা।

—না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেননা।

—না জানাবোনা। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত শুক হইয়া রহিলেন, তার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে চের বেশি অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি,—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেননি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিলেন, নিজের চোথকে অতো নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারি ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয়না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্তেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়, হাসির কথাও নয়,— অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যাস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য্য এই যে মুখে তাহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মাহুঘের সচরাচর চোখে পড়েনা,—যখন পড়ে রস্তুে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরা-পাত্র তৃষ্ণার্ত নতপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্ত্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিলনা। সবিতার অনতিকাল পূর্ব্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালী ঢালিয়া দিল। মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে দ্বী নয় সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা বতই জ্বালা করিয়া উঠুক কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারি সম্মুখে মর্যাদা-হানির অভিনয় করিতেও প্রবৃত্তি হইলনা। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জ্জিত-কচি, অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়—উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হ্রত অপমানের পরিবর্তে একটা কথাও বলিবেনা, হয়ত শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

গিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেননা আমার?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার মনে নেই।

—এমনি অন্তমনস্ক আজ ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আনি বলছিলেন, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে ?

—না।

—আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

—না, তাও পারিনে।

—এ কিন্তু আপনার বড় অন্তায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছেনা দণ্ড, পাচ্ছে যে-মামুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগেরও উত্তর আসিলনা। বিনলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশি খারাপ। হয়ত আবার জবার দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোথকে অবিশ্বাস করতে, কিন্তু একটা কথা আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে এই ছোটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি,—হলে নান্ন-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তোনা। আমার সেই ছোটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্ছে আপনি ভালো নেই,—তবু কিছুই করতে পারেনা—মুখ বুজে চলে বাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিলেননা, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু। তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহেনা—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে ? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাঁহার

রোগশয্যায়। নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অহুশোচনায়। কিছুতেই আর তিনি বসিয়া থাকিতে পারিলেননা, উদগত অশ্রু কোনমতে সম্বরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িলেন, কহিলেন, আর আমাকে কষ্ট দেবেননা বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু রাগ করিলেননা, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান অভিমানের ব্যাপার—দুদিন সময় লাগিবে।

* * * * *

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ী রাখিয়া দরওয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে দাঁড়াইলেন। ফটকের-না বাহিরে বাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

—তুমি কে মা?

—আমি ফটকের-মা। এবাড়ীর অনেকদিনের ঝি।

—কোথায় যাচ্ছে ফটকের-মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো তাই যাচ্ছি আবার আনতে।

—বামুন আসেনি বুঝি?

—না মা, এখনো আসেনি। শুনচি না কি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধছেন।

—রাজু বাড়ী নেই বুঝি?

—তাঁকে চেনেন? না মা তিনি বাড়ী নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

—আজ রেণু কেমন আছে ফটিকের-মা ?

—তেমনি। কি জানি কেন অরটা ছাড়েনা মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

—কে দেখচে ?

—আমাদের বিনোদ ভাত্তার। এখন আসবেন তিনি। আপনি কে মা ?

—আমি এঁদের গায়ের বো ফটিকের-মা, খুব দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

—তাকে খবর দিয়ে আসবো কি ?

—না, দরকার নেই ফটিকের-মা, আমি নিজেই যাচ্ছি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসোগে।

দরওয়ান দাঁড়াইরাছিল, তাকে কহিলেন, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াওগে মহাদেব, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। গাড়ীটা যেন সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহৎ আচ্ছা মাইজি, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দার বে-দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসৎ নাই, কহিলেন, তেল আনলে ? জলটা ফুটে উঠেচে ফটিকের-মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো ?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যাহোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বো ! কখন এলে ? বসো। না না, মাটিতে না—মাটিতে না, বড় খুলো। আমি আসন দিচ্ছি, বলিয়া

হাতের পাত্রটা ভাড়াভাড়া নামাইয়া রাখিতেছিলেন সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি ? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে ?

—তা বটে । কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিইনা ও-ঘর থেকে একটা এনে ?

—না ।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্ত্তা । কিন্তু সে কথা আজ থাক । বামুন কি পাওয়া যাচ্ছেনা ?

—পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায়না । রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলামনা । আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে ।

—কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবেনা মেজকর্ত্তা ।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য্য নয়,—অন্ততঃ সেই ভয়ই করি । কিন্তু উপায় কি !

সবিতা কহিলেন, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে,—রাখবে মেজকর্ত্তা ?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো ।

—জেরা করবেনা ?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবোনা । এটুকু জানি তোমার জেরায় পাশ করে তবে সে আসবে । সে আরও কঠিন । যে যাই করুক তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবেনা তাতে সন্দেহ নেই ।

—আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে ?

—না পারোনা। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেন পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটা পুঁটুলি, একটায় তরি-তরকারী অণ্টটায় লাগু বালি মিছরি ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নানাইয়া রাখিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রশাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুর-ঘরে বান, উছোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকি রান্নাটুকু সেরে ফেলি, এই বলিয়া সে একমুহূর্ত্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায় ওটা কি ফুটে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

—আর ?

—আর ? আর ভাতটা হবে বইত নয় রাজু।

—এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু ? জল কই, কুটনো-বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুইত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্য্যন্ত পড়েনি—ধূলো জমে রয়েছে, এত বেলা পর্য্যন্ত আপনারা করছিলেন কি ? ফটকের-মা গেল কোথায় ?

ব্রজবাবু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কি না,—সে গেছে দোকানে কিনতে,—এলো বলে।

—মধু ?

—মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে উঠতে পর্য্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ,—সংসারের কাজ—একা ফটকের-মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি

পড়িল এক কড়া বোলের প্রতি, দ্বিজ্ঞাসা করিল, এত বোল
কিনলে কে ?

ব্রজবাবু বলিলেন, বোল নয় ছানার জল। ভালো কাটলোনা কেন
বলোত ? রেণু খেতেই চাইলেনা।

শুনিয়া রাখাল জলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খায়নি।
সংসারের ভার তাহার পরে, রাত্রি জাগিয়া, অর্থ চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি
পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া
কহিল, আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে
খাওয়াবেন তাও পারেননা।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জ্ঞাত তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন
কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ৎ তাঁহার
মুখে আসিলনা কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, বান
আপনি ঠাকুর-বরে, বা' করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুর-বরের কোন কাজই
এখন পর্য্যন্ত হয় নাই,—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার
মানের জ্ঞাত নিচে বাইতেছিলেন সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন
আজ কিন্তু পূজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা, দেরি
করলে চলবেনা।

—কেন ?

কেনর উত্তর সবিতা দিলেননা ; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন,
তোমার কাকাবাবুর জন্তে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত
রাজু,—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করেননি।

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল,
ব্রজবাবু বলিলেন, এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বো ?

সবিতা কহিলেন, আশ্চর্য্যই ত। কিন্তু দেরি করতে পারবেনা বলে দিচ্ছি। নইলে গোবিন্দর দোর গোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা সুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্য্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। বাও, শাস্ত হয়ে পূজা করোগে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবেনা।

ফটিকের-মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল ষ্টোভ আলিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের-মা ?

—না বাবু, কর্ত্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

—তা'হলে উপায় কি হবে ? রেণু খাবে কি ?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা তাতে ভয় পাবার আছে কি ? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে ! কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্ত্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলোনা।

—না না, আমি অতো বে-হিসেবি নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয়না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেননা। থানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নিচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চিনা গেল, খুঁজিতে হইলনা। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতে-ছিলেন শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্ত্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—বেশত, বেশত, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিলেন, না, বাইরে বাইরের-লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়-মড়ো ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা নতুন-বো ?

সবিতা কহিলেন, আমি এ-বাড়ী থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আনার ?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার নানে ?

সবিতা বলিলেন, যদি না যাই তোমার স্তম্ভে আনার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবেনা, পুলিশ ডেকে আনাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবেনা, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আনার ?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার নাথা-মুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সবিতা উত্তর দিলেন, আমি ঠাট্টা করিনি নেজকর্তা নতিই বল্চি। কিছুতে দোর খুলবোনা যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয় তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে ?

—জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবোনা।

—লোকে বলবে কি ?

—তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ। জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেছে কখনো ছনিয়ায় ? তাহলে ত আইন-কাহুন বিচার-আচার থাকেনা, জোর করে যার যা খুসি তাই করতে পারে সংসারে ?

সবিতা কহিলেন, পারেই ত। তুমি কি করবে বলোনা ?

—এখানে থাকবে, নিজের বাড়ীতেও যাবেনা ?

—না। নিজের বাড়ী আমার এই, যেখানে স্বামী আছে সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়ীতে ছিলুম আর সেখানে যাবোনা।

—এখানে থাকবে কোথায়?

—নিচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও—তোমার মিথো বলাও হবেনা।

—তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বোঁ, এ কখনো পারি?

—এ পারবেনা কিন্তু ঢের বেশি শত্রু কাজ আনাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আনি কিছুতে যাবোনা মেজকর্তা তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

—পাগল! পাগল!

—পাগল কিসে? জোর করচি বলে? তোমার ওপর করবোনা ত সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবেনা।

—কেন পারবোনা?

—কি করে পারবে? তোমার ত আর টাকা কড়ি নেই,—গরিব হয়েছো—নামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আজ তিন দিন হইল তিনি সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ্য শূন্য-পথে অল্পক্ষণ ফ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছেন, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পান নাই। তাঁহার অসংহত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেই দিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু

তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্তইত ভাবনা নতুন-বো। আচ্ছা দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিলেননা, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ছ চোখ জলে ভাসিতেছে, কহিলেন, না মেজকর্তা মেয়ের জন্তে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাঁহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইলনা, বাহিরে ডাক পড়িল—রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল,—আম্নন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইলেন। প্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

ঠাকুর-ঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্তদ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাঁহার নিজের, তিনি না করিলে স্বামীর পছন্দ হইতনা। তখন সময়াভাবে অত্যাশ্রয় বল সাংসারিক কর্তব্য তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাঁহার নানা ক্রটি পরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ নিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজ-কন্ড কি জানেনা? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বোয়ের বাপের বাড়ীর একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিতেননা। কখনো বাধ্য হইয়া এ ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত সারাদিন তাঁহার মন-কেমন করিতে থাকিত, চুপি-চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিতেন, গোবিন্দ, অমর হচ্ছে বাবা জানি কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিন্ন অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাঁহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও-দ্রুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই? একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাঁহার অভাবের দাগ কি কোথাও

পড়িলনা, তাঁহার এত দিনের এত সেবা শুধু জল-রেখার ত্রায় নিশ্চিন্ত হইয়া গেল !

বিবাহের পরেই তাঁহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন বয়সে ছোট হলেও ওই বাড়ীর গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওরে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিলনা। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও তিনি ভুলেন নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে, সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাঁহার নাই, দূরে, বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়ীতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল,—জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারি খুসি, বলিলেন, ও-বেলায় যদিবা একটু হয় কাল আর জ্বর হবেনা। আর ভাবনা নেই দিন দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয়না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো বাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্তই সকলে যখন প্রস্তুত

হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসম্বাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ নাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন। চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরেনা, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল না, আগেকার দিনে রাজা-রাণীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বউমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ জন্যে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলাম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের-অন্ন ধুলোয় পড়ে ভোগে আসেনা।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ-করার দাবী কিন্তু ছাড়বোনা। কিন্তু সে-ও অল্পদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক’দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবেনা, ভালো করে খাওয়া চাই। আন্ন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহালাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিলনা কেবল ফটিকের না নূতন লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্তই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুসি ভাব, যেন হঠাৎ

কোন বাহু-মস্ত্রে এ বাটীর উপর হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাছুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়া-শব্দ নাই, সম্ভবতঃ, তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খন্ খন্ বন্ বন্ আওয়াজ আসিতেছে বোধ-হয় কটিকের-মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলি আজ বেলা-বেলি মাজিয়া লইতেছে, সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাটের কাছে বসিল। ওগো, জেগে আছো?

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল, কই আমার জবাব দিলেনা?

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবট' জেনে নেবার সময় পেলামনা।

—কার কাছে জেনে নেবে,—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য হচ্চো কেন নতুন-বোঁ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সে দিনত রাখালের ঘরে অনেক দিনের মূলতুবি সমস্তার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্তথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন বেদিক থেকেই আসুক জবাব দিয়ে এসেছো তুমি,—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির খলিটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো নতুন-বোঁ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার, সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলা ত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুন-বো, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

—হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

—আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো?

—তাতেও বাঁচতোনা—শুধু ডুবতে হয়ত বছরখানেক দেরি ঘটতো।

—তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

—কিছুইনা। আমার সেই হীরের আঙটিটা বিক্রী করে পাঁচশ টাকা পেয়েছি তাতেই চল্চে।

—কোন আঙটিটা? আমার ব্রত উদ্‌যাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে বেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম,—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রী করেছো?

সেছাড়া আমার আর কিছু ছিলনা তা তো জানো নতুন-বো।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, যে-ছুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, বায়নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারবোনা।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো ?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটল-ডাঙায় দুখানা বাড়ী খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে,—কষ্ট হবেনা।

—রেণুর কি আছে মেজকর্তা ?

—কিছুনা। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল তাও বোধহয় তুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর-মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভাল হ'লে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকি দিন কটা আমার কেটে যাবে,—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—একটা মুশ্কিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজি করাতে পারিনি। তাকে তুমি জাননা, কিন্তু যে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলেনা, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্তথা করানো যায়না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে, চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি। চেষ্টা কোরোনা, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবোনা। বললাম, আমি তো বুড়ো হয়েচি মা, ক'টা দিনই বা বাঁচবো কিন্তু তখন তোর কি হবে বল দিকি ? ও বললে বাবা, তুমি ত আগার অদৃষ্ট বদলাতে পারবেনা। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজসম্পদ যার ভোজবাজীর মতো

বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্তে ভগবান সংসারে পাঠাননা,—তার দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্তে ভেবে-ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়োনা। বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারি হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানে ওর ভাগ্যে এ সব ঘটবেই। ওর মুখের ওপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে,—কিন্তু যা-মুখে-এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবে-চিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়ত ওকে সহজে টলানো যাবেনা। তবু ভাবি নতুন-বো, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনেমনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল, মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো কিন্তু কিছুই করতে পাবেনা?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বো, রেণু ত কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবেনা!—আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিলনা, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাহার কত দিকে কত ভাবে তাহার রাজির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে? পাংশু-মুখে চাহিয়া উত্তরের জন্ত তাহার বুকের মধ্যে তোল-পাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

—জানে আমি বেঁচে আছি?

—জানি। সে জানে তুমি কলকাতার আছো,—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্য্যে স্নেহে আছো।

সবিতা মনে মনে বলিল, ধরণী দ্বিধা হও !

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবেনা, আর আমি, —গোবিন্দর শেষের ডাক আমি কার্নে শুনতে পেরেছি নতুন-বোঁ, আমার গণা-দিন ফুরিয়ে এলো, তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়,—আমার ধর্ম্মের অনুশাসন,—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অতিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তুণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিলনা কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দুকোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাহার সকালের কথাগুলো মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল তখন স্বামীর মানের বরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না বাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কত্কা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

কিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্তকর তাহার জোর করার দাবী, তাহার ভিত্তি-হীন শূন্য-গর্ভ আশ্রয়ন আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপব প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়, মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম্ম, আছে নীতি, আছে সমাজবন্ধনের অসংখ্য বিধি-বিধান। কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া? আর কথা কহিলনা,

স্বামীর উদ্দেশ্যে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

—না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

—ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্ছে।

—মেজকর্তা, আমি যাই এখন?

—এসো।

রাখাল কহিল, মা চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন ত?

—আসবো বই কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তেরো বৎসর পূর্বেরকার জীবন বা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্ডা, রাখাল-রাজ এবং কুল-দেবতা গোবিন্দজীউ। গৃহ-ত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্ম-গোপন করিয়াই তাহার এত কাল কাটিয়াছে, কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেবমন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গান্নানে যায় নাই,—কত পর্ক-দিন, কত শুভক্ষণ, কত জ্ঞানের যোগ বহিয়া গেছে,—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্য্যন্ত দাঁড়াই নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে

নাই কিন্তু শুনিতে তাহার বাকি থাকিবেনা। তখন সেও হয়ত এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার 'পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই, ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন, —যেন অতিথির পরিচর্য্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকি কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নিমূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্য্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গ করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লী-গৃহে ফিরিয়া যাইবে,—তাঁহার সেবা করিয়া সেখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন রেণু জানে না তাহার বাঁচিয়া আছে—না তাহার অগাধ ঐশ্বৰ্য্যে স্নেহে আছে। স্বামীর এই কথাটা বতবার তাহার মনে পড়িল ততবারই সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়,—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি তাহার মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইলনা, তবুও রোগ-তপ্ত তাহার আপন মুখই যেন তাহার মানস-পটে বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্ত্তিই যে তাহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার স্মৃতি নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই

একটিমাত্র পাণ্ডুর, রুগ্ন মুখখানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাহার চোখে পড়েনা,—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সাহসনা দিবার বন্ধ নাই, বিপদে ভরনা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পরে দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অমুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ-পিতার পরলোকের ডাক আসে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহার কাহারো হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল যখন গাড়ী আসিয়া তাহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি-চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করেছেন।

—কখন এলেন তিনি?

—অনেকক্ষণ। বড়-ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

—তিনি কখন এলেন?

—একটু আগে। এখন হঠাৎ সে ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা দ্রুত করিল, কহিল তুমি নিজের কাজ করোগে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমনস্কর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

—ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিলেন। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি ছপুরের পূর্বেই বেরিয়ে-ছিলেন,—আজ আপনার খাওয়া পর্য্যাপ্ত হয়নি।

সবিতা কহিলেন, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া ছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ ?

সবিতা কহিলেন, আমার কাজ ছিল।

—কাজ সমস্ত দিন ?

—নইলে সমস্ত দিন থাকতে বাব কেন,—আগেই ত ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ী থাকোনা,—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে ?

সবিতা কহিলেন, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হোলনা ?

বিমলবাবু বলিলেন, না হোলনা। জ্যাঠামশাই একটু না সারলে বোধকরি বেতে পারবোনা।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে ?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিলেন, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্বেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন তাই হঠাৎ চোঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না থাকি সে আমি বুঝবো কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক পা বার হবেনা আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুন। শুনতে পেলেন ?

শুনতে সকলেই পাইলেন, বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি,—কাজ আছে।

—না না আপনি বসুন। কিন্তু এইসব বেলাল্লা-পণা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লা-পণা তুমি কাকে বলো ?

—বলি তুমি বা করে বেড়াচ্ছো তাকে । যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে ।

—কাজ থাকলেও বাবোনা ?

—না । আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ । অন্য কাজ নেই ।

—তাই তো এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয় ?

অবিশ্বাস তাহার প্রতি কোনদিন হয়না তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয় । তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারেনা ? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারোনা ?

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইহাঁদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলেনা, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে । আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো । আর তুমি আমার বাড়ীতে এসোনা ।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে কিন্তু সমস্তই এক-তরফা । হাসান্না, চৈচা-মেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায় । সেই নতুন-বোয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে । মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ী এ ? তোমার ? বলতে একটু লজ্জা হলোনা ?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন তার পরে আস্তে আস্তে বলিলেন, হাঁ আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি

কথাই বলেচো। না, এ-বাড়ী আমার নয় তোমার,—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে। তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোনা, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

—হাঁ আমি কালই চলে যাবো।

—চলে যাবো বললেই বেতে দেবো তোমাকে?

—আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা কোরোনা সেজবাবু, আমাদের মনস্ত শেষ হয়ে গেছে,—এ আর ফিরবেনা।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হাঁস হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল, ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেছি নতুন-বো এ-বাড়ী তোমার নয় আমার? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায়না?

সবিতা কহিলেন, রাগের জন্তে নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে,—হয়ত দেরি হবে,—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ী দান করার ক্ষতি তোমার সহিবেনা, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই কুটবে যে আমাদের ছ'জনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠেকেচো। দাঁড়ি-পাল্লার একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অগ্রদিকের বাটধারার ভার তোমার বুকে পাতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু আর বোধকরি দেখা হবার আমাদের অবকাশ হবেনা—আমি কালকেই চলে যাবো।

—কোথায় যাবেন?

—সে এখনো জানিনে।

—কিন্তু বাবার আগে দেখা হবেই। আনি আবার আসবো।

—সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চল্লুম। এই বলিল
সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিনলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু অমারও নমস্কার নিন—চল্লুন।

এত বড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকি রহিলনা, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অস্ত্র কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃৎ হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিলনা। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। সহরে এত অল্প মূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলিবেন! ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের কত ভাড়া বাকি পড়িয়া আছে এবং, কত ভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া স্নান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলা-বলি করচে মা ?

—কি কথা সারদা ?

—ওরা বলেছে আজই এ-বাড়ী থেকে আপনি চলে যাবেন।

—ওরা সত্যি কথাই বলেছে সারদা।

—সত্যি কথা ? সত্যিই চলে যাবেন আপনি ?

—সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন ?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার ছুঁচু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারেনা না, ভাব্চে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমিও ভাবতে পারিনে না বিনা-মেঘে আগাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে-কোথায় ভেসে যাবো। তবু, ওরা যা জানেনা আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেছি না, সম্প্রতি এ-বাড়ী আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে সে আর সহিছেনা, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারেনা।

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারেনা সারদা? এ-বাড়ী আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে এ আমি আর মানবোনা—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, না, আমার তো কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, বার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অত্যাচার, কোন অপরাধ করোনি। অহুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে। কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে তো তোমাকে সহজে খুঁজে পাবেনা না।

সারদা নত-মুখে কহিল, না না তিনি আর আসবেননা।

—এমন কখনো হয়না সারদা,—সে আসবেই।

—না না আসবেননা। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্ত সবিভা পীড়াপীড়ি করিলেননা, কিন্তু অতি-বিশ্বাসে চূপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়-ঘরের মেয়ে, বড়-ঘরের বৌ,—কোথাও একলা যাওয়া চলেনা, সঙ্গে দাসী একজন চাই,—আমি আপন সেই দাসী মা।

—কি ক’রে জানলে সারদা আমি বড়-ঘরের মেয়ে, বড়-ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি না, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, এ কথা লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন,—এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলোনা সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্ছেন। বড়-ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারও থাকে না?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারেনা সে ভয়েও নয়, আপনার অহুগ্রহের লোভেও নয়। সে হলে এ ছলনা কোনদিন-না-কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারেনা সে শুধু এই জ্ঞেই মা।

সবিতা সক্রতজ্ঞ কর্ত্তে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালোবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই, জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

—কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

—উপায় যদি না থাকে আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন বর থেকে আসোনি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তাহলে দাসীর কাজ করবোনা, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সহিবেনা মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহেনা কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামী-গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পাননা। তাহার পরে স্তদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে খুঁটিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিশ্রাস্ত আশ্রয় ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়ত আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামী-গৃহ-বাসের বহু স্মৃতি মানসপটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শাস্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্ত প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবন-যাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক থাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবেনা। মনে মনে মানিতেই হইল সে নতুন-বৌ আর

তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হোক সে-আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্য-হাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্ব্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পাণ ও দোস্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসা-লিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যাশ্রয় অধীরতা—এই কানান্ত অতি-প্রোঢ় ব্যক্তির শয্যা-পার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রিাপান করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্ত সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

—মা ?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা ?

সত্যি সত্যিই আজ চলে যাবেননা ত ?

—আজ নাহলেও একদিন ত যেতে হবে।

—কেন যেতে হবে ? এ বাড়ীত আপনার।

—না আমার নয় রমণীবাবুর।

এতদিনই এই নামটা তিনি মুখে আনিতেননা যেন সত্যিই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই। এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা ত সবাই জানি এ বাড়ী তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বস্তি আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক? লেখা-পড়া হয়নি? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও স্বেদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন এখন রাগের ওপর যদি তিনি অস্বীকার করেন?

সবিতা অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দোবোনা। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা রাগায়াগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার স্ননুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়ীটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয়না? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিলনা বলেই ত বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে, এত বড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতোনা। কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেননা—এমন কি কোরে সম্ভব হয় মা? বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড়ো নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিরূপায়, কিন্তু আমি তা নয়।

সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল তাতে ত কোন গোলযোগ ঘটবেনা না ?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,— সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটায় মাধ্য কার !

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিলনা। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়াক্রমিক গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে তিনি স্মরণ করিলেন ; তখন কি তিনি বলিলেন কি তিনি করিলেন এই সকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্ত সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন। সারদার বিশ্বয়ের সীমা নাই,—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নিচে হইতে ডাক আসিল—মাইজি !

সবিতা সচেতন হইয়া সাড়া দিলেন—কে মহাদেব ?

দরওয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ী আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নিচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, না আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজ বাবু আছেন। তিনি কখনো রাগ করবেননা।

কেহ সঙ্গে যায় এ ইচ্ছা সবিতার ছিলনা, বলিলেন রাগ হয়ত কেউ

করবেনা, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা? সারদা কহিল, আমি সব জানি না। রেণু অস্থস্থ আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশি সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার,—প্রণাম করে তাঁর পায়ে ধুলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি রকম নহে হয় সারদা? জনকালো ধরণের নস্ত মানুষ,—না?

সারদা বলিল, না না তা নহে হয়না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছেনা।

—কেন হচ্ছেনা সারদা?

—হচ্ছেনা বোধহয় এই জন্তে না, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে! মনে নহে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারিচিনে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয় একজন। বৃদ্ধ বৈষ্ণব,—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়,—মাথায় শিখা, চুলিগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গোর বর্ণ দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ—এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

—না না হয়না। আপনার হয়?

—না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ অপছন্দের জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হলো শাস্ত্রের বিধি মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো না; তারাই করে যায়া সত্যি করে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির

আশুপ্ত জেলে জীবনের পথ হাথড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার বাতায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমন কথাটাকে ঠিক সত্য কথা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলনা, বুঝিল এ তাঁর পরিতাপের প্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা ভিক্ষা। ইচ্ছা হইলনা প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায় কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিলনা, বলিল, একটা কথা ভারি জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আগাকে চাওনা,—এই ত? আর লজ্জা বাড়বেনা সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করে।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচেনা। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়ত জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আগারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেক দিন অনেক রকমে ভেবে দেখেচি কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্ম-ফল মানে তথাপি নতুন-নার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিলনা, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক জন্মের অজানা কর্ম-ফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ জন্মের ভাঙা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলক-ধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেছে বলে ত? যে-লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড়ো মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি তবু, তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি কোরে?

এবার সারদা কহিল, সলজে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেননি মা ?

—না না, সেদিনেও না,—কোন দিনই না।

—তবু পদস্থলন হলো কেন ?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্থলনের কি কেন থাকে সারদা ? ও বটে আচম্কা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই ত দেখলুম, আজ হয়ত সর্বনাশের পাকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে ছুটোখ জলে ভেসে গেছে,—ভেবেই পায়নি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভিশাপ দেবে ! দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি নিষ্ঠুর দেবতা ! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা দোষে ছুংখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের পরে ! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিলনা, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-রাস্তার পাকা-সিকান্তর অলুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিলনা এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা ?

সবিতা উত্তর দিলেননা, আর তাহাকে বুঝাইবারও চেষ্টা করিলেননা, শুধু নিশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাহিরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ী আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ী কালকের মতো অপেক্ষা করিতে অন্ত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ীর সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন নিচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি বোলো সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেননা, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারম্বার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে দুই চক্ষু প্রাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়ত এ-অশ্রু কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংঘের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইলনা, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। বন্ধাক্ষরক আপ্রান্ত আলোড়িত সাগর জল কিছুতেই যেন শেষ মানিতে চাহেনা। মেয়েটি কিন্তু সাস্থ্য দিবার চেষ্টা করিলনা, দুর্বল ক্রান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতে ঘুচাইতে পারেননা, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বোধহয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল,—বোধহয় বা' মনে আসিল তাই—বলিল, 'আজ তুমি কেমন আছো দিদি ?

—ভালো আছি।

—জ্বর আর হয়নি ?

—না, আমি ত টের পাইনি।

—ডাক্তার এখনো আসেননি ?

—না, তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কই, রাখালবাবুকে ত দেখচিনে ?
তিনি কি বাড়ী নেই ?

—না, তিনি পড়াতে গেছেন।

—তোমার বাবা ?

—তিনি সকালে বেরিয়েছেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া

পাইলনা। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

—চিনবো কি করে আমার ত মুখ মনে নেই।

—বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা' পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচিনে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নান আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখনো বলেননি?

—না। এসব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা বতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইলনা। মিনিট খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোবার জল এনেচি ত উঠুন।

এই আত্মানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তাহার পরেই আলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া নাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট কয়েক প'রে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং স্তম্ভে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের ব্যয়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন, আপনি চার-পাঁচ দিন

কিছু পাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোর-জলে লুটোপুটি করে একাকার হয়েছে সে কিন্তু আনার দোষ নয় না, সারদা দিদির। হ্যাঁ না, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আনার এ রকম শক্ত হলো কেন না? ছেলেবেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া নেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের অব্যবহারে তাহার এলো-মেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তেমনি অবিচলিত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হোক কিন্তু এই অল্পচারিত ভাবা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিলনা; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাহার অজানা নয়।

এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন, মেয়ে তাঁহাকে নিচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আঁহিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার বাই রাঁধিগে? আপনাকে কিছু খেতে হবে।

—যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা'হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো। না খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

—নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুগি নিজে বে বড় দুর্বল, এখনো পথ্যিও করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েছি, আজ আর কিছু খাবোনা। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন না? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোকে খেতে পাবেনা যে। তাছাড়া আমাদের ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্ছো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, না, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ-কথার উত্তর আসিল না, সারদা বলিল, কিন্তু আবার ছর হতে পারে তো রেণু।

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না বোধ হয় হবে না,—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদা দাদি, বতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত আট দিনের উপবাসে একান্ত দুর্বল। নেয়েটা নরিয়া নরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ জীবনের পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধকরি সবিতার আর কিছুতে মিলিতনা যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ্য করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পূজো আঙ্গিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন নিথ্রে কষ্ট

পাবেন সারদা দিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপোস করে থাকলেই আর দোষ হয়না। সত্যি নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া উত্তরের জ্ঞাত অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পূজারী-ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেননা, অথচ চিরদিন টিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অবধা বিলম্ব ঘটয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেননা।

জবাব না পাইয়া রেগু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মা'র বেলা সহিতনা, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে দেশের বাড়ীতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতোনা, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নেই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেননি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

—হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

—তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন' বছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে,—পারবে ত মা? বললুম পারবো বাবা। তখন থেকে

আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজা না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়ীতে না-থেকে থাকি। কিন্তু আজ থাকতুমনা মা। জরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিলনা ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মৰ্মাস্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেননা। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়মপালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকুই বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্যক্তচিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় ততশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়ত বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটি হয়ত তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জ্ঞাতও হুই নাই, তাহার কতদিনের কত মুখভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অহুবিদ্ধ শাস্তিহীন দিন, কত বেদনা-বিফল হৃৎস্পন্দ স্বাভি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দু'টি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্তার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ, কিসের জ্ঞাত? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাঁহারি আপনার, সে-বোঝা যদি

অপরে বহিতে না পারে সে দোষ কি তাহাকে দিবার ? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার। অধর্মের মার যে এমন নির্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর তিনি উপলব্ধি করেন নাই। শ্রানি ও ব্যথার গুরুভারে নিশ্বাস পর্য্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবল মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ইহার প্রতীকার কি নাই ? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর ? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সে-ই বিঘ্নমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না !

—না, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য তিনি সমস্ত বাধা-ব্যবধান তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এত দেরি করলে যে ? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে ? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে ?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভ ভাবে বিলম্বের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন, সবিতা বলিলেন, কিন্তু আর বেলা করতে পাবেনা। ঠাকুর পূজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্ছি !

—তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেগু, দেতো না আমার গাম্ছাটা, ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

—না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আনি তামাক সেজে দিই।

না ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের ওপর এত দরদ আর কারও হয়না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠক্লে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠক্কে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগেনা মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে ?

—হাঁ।

—মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনিত ?

—না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরিবের ঘর, কিছুই নেই। হয়ত তোমার কষ্ট হলো নতুন-বো।

সবিতা স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, সে হবে না মেজ-কর্তা, তুমি আমাকে কটু কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বো। বল্ছিলুম আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে !

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকত। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধহয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেননি। বলিতে

বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিলেন, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

—কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

—তা' জানিনে নতুন-বো, সে দৃষ্টি বোধকরি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

—দিলেন?

—কি জানো—

—সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্ম্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েছে যে মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠেনা! তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েছে ভাইপো'দের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

—সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবোনা। নন্দ সা'কে আমি ভুলিনি।

—কি করবে,—নালিশ?

—হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায়নি।

—কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে না কি? হুঃসময় কার বেশি তোমার চেয়ে? কিন্তু কা'কে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার

মতো কৃতব্রতের ঋণও শেষ কর্দক দিয়ে শেষ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটি পর্যন্ত আদায় দিয়ে তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

—তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের ?

—রাগ ত নয় আমার জালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-জন—কর্মচারী,—স্ট্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লেনা। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা-পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনেনা, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ভূবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বোঁ মরেছে জেনে যারা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাব্বে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়ত গয়ায় পিণ্ড দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিলেন, তারা যা' ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু, তুমি পিণ্ড দিতে না ছুটলেই হলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজেকে করবেনা ত সে কাজ ?

ব্রজবাবুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

—উত্তর দিলেনা যে ?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাক্ত সূর্যের কতকটা আলো জানালা দিয়া মেঝের উপর রাঙা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বোঁ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া এ সংসারে বোধহয় আর কেউ নেই যে বোঝে আগি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে

বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েছি যা দিয়েছি তার হিসেব নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গৌজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবনা। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিলেন স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি আর পারবেনা মেজকর্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

—সত্যিই বড় ক্লান্ত নতুন-বো, সত্যিই আর পারবেনা। কতো যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবেনা; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হা-হতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোট্টাতে চাইবে—তারা এই কথাটাই কেবল জেনে রেখেচে যে কলে দম দিলেই চলে। কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারেনা।

—আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুসি হবে?

—খুসি হবো কি না জানিনে কিন্তু শান্তি পাবো।

—কি এখন করবে?

—রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী যাবো। সেখানে সব গিয়েও যা বাকি থাকবে তাতে কোনমতে আমাদের দিনপাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে, কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই, সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

—রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্তা?

—দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। ভগবানে তাঁহার অবিশ্বাস নাই,

কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিত হইতেও পারে না। শঙ্কায় বৃকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল কিন্তু, ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইলনা। শুধু যে-কথাটা তাঁহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতিশোধের আর কি কোন পথ তুমি খুঁজে পেলেনা?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজের পথ বলে দাও? আমাদের রতন খুড়ো আর রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছে?

এত দুঃখও সবিতা হাসিয়া ফেলিলেন, সলজ্জে কহিলেন, ছি ছি কি কথা তুমি বলা!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলা মাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিলেন, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্তোজ্জ্বল একটুকুমাত্র হাসির কিরণে স্নেহের গুমোট অন্ধকার ঘেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পারে ঠেলে চলে গেলে সেইদিনই আমি স্থির করেছিলাম আবার যদি কখনো দেখা হয় তোমার যা কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অশ্বর্গী হবো।

সবিতার বিদ্যাহেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই, নতুন-বৌ,

সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেননা উভয়ের দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিলেন, আমি বুঝেছি মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেননা তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়,—এই ত ?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে-আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর তিনি চাহিয়া দেখিতেও পারিলেননা, নতনেত্রে মুহূৰ্ত্তে প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কবে বাড়ী বাবে মেজকর্তা ?

—যত শীঘ্র পারি।

—এখন বাই তবে ?

—এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বুঝিলেন সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাবাণ-স্তূপ উল্কাৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লভ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল আজও সে তেমন অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্দ্রও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মাছুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে আজিকার পূর্বে এ কথা তিনি কবে ভাবিয়াছিলেন !

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়াও সবিতা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, মুক্তি পাবেনা মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মাছুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আগাকে পারলেনা। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়ত তা জ্ঞানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। বাইবার সময়ে

রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল কিন্তু কিছু বলিলনা। এই নীরবতার মস্ত সে-ও হয়ত তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা একবার নেমে দাঁড়াতে হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভরকে গাড়ীতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ী চলো।

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়ীতে আপনি ত যাবেননা—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধুলা দেন।

—কেন রাজু?

—কাকাবাবুর জন্তে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজি হয়েছেন আসতে।

—কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

—তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি না। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন ব্রজবাবু কোথাও কিছু খাননা, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধহয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহাৰ্দ্দ চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা আমি যাবোনা। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ-পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়ী ভাড়ার আয়ে দিন ভালই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলোই ভাবিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ অথচ, কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাঁহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙে সেদিন সকালেও তিনি জানিতেননা রাত্রিটাও কাটিবেনা, সমস্ত ছাড়িয়া তাঁহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্থপ্নেও সবিতা কি কল্পনা করিতে পারিতেন এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু মহিল ত? আবার মহিল তাঁহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও তিনি তেমনি বাঁচিয়া আছেন—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিলনা।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল আজও তাহার কারণ নিজে জানেননা। যতই ভাবিয়াছেন, আত্ম-ধিকারে জলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছেন ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই, হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিহা, হয়ত একটাই জগৎ,—অবটন এমনি অকারণে ঘটয়াই জীবন-শ্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাস মিলেনা।)

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেননা। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করেননা, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবেন নিষেধ করা মাত্রই কি সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন একত্র বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিলনা,—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়ত, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাঁহার মেয়ের মতো মায়ের মতো। বাড়ীতে অনেকগুলি

ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চিনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে-চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার বর চাঞ্চিয়া এমনি সহসা অদৃশ হইবে!

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জ্ঞান আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই,—ছই চারিটা সাধারণ কথা-বার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যেন তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংঘনের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করেন। ক্ষুধার্ত্ত স্থাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আন্তের মিনতি, নাই উন্মাদের ব্যভিচার,—শব্দা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এই মতো—

পূর্বের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলেন, ভালোই ত আছি।

—কিন্তু ভালো ত তেমন দেখাচ্ছেনা? যেন শুকনো শুকনো।

—কই না।

—না বললে শুনবো কেন। খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্ছেননা। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন,—ছুদিনেই ভেঙে পড়বে যে।

—না ভাঙবেনা শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই বেনালাই হয়ে উঠেছে। ওটাকে ভেঙে ফেলাই এখন দরকার,—না? দত্তি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

বিমলবাবু বলেন, গাড়ীটা পড়ে রয়েছে নিছিনিছি ড্রাইভারের নাইনে দিচ্ছেন বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে বাননা কেন?

—বেড়াতে আমি ত কোন কালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই! আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

—না।

—কালও আসেননি ত?

—না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়ত কোন বাজে-কাজে ব্যস্ত আছে।

—বাজে কাজে? ঐ তার স্বভাব, না?

—হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্তরনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কই, আজ আমাকে জল দিলেনা না? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয়না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া একগ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন আজ তা'হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ান, নমস্কার করিয়া বলেন, আসুন।

দিন তিনেক পরে এমনি ধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিলেন, আজ আপনার কাজের একটু আনি ক্ষতি করবো। এখনি যেতে পাবেননা বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয় এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিলেন, কেউ বলেনি এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ,—গিছে সময় নষ্ট হয় তো?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে। কিন্তু এইজন্তেই কি কখনো বসতে বলেননা? সত্যি বলুন তো?

একথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিলেননা, বলিলেন, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

—হাঁ, প্রায়ই হয়।

—তিনি আর এখানে আসেননা—আপনি জানেন?

—জানি বই কি।

—আর কি তিনি এ বাড়ীতে আসবেননা?

—সে কথা জানিনে। বোধহয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আজ সকালে ডাকে একটা দলিল এসে শৌছেছে। এই বাড়ী রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

—জানি।

—কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল সোজা দান-পত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

—কিন্তু দান-পত্র জিনিসটা ভালোনা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানি বিমলবাবু। আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দিলে এমন সব কথা লিখতে হতো যে বা কোন নারীর পক্ষেই গোরবের নয়। তবু, বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিল ভালো।

ইতিপূর্বে একরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলেন নাই। বিমলবাবু মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয় নতুন-বো।

নতুন-বো সন্দোধানটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইলনা তিনি খুশি হইলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিলেন ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ার তবু একটা সাস্থনা ছিল কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্তে নিতে বাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে বাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়ীটা আপনার কিনে রেখেছি।

—টাকা তিনি নিলেন ?

—হ্যাঁ, ভেতরে-ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেননা।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, শুনোচি আপনার অনেক টাকা। এ-ক'টা টাকা হয়ত কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকি রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন কিন্তু আমি নেবো কি বলে ?—না সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবোনা। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয়না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিলে, কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই শুধু আপনি আর আমি। আনাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই,—বলুন ত এই কি সত্যি ? এই কি আপনার মনের কথা ?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানানো কেন ? জানিয়ে ত লাভ নেই।

—লাভ নেই তা-ও জানেন ?

—হ্যাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সম্বরণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু ?

—না জানিনে। শুধু যা ঘটেছে,—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বো, তার বেশি নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিলেন,—যা ঘটেছে সে কি তবে আনার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাঁহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখন নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও-দুটো এক নয় নতুন-বো। অস্তিত্ব নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থ-টা যদিচ স্পষ্ট হইলনা, তথাপি কথাটা সবিতার অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিলেন, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলাম, আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই,—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি এ কথা কি আপনার মনে আসেনা?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদিবা আসতে চেয়েছে তখন সরিয়ে দিবেছি।

—কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই এ জবাব পাবেন আপনি তাদের পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশি পড়েছি নতুন-বো।

—পড়ালে কে?

—সে তো একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাষ্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাষ্টার যিনি,

আড়াল থেকে এঁদের বিনি নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি কোরে আপনার কাছে তাঁর নাম কোরব বলুন ?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিলেন, আপনি বোধহয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু ?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক আপনি কাকে বলেন ? আপনার স্বামীর মতো ?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তাঁকে কি চেনেন ? তাঁর সঙ্গে জানা-শুনো আছে নাকি ?

বিমলবাবু তাঁহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি । একদিন কোনমতে কোতূহল দমন করতে পারলুমনা, গেলুম তাঁর কাছে । অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো,—না নতুন-বো, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই । ধার্মিক লোক আমি নয় ।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল । এ-কথা বুঝিতে তাঁহার বাকি নাই সমস্ত কোতূহলের মূল কারণ তিনি নিজে । থামিতে পারিলেননা, জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—ওখানে মিল না থাক কোথাও কি আপনাদের মিল নেই ? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা ?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবোনা, দেবার এখনো সময় আসেনি ।

—অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি কোরে ?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত ? কিন্তু ছেড়ে

চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

—এ-ও শুনেছেন?

—শুনেছি বই কি।

—সমস্তই?

—সমস্তই শুনেছি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিলেন, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। একটু পরে বলিলেন, কিন্তু এত জেনেও আনাকে ভালোবাসলেন কি করে বলুন ত?

—ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

—না, বলেননি বলেই ত এ-কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেছি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই,—বাকি যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে নাহুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়ত সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়ত পারতুমনা। কিন্তু সে যে রূপ যৌবনের লোভে নয় এ-কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে দ্রুতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ, এ-কথা আমি সত্যিই বুঝেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেননা শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যাথায় ভরিয়া আসিল। সবিতা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এমনি কোরে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেননা আমার ?

—জবাব নেই নতুন-বোঁ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবোনা,—
পাবার পথ নেই আমার।

—কেন নেই ? কি করে বুঝলেন সে কথা ?

—বুঝেছি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বোঁ।
একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্য্যের জোরে
এনেছিলুম তাঁদের ছোট করে,—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট,
আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে
গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু
আজ বাধে পদে-পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন, শুধুই ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন
তাদের ? কাউকে ভালোবাসেননি ?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বই কি। একজন আপনার মতোই
গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো,—তাকে রাখতে
পারলুমনা। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকি
নেই ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায়না,—তাকে হারাতেই
হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিলেন,—এই কি আপনার ভয় ?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বোঁ,—এখন এই আমার ঐত, এর
থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেছি,
আপনার স্বামীকে দেখে এসেছি। কি কোরে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে

তিনি চলে গেছেন তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকি কিছু নেই। এর পরে আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ! জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবোনা, আবার তার চেয়েও বেশি জানি যে ছোট না করেও আপনাকে পাবার আনার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই তো বলেছিলুম নতুন-বৌ, মিন আনাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধ বলে। এই বাড়ীটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন, কত কথাই যে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মূল তুলিয়া কহিলেন, এ বন্ধু কতদিন স্থির থাকবে বিনলবাবু? এ মিথ্যার আশ্রয় চিৎকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আশাদের টেনে নানাঘেট। সে ধামারে কে?

বিনলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো কিয়ৎ নন ভোলাবার আয়োজন করবোনা। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো ছোটখাটো দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আনাকে ডাকবেন—বৈচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্তে নয়—আসবো নাথার তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল, কহিলেন, আপন পরিচয় পেতে আর বাকি নেই বিনলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইচ্ছা-জীবনে বদলাবেন। শুধু আশীর্বাদ করুন যে দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা'র বেন সহিতে পারি।

বিনলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবোনা, শুধু প্রার্থনা করবো যেমন করেই এসে থাক্ এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

—কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

—তা ও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকি আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয় এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিলেননা, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। দুখ যখন তিনি তুলিলেন তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাঁহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারি হইয়া উঠিয়াছে, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তারক বর্দ্ধমানের কোন্ একটা গ্রামে মাষ্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। বাবো দিনকতক তার কাছে ?

—যাও।

—তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে ?

—থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আফিস খুলেচি তার অনেক কাজ বাকি।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, টাকা ত অনেক জমায়ে—আর কি করবে ?

প্রশ্ন শুনিয়া বিনলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাইনি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ,—ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হ'লে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন, বলিলেন, এ বাড়ীটায় আর আমার দরকার ছিলনা—ভেবেছিলাম ভালোই হলো যে গেলো। একটা ঝগড়া মিটলো। কিন্তু তুমি তা মনে দিলেনা। ভাড়াটেরা রইলো, এদের দেখো।

—দেখবো।

—আর একটি অমুরোধ করবো—রাখবে?

—কি অমুরোধ নতুন-বো?

—আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন কিছুই বলিলেননা। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিলেননা কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের বড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে কপালে ঠেকাইলেন, সে স্বামীর উদ্দেশে না বিমলবাবুকে বোধকরি নিজেও জানিলেননা। একমুহূর্ত্ত মনো থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো,—সে শুধু আমিই জানি আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়ীতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলোত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে বিনি পাঠিয়েছেন-সেদিন তাঁর খেলা ছিলনা। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি কোরেই বোধকরি সে বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বা'র কয়েক বাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না না? উঠতে হবে?

সারদা ভারি অপ্রতিভ হইয়া বারবার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না, কখনো না। দেরি হয়ে গেছে আপনার,—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন,— বলিলেন, তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবোনা মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে।

চল্লুম।

দবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, কিন্তু সারদার অভ্যুদয় যোগ দিলনা।

বিমলবাবু প্রত্যাহের মতো আজও প্রতিনমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গেলেন।

রমণীবাবু আর আসেননা, হয়ত ছাড়াছাড়ি হইল। দু'জনের মানা-
 গানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায়না। আড়াল হইতে
 চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষন্ন মুখ,—পূর্বের তুলনায় কত না প্রভেদ।
 জ্যেষ্ঠের শূন্য অকাশ আঘাটের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের
 কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-শাপে, গাছে গাছে লাগ-
 রাছে অশ্রু-বাপ্পের সক্রম স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে গগনে-পবনে সর্বত্র
 দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে
 উগ্রতা ছিলনা তাঁর কোনদিনই, তথাপি, কিসের একটা অজানিত ব্যবপানে
 এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে-দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া
 তাঁহাকে টানিয়া আনিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ীর মেয়েরা এই
 কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের
 দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু নোটের উপর ছিলেন ভালোনাভূষ লোক, থাকিতেন পরের
 মতো; কাহারো ভালোতেও না মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া-
 বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অল্প অসদাচরণ করেন নাই।
 তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার
 কলঙ্কিত-পথে নতুন-মার সকল কালী যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের
 পরিবর্তে তাহারা উল্লাস বোধই করিবে। এ-ঘেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া
 নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না
 থাকিলে তাহারা বা দাঁড়াইবে কোথায়। আজ সারদা এই বিষয়েই
 তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়ীটার একটা ব্যবস্থা

হলো। তোমরা বেনৈ আছো তেমনি থাকো—তোনাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবেনা, না বলে দিলেন।

—তবে বুঝি না আর কোথাও বাবেননা সারদা ?

—বাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেশি দিন থাকবেননা বললেন। আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অল্প সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিনয়বাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করেন। পূর্বে তাঁহার আঙ্গিক সারিতে বেশি সময় লাগিতনা কিন্তু এখন লাগে ত-তিন ঘণ্টা। কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে কোন-দিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নিচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন ? তারপরে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, না-জানি কত ভুল-চুকই হয়েছে ! না ?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুল-চুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটাত কিছুই এগোয়নি দেখচি।

—না। সময় পাইনে যে।

—পাওনা কেন ?

—কি করে পাবো বলুন ? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

—নতুন-মার দাসী চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলোনা কেন তোমারো সময়ের দরকার, তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারি অন্তায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া নান হইলনা সে কিছুনাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম দান্য দেবতা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আপনার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় অর, ঘরের মধ্যে কেলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটেনা। এত রোগা দেখচি কেন বলুনত?

রাখাল বলিল, রোগা নই বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাদ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয়তো কি! হলো অর তা-ও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

—কাজে লাগবেনা? তুনি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে এ-সব কিছু কাজে লাগবেনা। আপনাদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। এক ছত্রও আর আমি লিখবোনা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবেনা'ত আমার ধার শোধ দেবে কি কোঁরে?

—ধার শোধ দেবোনা স্বামী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া ধরিয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিলনা। বরঞ্চ একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারোনা 'ও-গুলোর দতিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হর্যাস করার—আর কিছু না। কেবল কতকগুলো রামায়ণ মহাভারতের কথা—এখান-সেখান

পেকে নেওয়া—ঠিক যেন বাত্মার দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্তে লিখতে বাবো ?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিষয়াপন্ন তার চেয়ে বেশি হইল বিপদাপন্ন। বস্তুতঃ লেখাগুলো তাই বটে। সে বাত্মার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু মহলে প্রকাশ করেনা, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায়না সে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কলান হয়না। তাহার ইচ্ছা নয় যে উপার্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারি লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়ত তাহা সত্য নয়, হয়ত বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়ত বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিজ্ঞা—যতটা জানে আইনষ্টাইনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সাক্ষাৎ-ক্রিয়ার আনটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় হয় পাছে গর্তে পা পড়ে। বাত্মার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন ছষ্টু হয়ে উঠলে কি কোরে ?

সারদা হাসি চাপিয়া কহিল, ছষ্টু হয়ে উঠেচি ?

—ওঠোনি ? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি ?

—বল্চি। আগে আপনি বলুন ছ-গাতদিন আসেননি কেন ?

—শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

—মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশি। এ-কে

শ্রীর পাশাপাশি বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, নাকে নানী বলে ডাকেন সে-ও ছিল শয্যাগত। ষোভ জালিয়ে নিজেকে করতে হয়েছে সাঙু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধু-বান্ধব আছে অনেক, ছাদের কাউকে খবর দেননি কেন ?

প্রশ্নটা রাপালের নতুন নয়,—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাটি বটয়াছিল। কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল,—এ-কথা স্বীকার করিতে পারিলনা যে সংসারে বন্ধু-সংখ্যা বাহার অপরিমিত দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব।

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেননা কেন ?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা বাবেন আমার সেই গচা ঐন্দো-পড়া বাসায় সেবা করতে ? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অস্থখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে ?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সন্ময়ে দিলেনা। শুনে নতুন-মা বললেন রাজু আমার রেগুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মধ্যে অন্ন জুগিয়ে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা কোরে, নিজের সনস্ত পুঁজি কুইয়ে ডাক্তার-বত্তির ঋণ স্তূপে। আর ও যখন পড়লো অস্থখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্ঠায় কল থেকে জল আনতে, উতুন জেলে আপনি করলে ফিদের পথিয়া তৈরি, ও ওষুধ পেলেনা আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন না,—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অস্থখে পরের নাম কোরে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে,—তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেবতা ? কেরাণী-গিরি কোরে আজও টাকা শোধ দিইনি সেই রাগে নাকি ?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো কোরেই তুলচো। জর কি কারো হয়না? ছুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে-দয়া আমাদের ওপর,— আপনাকে না। আসলে আপনি ভারি খারাপ লোক। বিব খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেননা,—হাঁসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই. আবার অল্পদিকে অস্থখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তা-ও আপনার সইলোনা। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেননা? কি করেছিলুম আপনার? এ-জন্মের ত দোষ দেখিনে এ কি গত-জন্মের দণ্ড না-কি?

রাখাল জবাব দিতে পারিলনা, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখ-চোর. চাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিলনা। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতে বলিতে পারিতনা, কিন্তু এছিল রাত্রিকাল— নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্ধজন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্ত্রাতুর, তাই অস্তগূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের শ্রোতঃপথে অব্যাহিত বাহির হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জ্জনী শাসন আক্ষেপ করিলনা। বলিতে লাগিল, জানেন দেবতা, জানি আমি কেন আপনি আজো বিয়ে করেননি। আসলে মেয়েদের-ওপর আপনার ভারি ষ্ণণা। কিন্তু এ-ও জানবেন বাদেই আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতের নিরিখ নয়। জগতে অল্প মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল আজ তোমার হলো কি বলোত?

—সত্যিই আজ আমার ভারি রাগ হয়েছে।

—কেন?

—কেন! কিসের জন্তু আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন।

—দিলেই বা কি হতো? সেখানে অজ্ঞ কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃষ্টচোখে কহিল, যেতুমনা ত কি শুনে চুপ করে বসে থাকতুম?

—তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

—ফিরে আসবেননা তা আপনাকে অনেকবার বলেছি। আপনি বলবেন তুমি জানলে কি কোরে? তার জবাব এই যে, আমি জানবোনা ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ-ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়ীতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার বরে এসে বসেন,—যদি যেতে না দিই ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাসা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বই কমিবেনা তাই জোর করিয়া কোন মতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতোনা। কিন্তু আজ এলে তাঁকে অজ্ঞ কথা বলতুম। বলতুম, যে-সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসতো,—যে কত যে সয়েছে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে

ফেলে গেলে, ফেরবার পথ বার কোথাও খোলা রাখেনি, সে-সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়,—তোনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ-সারদা অল্প জন। তার পুনর্জন্মে তার পরে আর কারে দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল শুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেবতা, হাঁসপাতাল বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি কোথায় বেতে চাও, উত্তরে আমি বারবার কেঁদে বলেছি আমার বাবার যাগগা কোথাও নেই শুধু একটা স্থান ছিল—সেখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ কোরে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনব্যাপ্তে তোমার দোখনি শুধু বাড়ীর লোকের মুখে তার নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্থানীয়? সবই মিথ্যে?

—হ্যাঁ সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্থানীয় নয়।

—তবে কি তুমি বিধবা?

—হ্যাঁ আমি বিধবা।

আবার কিছুকাল নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা আমি অতো অবুধ নই। তোনার চেয়ে ঢের বেশি অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখন বুকিল এ অনধিকার চর্চা, এ তাহার আপন অপমান। এ কি বিস্তী কটু কথা হইয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল।

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হাঁ তিনি আমার মা-ই তো। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছেন কিনা বলতে চাওনা, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবেনা এ আমি নিশ্চয় ধরেছি, কিন্তু কি এখন করবে ?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

—কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা ?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়,—নায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকি, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্তার মীমাংসা হয়না।

সারদা বলিল, বত টাকারই দরকার হোক আপনার কেবাণী-গাঁরি করতে আমি পারবোনা। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নিচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে তো ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জ্ঞানবেনা—দুর্ঘটনায় লোকে বলেনা—আমার লজ্জা কিসের ?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধষ্টতার জন্ম শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার বাহসে বাবিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঐ বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমা, না ডাকছেন তোমাকে।

—মা'র আহ্নিক কি শেষ হয়েছে ?

—হাঁ, হয়েছে বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেননা মা'র সঙ্গে দেখা করতে ?

রাখাল কহিল, তুমি বাও-আমি পরে যাবো।

—পরে কেন ? চলুননা দুজনে একসঙ্গে যাই,—বলিয়া সে চাপ্পা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া মিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল বরখানি দে-রসে, মাধুর্য্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মাল্লবের হাতের নতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কত দিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানি আজ যেন আর রহস্তের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন ? বক্ষে নিগূঢ় অন্তস্থলে এ কে কথা কয় ? কি বলে ? স্বর অশ্রুটে কানে আসে ভাষা বুঝা যায়না কেন ? কত-শত মেয়েকে সে চেনে, কত দিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্য্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কোতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—নের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটি মাত্র মেয়ের মুখের কথাই বে বিস্ময় আজ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোণের তাহার তুলনা ? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ ? তাহার ত্রিশ বর্ষ কত সে-অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল ? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই, এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেলনা ?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিয়া অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কত দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কেন বৃহত্তরের আশায় ? কিন্তু তবু দিখা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংসার কুণ্ডা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, শৈশবাচারের কলঙ্ক

প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্‌ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে বাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়,—গাড়ীর বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তারপরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখের সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ। সেই দুঃখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবোনা দেবতা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল,—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু না ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উল্টাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না-আসার কথা, তাহার অস্থখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেননা, শুধু স্নেহাঙ্গী স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা গন্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন বত জ্বালাতন আমি করেচি ততো আপনার রেগুও না। তারপরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে,—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে

তোলা ছিল সে তখন শুধু টের পেলুম। ঠাকুর-ঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সহিতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরওয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখেনি।

রাখাল সহাস্ত্রে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্তে। অভ্যাস ত নেই, দুঃখের দিনে মনেই পড়েনা মা ত্রিসংসারে আমার কোথাও কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেননা,—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়ালে হইতে বোধহয় শুনিতেন, স্নমুখে আসিয়া বলিল, দেবতাকে খেয়ে বেতে বলুননা মা, সেই তো বাসায় গিয়ে গুঁকে নিজেই রান্নাধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তারপরে স্মিত-হাস্তে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রান্নাধতে হয় এ-বেন ও সহিতে পারেনা—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন, এ কথা সারদা একটি দিন ভোলেনা।

পলকের জন্ম রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন জীকে যে কি কোরে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন। এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার গুঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেননা।

সবিতা কি একটা বলিতে বাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়াতাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চার দিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আনাকে মাগুষ,—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন ওর না আছে বাড়ী-ঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম। কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু-বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অজ্ঞায় আদেশ মা কখনো দেবেননা।

সারদা বলিল, কিন্তু দিলে ?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিল খাবার তৈরি হইয়াছে। রাখাল বুকিল ও আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরী করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন কয়েক গিয়ে তার ও-খানে থাকি। স্থির করেচি বাবো।

—প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি ?

—চিঠিতে নয়, দিন দুয়ের ছুটি নিয়ে সে নিজেকে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে ! যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কল্‌কাতায় ? কই আমি ত জানিনে।

সবিতা বলিলেন, জানানো ? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দু'টো দিনের ছুটি কিনা ?

রাখাল আর কিছু বলিলনা, মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে

লাগিল। তাহার মনে পড়িল অস্থখের পূর্বের দিনই সে তারককে একথানা পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে বলিয়াছে ইদানিং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়ীতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারি অমুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেবতা?

—খাবো বই কি। বেদিন বলবে।

—তবে পরশু। এগনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবেনা কেউ শুনবেনা।

রাখাল সহাস্ত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেবতা, দোষ আছে চুপি-চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনে।

—সত্যি পারোনা, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবোনা, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখালের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল বেশ, তাই হবে— পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশি নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিলনা। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,

রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়ত আপনার রাত হবে,—কিষ্কা হয়ত ভুলেই যাবেন আসবেননা।

—ভুলে যাবো এ তুমি কখনো ভাবোনি সারদা, তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

—দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহ্যিক কিছুতে নাই। রাখাল খুসি হইয়া বলিল, ঠিক এমনিই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো বহু দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে। কত জিনিস হয়ত ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করেনি।

সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেবতা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হতোনা, হয়ত করতুমও—নষ্টও হতো।

—ভালো বুদ্ধি তোমার!

—ভালোই ত। নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অগ্নায় ত কম নয়। দেনা শোধ করেনা আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবেনা, ভাবতেও হবেনা। কেবল খাতাটা দাও আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাঙ্গীর্ষ্যে মুখ গঙ্গীর করিয়া বলিল, তাহলে ছাড়-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেননা আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না। কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারি দুষ্ট সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলেনা?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেবতা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে কেউ চিনতেই পারেনা।

একটুখানি খামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যিই আমাকে তিনি চিনতে পারেননি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিলনা।

রাখাল কোতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

—উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

—বলে ভার নিতে?

—নিতুন বই কি। ভেবেছেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে, মেয়েরা পারেনা? পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

—ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এই জন্তে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুমনা তো,—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, দেবতা, আপনি বিয়ে করেননি কেন ? সত্যি বলুননা ।

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি ?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারি জানতে ইচ্ছে করে । সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবোনা আপনাকে বলতেই হবে ।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজেকে বিয়ে করে । আমার হয়নি দেবার লোক ছিলনা বলে । আর নিজেকে সাহস করিনি গরিব বলে । জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিছু নেই ।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্তায় কথা দেবতা । গরিব বলে কি মানুষের বিয়ে হবেনা ? তার সে অধিকার নেই ? জগতে তারা এমনি আসবে আর যাবে কোথাও বাসা বাঁধবেনা ? কিন্তু সে তো নয়, আসলে আপনি ভারি ভীতু লোক,—কিছু সাহস নেই ।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ,—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই ।

—কিন্তু ভাগ্য ত চিরকালই অনিশ্চিত দেবতা, সে ছোট-বড় বিচার করেনা আপন নিয়মে আপনি চলে যায় ।

—তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই । নিজেকে ত বদলাতে পারবোনা সারদা ।

—না-ই বা পারলেন । যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে,—নইলে কিসের স্ত্রী ? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে ।

—করতেই হবে নাকি ?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে নইলে কিছুতে আমি ছাড়বোনা। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিলনা বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিনে আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরিবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও বা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়। কাঙালের নতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্তেই ভগবান গরিবের সৃষ্টি করেননি। এ বিত্তে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াগ্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিত্তে শিখতে যদি সে না পারে,—শিখতে না যদি চায় তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো ?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ-কথা সে বুঝবেনা, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারেনা দেবতা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবোনা।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিলনা যে মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায়না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহায়ে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল কই কিছুই ত বললেননা দেবতা ?

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে ? ভাবতে সময় লাগে যে !

—সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি ?

—সে কথা আজই বলবো কি ক’রে সারদা? যেদিন নিজে পাবো উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা বন নিখাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজে নৃহ হাসিয়া বলিল, কিছু না তো! একটু পরে বলিল, পরশু বোধহয় আমরা হরিণপুরে যাচ্ছি দেব্‌তা।

—পরশু? তারকের ও-খানে?

—হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়ীতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

—বাওয়া স্থির হলো কি ক’রে?

—কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

—তারক এসেছিল কলকাতায়? কই, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি।

—একদিন বই ত ছুটি নয়,—ছপুর বেলায় এলেন আবার সন্ধ্যার গাড়ীতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

—শুঁর নতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিজেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত

ভারি বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে নিয়ে গাড়ীতে গিয়ে রাখলেন।
আপনি কখনো পারতেননা দেবতা।

রাখাল স্বীকার করিল, না আমি পারতামনা সারদা—আমার গায়ে
জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

—কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা
করেননি। তারকবাবু বলছিলেন চেষ্টায় সনস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায়
মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলেন কেন? তার জবাবটা হয়ত আমার
কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ, জিজ্ঞেসা করবো। কিন্তু
এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর
জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবেনা। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর
উপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের
ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

—কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েছে তাই বলবুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিলনা।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা
ছোট বায়গার ছোট ইন্সকুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি
নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েছে
সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েছে মাথা হেঁট করে, তাই সহরে ফিরে আসতে চান।
এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার না
তার সারদা?

—না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেছি।

—শুনে নতুন-মা কি বললেন ?

—শুনে মা খুসিই হলেন। বললেন তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অত্যাশঙ্কিত। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

—করবেন কি ক'রে ?

সারদা বলিল, শক্ত নয়তো দেবতা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন ত কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য্য কি ?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানেনা। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলিচি।

মিনিট কয়েক পরে হাত-মুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তারপরে অদূরে গেষের উপরে বসিয়া বলিল, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন ?

—চলে গেছেন ? কই না। কোথায় গেছেন ?

—কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন কিন্তু এখানে আর আসেননা। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিলনা—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল ক'রে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ করি আমার কাছ থেকে জীবনবাবুও যায়নি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত আম্লপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই, কিন্তু উপলক্ষ্য হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অস্ত্রথে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অত্যাশঙ্কিত মাকে ভেঙে গড়লো, এ-ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেননা। আমাকে ডেকে বললেন!

সারদা, রাজুকে আজ আমার চাই-ই, নইলে বাচবোনা। এসো তুমি আমার সঙ্গে। বা কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায়, তারপরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ী, কিন্তু সব খালি সব শূন্য। নোটিশ ঝুলছে বাড়ী ভাড়া দেবার। জানা গেলনা কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়ত বেঁচে আছে, হয়ত বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলচে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানার শুয়ে ছ-চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম,—এ-ছাড়া সাহসনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে,—বললেন চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটী-পতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না সে হবেনা। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা' নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ-দেখানো ছিল বোধকরি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার প্রবেশের অত্যাঁয় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলামনা। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা,

ভালো আপনি নেই। কিছু কাল আগে ছবি আপনার দেখেচি, আর আজ দেখচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারেনা, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি,—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ী আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেননা?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

—না আমি যেতে পারবোনা।

তারপরে সূর্য হলো অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে-যে কত কটু আমি বলতে পারবোনা দেবতা। ঘৃণি হওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে বত ছিল নোঙরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলোনা যে মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়,—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েছে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এত বড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেবতা?

রাখাল নিম্পলক চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া ছিল এবার ক্ষণিকের জ্ঞান একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা শুদ্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি।

রমণীবাবু চোঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কি না বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কর্তৃক পূর্বের চেয়েও মূঢ় হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? যুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখেছিলুম। কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙেচে। আর তুমি এসোনা এ-বাড়ীতে, আর যেননা আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ বেন ঘুণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ী কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ী আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ-জবাব রমণীবাবু আশা করেননি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো,—ভয় পেয়ে নানা ভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েছে কিছুতেই সে আর ফিরবেনা।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা'কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মা'র অপমান তাঁর কি-যে লাগলো,—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ী কিনে

নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় বেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুঁসি করিতে পারিলনা, তাহার মন যেন দগিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়ত তাঁর কাছে কিছুই নয়,—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়।

সারদা বলিল, হয়ত তিনি আর পর নয়, হয়ত নেওয়ার চেয়ে না-নেওয়ায় অঙ্গায় হতো ঢের বেশি।

রাখাল বলিল, এ-ভাবে বুঝতে শিখলে স্রুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়ত দেখা হবে।

সারদা তড়িৎ বেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন ক'রে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবোনা।

—তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে,—যাবোনা?

—যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেননা?

—আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার সর্ত্তও তো ছিলনা। চুপি-চুপি এসে তেমন চুপি-চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল, না সে সর্ত্ত আর আমি মানবোনা। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে-প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো যুঁচবেনা,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।”

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গুঁড় বেদনা সে চাপা দিতে পারিলনা, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ

করিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি, দেবতা, ক্ষুদ্রতা দীর্ঘা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেবতা বলে ডাকি দেবতা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে যে তাঁর যাওয়া হবেনা।

—আমি না বললে যাওয়া হবেনা? তার মানে?

—মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হ'লে তার মত নিতে হয় মা। জানি রাজু বারণ করবেনা কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবোনা সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্বপ্ন হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে ছালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিলনা, তথাপি ছুচোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বোলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধুলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল উদ্ভরের দ্রুত অপেক্ষা করিলনা।

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া বাত্ৰা করিবে। সঙ্গে বাইবে জন দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণ-পুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-বাত্ৰায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে এ দিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্য্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়া-পায়েই জন্মেছি। আমার জন্তে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায়না মা, যে-কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ হয় আপনারও তা সহিবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেননা, কিন্তু তেতরে-তেতরে শরীর ভেঙে যাবে।

—ভাঙবেনা তারক ভাঙবেনা। আমি ভালোই থাকবো।

—তাই হোক না। কিন্তু দেহ যদি ভাঙে আপনাকে আমি ক্ষমা করবোনা তা' বলে রাখ্‌চি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা দুই জোর আলো চাই, রাত্রের চলা-ফেরায় উঠানের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে।

একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলার কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক, জানালার পর্দাগুলো কাচাইয়া রাখিয়াছে বটে, তবু, নূতন গোটা কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খাননা সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কয়-লাগা কানা-ভাঙা পাত্রগুলো কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আফ্রিকের সাজ-সজ্জা ত কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগায়ে মিলেনা,—সে ভুলিলে চলিবেনা। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছোট খাটো জিনিস-পত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধা-ছাদা চলিতেছে, কালকের জন্ত ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যোগন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিলেন, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশি নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অশ্রু মানে করবে নতুন-বৌ

অর্থাৎ, নতুন-বোয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে এই তোমার ভয়,—না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিলেন।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবেনা বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে আর কোথায় গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিলেন, তুমি হয়ত ভাব্‌চো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে

গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ী হ'লো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হ'লো কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কত দূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম,—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-দিন পর্য্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ এক সময়ে আনার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, যৌবন গেছে, রূপ ত আর নেই। তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করেনা,—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয় সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবেনা,—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারি এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বো?

হাঁ, করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিলনা। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ, রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বো।

শুনিয়া সবিতাও হাসিলেন, বলিলেন, আশ্চর্য্য নাহুষ তুমি। এ ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য্য নয় নতুন-বো। এই ত সেদিন এমন ক'রে ঠকলে, এতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি ক'রে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি।

সবিতা কহিলেন, আঘাত পেয়েছি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে বাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো, হয়ত এমনিই চিরদিন বয়ে যেতো,—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদির জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল

কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

—আমার নামটা বুঝি বলতে চাওনা?

—না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশি বাধবে নতুন-বো।

—কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিলেন, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারি পছন্দ হয়েছে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকে। কিন্তু যা' জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে তো বললেনা?

—কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

—এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, ভালো-বাসি এক কথা ত বলিনি। বলেছি তুমি বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেছি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসেনা।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিত স্বরে কহিলেন, কিন্তু আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললেনা ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই

নেই নতুন-বো,—তুমি ঠিক কথাই বলেচো। ভালবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারেনা। তার নিজের দুঃখ বতই হোকনা সহিতে তাকে হবেই।

সবিতা কহিলেন, কেবল সহিতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বো। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশি।

—এ কথা ত তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময়।

—না, খাটেনা। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা' নয়। হতেও পারিনি। কিন্তু সেজন্তে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে, জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ক্রটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

—কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে?

—তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে শুদ্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বো। তুমি হয়ে বাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয়, তার থেকে তুমি অনেক দূরে,—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়েও যে-লোক মিথ্যা বলিতে পারিলনা, তাহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ,—এমন বিপরীত ঘটনা কি ক’রে সত্যি হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বোঁ। আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয় তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিলেন, উত্তর যদি কখনো না পাই, সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উল্টো মুখেই বয়, তবু তুমি আমার ভার বয়ে বেড়াবে?

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উল্টো মুখেই বয় তবু তোমাকে আমি দোষ দেবোনা। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয় সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর নতোই বিদায় নিয়ে যাবো,—কোথাও মালিত্তের চিহ্ন মাত্র রেখে যাবোনা তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বোঁ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মিনিট দুই তিন পরে বিমলবাবু স্নান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবচো বলো ত?

—ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্তার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালোবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায়না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজ সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে, অন্ধকারে কেবলি হাংড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েছে।

—পথের সন্ধান পেয়েছিলে ?

—হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিলনা সেখানেই পেয়েছিলাম।

—তার মানে ?

—মানে এই যে, যে-কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয়না নতুন-বো।

সবিতা কহিলেন, আমি বাই কেননা করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছিলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো ?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বো। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় কোরে পেতে,—সে আমি পেয়েছি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে-বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুক্কাত বশে, দুর্বলতা বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবেনা কেউ,—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিলেন। যা' অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বৃকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কই ?

সারদা আগিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

—রাজু ? কই সে ?

এই ত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝের পাতা গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমার
তার হরিণপুরের বাড়ীতে। শুনেছো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি না।

—হঠাৎ ত নয় বাবা। ওকে যে তোনার মত্‌ নিতে বলেছিলুম।

—আমার মত্‌ কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোনার বন্ধ, তার কাছে
যেতে তোমার আপত্তি হবেনা।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তারপরে বলিল, আমার
মতামতের প্রয়োজন নেই না। আমার চেয়েও আপনাদের সে ঢের
বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই না, মুখের ভাষায়
তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবোনা, কিন্তু আমার মতামতের
পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না-যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া
আপনাদের হবেনা। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু।
আমার কথা পেয়ে তারক জিনিস-পত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের
জন্মেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে
—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার
মত নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়।
কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার
মত্‌ নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ-কথা আমি
চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু বে-ছেলের শুধু পরের বেগার

খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন, রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেননা নতুন-মা, মাহুঘের অবজ্ঞার নীচে মাহুঘের ভার বয়ে বেড়ানোই আনার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবোনা।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতোছিল, সহসা সে যেন আর সহিতে পারিলনা, বলিয়া উঠিল, আপনি অনেকের অনেক কিছুই করেন কিন্তু এমন করে নাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু, এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবেনা।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেছি, ওরা কড়া কথার স্বযোগ পেলে ছাড়তে পারেনা, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনার শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটাই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু ?

—না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

—আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায়নি সে ?

—কোনদিন না। সারদা বলে আমার বাসাতে যাবার সে সময়

পায়না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল। বিমলবাবু এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবেনা নতুন-বো? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমিই নিজেই তো এখনো জানিনে।

—যখন জানতে পারবে দেবে?

—দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলোনা তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিন মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধূলা লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ও-খানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্তে। এখানে ভালো লাগছেনা বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো। তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

—সত্যি বলা রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবেনা। আমি নিষেধ করবো।

—আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

—অস্তুতঃ নিজের কাছে নতুন-বো এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবোনা।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শাস্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নিচে নামিয়া গেল।

নিচে পথের একধারে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেবতা।

—কেন?

—সারদাদের অনেক দেখেছেন বললেন। আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

—কি হবে নিয়ে?

—মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিলনা, সংসারে কেবল একটাই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা,—বেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক্ কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন ?

সারদা বলিল, বাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে ।

—ধুলো ত পড়লো এবার উঠি ?

—এতই তাড়া ? ছুটো কথা বলবারও সময় দেবেননা ?

—সে ছুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা । তুমি বলবে দেবতা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকি বাড়ীভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবোনা । এর মধ্যে নতুন কিছু নেই । তবু যদি বাবার পূর্বের আরো একবার বলতে চাও বলে নাও । কিন্তু একটু চট্-পট্ করো আমার বেশি সময় নেই ।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন নাহোক ভারি মিষ্টি । যতবার শোনা যায় পুরনো হয়না,—ঠিক না দেবতা ?

—হাঁ ঠিক । মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনায়, আমি অস্বীকার করিনে । সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম । কিন্তু সময় হাতে নেই । এখুনি বেতে হবে ।

—গিয়ে বাঁধতে হবে ।

—হাঁ ।

—তারপরে খেয়ে শুতে হবে।

—হাঁ।

—তারপরে চোখে ঘুম আসবেনা, বিছানায় পড়ে সারারাত ছটফট করতে হবে,—না দেবতা?

—এ তোমাকে কে বললে?

—কে বললে জানেন? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই,—সে-ই।

রাখাল বলিল, তাহলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে-দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবেনা।

সারদা কহিল, বেশ, আর ভাব্বোনা। আপনার কথাই শুনবো কিন্তু, আমিই বা কোন্ অপরাধ করেছি যার জন্তে ঘুমোতে পারিনে,—সারারাত জেগে কাটাই?

—সে তুমিই জানো।

—আপনি জানেননা?

—না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই।

—সময় নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা, দেবতা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেননা সারদা, হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবেনা। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান কিন্তু তুমি যাবেনা। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইলনা, তাই কতকটা

হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেছো যাবে, খামোকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্তে ?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্তে যে আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই তো সবচেয়ে বড় কারণ দেবতা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলেনা। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে সারদা, হরিণপুরে তুমি বেতে পাবেনা।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্ডায় অধিকার আমি কারো পরেই খাটাইনে।

—রাগ করে বলছেননা ত ?

—না, আমি সত্যিই বলছি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,—কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেবতা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি আমার হরিণপুরে যাওয়া হবেনা, দেবতা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবোনা। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন কেবল পরের হুকুম মেনে-মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন! এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের পরে। যে-লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

—এ তুমি কাকে বলচো ? আমাকে ?

—হাঁ আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি, মনে রাখবো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়ত এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করেনা?

—জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়ত কিছুই হবেনা। হয়ত, আমারও সময় এসেছে বোধবার। তবু একটা কথা বলি দেবতা, অকারণে নিশ্চয় হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাঁসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অল্প শিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বউ। বল্লে আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধে খে-টুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেছেন বিমলবাবু,—ঐশ্বর্যের সীমা নেই ধাঁর—এসেছে তারক, এসেছেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকি নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বলন্ত?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিলনা দেবতা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়ে-মাহুষ বলে। তার লজ্জা ঢাকতে।

একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবোনা। কাল না আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিস-পত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে-টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো ?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরিব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমালে বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তাহলে এই নিন। কিন্তু, টাকা দিয়ে আপনার ঋণ-পরিশোধ হয় এত নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অত্মায় আর একদিন আপনাকে বিধ্বংস করিবে। কিছুতে পরিব্রাজ্ঞ পাবেননা বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে ?

না।

তাহলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তারপরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইলনা এই মাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান-অভিমানের পালা সাক্ষ্য করিয়া আসিল সে কিসের জন্ত। কিসের জন্ত এই সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী,

সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়েনা। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহু প্রকারে জানাইতে বাকি রাখে নাই। পায়ের পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ক্রটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাসে জানায় হয়ত, তাহার অর্থ শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়ত সে আরও গভীর আরও বড়। হয়ত সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে ছুলিয়া উঠিল। বহু দিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ বস্তু এমনি অভাবিত যে সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিনী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল আমি গরিব বলেই ত কাঙাল-বৃত্তি নিতে পারিনে। অবলাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয়না,—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে, কিন্তু যে-অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে-মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল যি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

যি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায়

সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি,—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যিই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিষ ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিলনা। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বপ্নাহার রাত্রে ভূরি-ভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ, আজ তাহার কথা শুনিয়া রাখালের চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বলোত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝি'র চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। বুড়ো হয়েছি মরবোনা? কতদিন বলেছি তোমাকে কিন্তু কান দাওনা—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবোনা, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দুদিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবোনা দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তাহলে সে-সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘর-বাড়ী নেই, বাপ-মা আপনার লোক নেই, মোটা মাইনের চাকরী নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাওনা নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা' যেন দিলে, কিন্তু বউ এসে থাকে কি বলোত? খাবি থাকে না কি?

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা, গেরস্ত ঘরে সবাই বা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবেনা, —জীব দিয়েছেন যিনি আহাৰ দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। সোখীন মাছ, ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন চারিটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে,— বলিতে কিছুই হয়না।

ঠাই করিয়া, খাবার পাত্র মাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিবা দিয়া গেল পেট ভরিয়া থাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল কহিল, তাই হবে নানী পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবোনা।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইঞ্জি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘণ্টা দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্ত সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারেনা, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সম্বরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকি নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিলনা, ইচ্ছা করিল আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের বে-কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকরণ লাঞ্ছনা। অথচ, ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক আমার রান্না,—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে সারদা, কিন্তু যে সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে সব সত্য নয়, সে একেবারে মিথ্যা।

কুকারে খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটাতে পৌছিতে বেশি বিলম্ব হইলনা। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়ীতেই ছিলে রাজু?

না না, বাসার্স গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিলনা। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবেনা।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে ?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্তে কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বো? ও বার বা আলাদা। তবেই ত মন খুঁসি হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিলনা, হঠাৎ মনের ভিতরটা ঘেন জলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলামনা নতুন-মা?

সবিতা বলিলেন, আজ কি তার ঘরে থাকবার যো আছে বাবা। তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক রকম রাঁধতে লেগেছে। কত-কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাদেরও যে খেতে বলেছে নতুন-বো।

তোমারও নেমন্তর নাকি?

হাঁ। তুমি ত কখনো খেতে বল্লেনা, কিন্তু সে আমাদের কিছুতে খেতে দিলেন।

আজ তাই বুঝি বসে আছে। এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বো। ভারি পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু ?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তা'হলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন, সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলেনি সারদা ?

না মা বলিনি।

কেন বলেনি ? মনে ছিল না বুঝি ?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিলনা রাজু। কিন্তু এ ভুলও অশ্রায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অশ্রায় বলা চলেনা। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে ? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপরে খেতে হবে ? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলায় কথা গুর মনেই এলোনা। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা এ মনে-না-থাকা শ্রায়-অশ্রায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্তে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেননা। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অশ্রায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশি দাঁড়াইতেছে, তবু খামিতে পারিলনা। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করেনা। সারদা বলেন তাঁর

সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় ক’রে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু খামিয়া বলিল, সারদার হয়ত সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করেনা, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবেনা। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার স্বখ-স্ববিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক। সবিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অস্ববিধে কারো ঘটাতে চাইনে, বারা যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার ঘরে আমার কাছে বসে আজ তুমি থাকবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না সে হয়না। কহিল, আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড় ঘরের বড় রকমের খাওয়ার আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্তে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও দুঃখের আমার সীমা থাকবেনা। এ তোমাকে বললুম।

অপরোধ ঢের বেশি বাড়িয়া গেল, রাখাল নিশ্চয় হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয়না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবেনা? কারো জন্তেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিষ্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলা কি রাজু?

কেউ বলেনা বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার রিচার-বুদ্ধির তুলনা নেই। আর্ন্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নন। দুঃখবোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্ব্য, অন্তরের

খন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন।
আপনার বাধেনা।

বিলবাবু বিশ্বয়-বিস্ফারিত চোখে শুদ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি
চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত
শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধকরি আমার দেখা হবেনা। হয়
এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে
ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন,
—অজ্ঞানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান
দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ
করিলেননা, বরং গভীর স্নেহের সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান
যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই
ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু
কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে। তুমি ত নিষ্ঠুর
নও,—কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়।

প্রত্যন্তের রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাহার পায়ের ধূলা লইল, আর কিছু
বলিলনা। চলিতে উত্তত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয়
নেই দুজনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিলনা ধীরে ধীরে নিচে চলিয়া গেল। কালকের

মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতে
মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেবতা ?

কি চাও তুমি ?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়ত আপনার
কথাই সত্য।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন বলেই
আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন
তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে
রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিলনা, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকাল বেলায় হরিণপুর যাত্রার আয়োজন ঘটন সম্পূর্ণ, সবিতা সারদাকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বাঈ বিছানা এইবেলা উপরে পাঠিয়ে দাও সারদা, সমস্ত মালপত্র তারক লিষ্ট করে নিচে ।

সারদা কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমার বাঈ বিছানা যাবেনা মা ।

একটি নিচু টুলে বসিয়া তারক নোটবুকের পৃষ্ঠায় দ্রুতহস্তে মালপত্রের বর্দ্ধ লিখিয়া লইতেছিল । সারদার উত্তর তাহার কানে পৌঁছিল । অবনত মুখ উচু করিয়া তারক বিস্মিতস্বরে বলিল, বাঈ বিছানা যাবেনা কি রকম !!

সবিতাও বিস্মিত হইয়াছিলেন । নিম্নস্বরে বলিলেন, সঙ্গে নেওয়ার নত বাঈ বিছানা কি তোমার নেই সারদা ? তা'হলে আগে বললেন কেন, বন্দোবস্ত করতাম ।

ম্মান হাসিয়া সারদা বলিল, বিছানা আমার পুরানো এবং ছেঁড়াও বটে, তা'হলেও সেগুলো সঙ্গে নিতে লজ্জা ছিলনা । হরিণপুরে আমার বাওয়া হবেনা মা ।

তারক ও সবিতা প্রায় এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন,—সে কি ?

সারদা শুষ্ক হাসিয়া বলিল, আমার কোথাও নড়বার উপায় নেই । নইলে মাঝে সেবা করার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে এই শূন্যপুরীতে একলা পড়ে থাকার দণ্ড আমি ভোগ করতামনা ।

নির্বাক সবিতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সারদার মুখের পানে তাকাইয়া কি-বেন খুঁজিতে লাগিলেন ।

তারক উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি রকম ! কালও নতুন-মার সঙ্গে আপনি হরিণপুরে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, আর আজ সকালেই এ বাড়ী ছেড়ে নড়বার উপায় নেই স্থির করে ফেললেন ! না, ওসব বাজে ওজর চলবেনা, কোনও মেয়েছেলে সঙ্গে না গেলে সেই পাড়াগাঁয়ে একলাটি নতুন-মা—না না, সে হতেই পারেনা।

সারদা বিষমকণ্ঠে কহিল, আমি সত্যিই বলছি তারকবাবু, আমার যাবার উপায় নেই। এ বাজে ওজর নয়।

অবিশ্বাসপূর্ণকণ্ঠে তারক প্রশ্ন করিল, কেন শুনি ? এখানে আপনার কি কাজ ?

সারদা স্থিরনেত্রে পাষণ প্রতিমার ছায় দাঁড়াইয়া রহিল, কোনও জবাব দিল না।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া তারক কহিল,—জবাব দিচ্ছেন না যে ?

সারদা তথাপি নিরুত্তর রহিল।

তারক হতাশভাবে হাতের নোটবুকখানি বরের মেঝেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, তা'হলে আর কি করে ছপুরের ট্রেনে আপনার যাওয়া হবে নতুন-মা ? মেয়ে ছেলে কেউ সঙ্গে না থাকলে সেই পাড়াগাঁয়ে নির্বাকস্থানে একলাটি টিকতে পারবেন কেন ?

সবিতা এতক্ষণ কথা কহেন নাই। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তারক, গাঁয়ে আমার জন্ম, জীবনের বেশিভাগ গাঁয়েই কেটেছে, সেখানে আমার কষ্ট হবেনা।

রুদ্ধচোখে সারদার পানে তাকাইয়া তারক বিজ্ঞপস্বরে বলিল, কে সে মাতব্বর লোকটি জানতে পারি কি ? যার বিনা হুকুমে আপনি নতুন-মার সঙ্গেও এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পারেন না ? রাখালবাবু নিশ্চয়ই নয় ?—

তারকের অসংযত উজ্জ্বলিত সারদার মুখ অপमानে রাঙা হইয়া উঠিল। অল্প দিক পানে স্থিরনেত্রে তাকাইয়া শাস্তকণ্ঠে বলিল, যিনি আমাকে এই বাড়ীতে রেখে গেছেন। তাঁর বিনা ছকুমে অল্পত য়াওয়া আমার সম্ভব নয় তারকবাবু! আপনি অকারণ রাগ করছেন।

সারদার উত্তরে সবিতা চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু তারক কণ্ঠস্বর অনেকখানিই নিম্নগ্রামে নামাইয়া বিস্ময়বিমিশ্র সুরে কহিল,—কিন্তু তিনি তো বহুদিন নিরুদ্দেশ।

সারদা তারকের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সবিতার সামনে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আর সকলে আমাকে ভুল বুঝুক, আপনি ভুল বুঝবেননা নিশ্চয় জানি।

সবিতা গভীরস্বরে সারদার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া আঙুল কয়টি আপন ওষ্ঠাধরে ঠেকাইলেন। অত্যন্ত গাঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিলেন, সোনাকে পিতল বলে চিরদিন কেউ ভুল করতে পারেনা সারদা। আজ না বুঝুক মা, একদিন সকলেই তোমাকে বুঝতে পারবে।

সারদার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলনা। অবনত মুখে প্রবল চেষ্টায় নিঃশব্দে অশ্রুসংবরণ করিতে লাগিল।

সবিতা সারদাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমাকে কিছু বলতে হবেনা সারদা। আমার সঙ্গে না যেতে পারা তোমার যে কতবড় দুঃখ, আমি তা' জানি।

১

ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা দেড়েক পূর্বে তারক ষ্টেশনে সবিতাকে লইয়া উপস্থিত হইল। মালপত্র গণিয়া, কুলি ঠিক করিয়া, পুরাতন দরওয়ান মহাদেবের হেফাজতে দেওয়া হইয়াছে। ব্রেকভ্যানের মালগুলি ওজনান্তে

রেলওয়ে কোম্পানীর দায়িত্বে অর্পণ করিয়া রসিদখানি সযত্নে পকেটে পুরিয়া তারক নিশ্চিন্তচিত্তে সেকেন্ড ক্লাস লেভীস ওয়েটিংরুমের সামনে আসিয়া ডাকিল—নতুন-মা—

সবিতা ঘরের ভিতর হইতে দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারক রুমাল দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, মালপত্র ওজন করে ব্রেকে দিয়ে রসিদ নিয়ে এলাম। এধারের ঝামেলা চুকল। এখন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেই হয়। আপনাকে বিছানা পেতে বসিয়ে দিতে পারলে তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। সবিতা মুহূ হাসিয়া বলিলেন, নতুন-মার পাছে হরিণপুরে যাওয়া না হয় এ জন্তে তোমার ভয় আর ভাবনার অন্ত নেই, না তারক ?

স্মিতমুখে তারক জবাব দিল, নিশ্চয়ই। যে পর্যন্ত না ছেলের ঝুঁড়েঘরে মায়ের পায়ের ধূলা পড়চে, ততক্ষণ নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করিনে মা !

ছাড়িবার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পূর্বে ট্রেন প্ল্যাটফর্মের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্যতিব্যস্ত ভাবে তারক ওয়েটিংরুমের দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, —নতুন-মা, বেরিয়ে আসুন। ট্রেন এসে গেছে।

মহাদেব দরওয়ান্ ওয়েটিংরুমের বাহিরে কতকগুলি বাস বিছানার বাণ্ডিলের উপর বসিয়া থৈনি টিপিতেছিল। তাড়াতাড়ি থৈনি মুখে ফেলিয়া পাগড়ী ঠিক করিতে করিতে শশব্যস্তে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

আপাদ মস্তক সিন্ধের চাদর মণ্ডিতা সবিতা শিবুর-মা বি সহ ট্রেন অভিমুখে তারকের অহুসরণ করিতে করিতে বলিলেন,—আমাকে তুমি ইটার ক্লাসে মেয়েদের কামরায় তুলে দিও তারক। শিবুর-মাও আমার সঙ্গে থাকবে।

তারক থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি আপনার জন্ত সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছি নতুন-মা। ইন্টার ক্লাসে অপরিষ্কার জেনানা কম্পার্টমেন্টের ছুর্গন্ধের মধ্যে টিকতে পারবেন কেন?

সবিতা বলিলেন, কিন্তু, মেয়ে-কামরায় যাতায়াত করাই আমার অভ্যাস ছিল বাবা।

তারক বারংবার জিদ্ধ করিয়া একাধিক অসুবিধা ও কষ্টের অভ্যুত্থান দেখাইয়া দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাতেই সবিতাকে উঠাইয়া দিল।

ছোট কামরা। তখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞ কোনও আরোহী উঠে নাই। তারক ব্যস্তভাবে গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া নিজের ধুতির কোঁচা দিয়া প্লাটফর্মের দিকের বেঞ্চখানির ধূলা ঝাড়িয়া সযত্নে পরিষ্কার বিছানা বিছাইয়া দিল। হাওড়া স্টেশন হইতে যাওয়া হইবে মাত্র বর্ধমান। কিন্তু তারক যাত্রাপথের আয়োজন করিয়াছে দিল্লী বা লাহোর পর্য্যন্ত যাইতে হইলে যেমন করা উচিত।

সবিতা অন্তঃমনস্কচিত্তে বিছানার উপরে গিয়া বসিলেন। তারক দ্রুত মনে মনে আশা করিতেছিল নতুন-মা তাহার এই সতর্কত্ব ও সেবাসম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু স্নেহে অনুরোধ করিবেন। কিন্তু ধোপদস্ত কর্সাধুতির কোঁচা বেঞ্চের ধূলিলিপ্ত হইয়া মলিন বর্ণধারণ করা সত্ত্বেও নতুন-মা একটিও কথা কহিলেননা ইহাতে তারকের মন অনেকখানিই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। তথাপি মহা উৎসাহে সে উপরের বাক্সে ট্রাঙ্ক, হাতবাক্স, স্ট্রকেস প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিল। বেঞ্চের নিচে ফলের টুকরি ও অন্যান্য দ্রব্য সাবধানে সুরক্ষিত করিল। কুলিদের বিদায় দিয়া তারক সবিতার সামনে আসিয়া ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, আপনি একটু বসুন নতুন-মা। আমি একগ্লাস লেমনেড্ বরফ দিয়ে নিয়ে আসি আপনার জন্তে। কিংবা একগ্লাস আইসক্রিম নিয়ে আসি, কি বলেন?

সবিতা এতক্ষণ বাহিরে জনাকীর্ণ প্র্যাটফর্মের পানে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া ছিলেন। তারকের কথায় যেন সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

ব্যস্তস্বরে বলিলেন, না তারক, কিছুই আনতে হবেনা। তেষ্ঠা আমার পায়নি।

তারক সে নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, বাঃ, তা কি হয়? তেষ্ঠা পায়নি বললে শুনবো কেন নতুন-মা? মুখ আপনার কি রকম শুখিয়ে উঠেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি—

সবিতা মৃদুহাসিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, লেমনেড্ সোডা বা আইসক্রিম্ ও-সব আমি কখনও খাইনে। ট্রেণে জলস্পর্শ করাও জীবনে কোনও দিন ঘটেনি। তুমি ব্যস্ত হয়ে অনর্থক ওসব কিনে এনোনা বাবা।

সকল বিষয়ে প্রতিবাদ করা এবং নিজের ইচ্ছাকে অপরের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে তর্কযুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই তারকের প্রকৃতি। কিন্তু নতুন-মার এই কণ্ঠস্বর তাহাকে কোনোটাতেই প্রবৃত্ত হইতে ভরসা দিলনা। স্তূতরাং সে মনে মনে দুঃখ অপেক্ষা অস্বস্তিই অল্পভব করিতে লাগিল বেশি।

প্র্যাটফর্মের কর্মব্যস্ত জনতায় নিবদ্ধদৃষ্টি সবিতার চক্ষুস্বয়ং অকস্মাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দূরে বিমলবাবুকে আসিতে দেখা গেল। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি, পদক্ষেপ ঈষৎ দ্রুত। ট্রেণের কামরাগুলির মধ্যে অল্পসুক্ষ্মিৎ দৃষ্টি মেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সবিতার মুখ চোখ আনন্দের নিম্ন কিরণে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু প্রসন্নহাস্তে সবিতার কামরার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারক তাড়াতাড়ি প্র্যাটফর্মে লাফাইয়া পড়িয়া পুলকিত কণ্ঠে কহিল,

এই যে আপনি ষ্টেশনেই এসেছেন দেখচি। আমরা আশা করেছিলাম বাড়ীতেই দেখা করতে আসবেন। ট্রেন টাইম পর্য্যন্ত এলেননা দেখে কিন্তু ভাবনা হয়েছিল।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া শান্তকণ্ঠে তারককে প্রশ্ন করিলেন—তোম—রা মানে ?

বিমলবাবুর প্রশ্নে তারক সবিতার দিকে চাহিয়া হঠাৎ লজ্জায় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কথাটা বহুবচনে না বলিয়া একবচনে বলিলেই বোধ হয় শোভন হইত। ছিঃ, নতুন-মা হয়তো কি মনে করিলেন !

কিন্তু তারককে এ লজ্জা হইতে পরিজ্ঞাণ করিলেন নতুননা-ই। স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিলেন, তারক ঠিকই বলেচে। আজ সকাল বেলায় আমরা ওখানে তোমার আসা সম্ভব মনে করেছিলাম। সারদাও বল্ছিল তোমার কথা।

বিমলবাবু সবিতার কামরার মধ্যে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, সারদা কোথায় ?

সবিতা উত্তর দিবার পূর্বেই তারক রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ, তিনি নাকি সহরের কলের জল ইলেক্ট্রিক্ আলো ছেড়ে পচা পাড়াগাঁয়ে বাস করতে যাবেন ? তবে সেটা দয়া করে গোড়াতে বললেই ভাল করতেন, আমরা এতটা অসুবিধায় পড়তামনা।

বিমলবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সারদা কি তোমাদের সঙ্গে হরিণপুরে যাচ্ছেনা ?

সবিতা উদাস হাসিয়া নীরবে মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন সারদা আসিতে পারে নাই।

বিমলবাবু ভ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বাম হাতখানি উন্টাইয়া মণিবন্ধে বাঁধা সোনার রিষ্ট্‌ওয়াচের পানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ব্যস্তস্বরে বলিলেন,

যথেষ্ট সময় আছে। এখনি মোটর নিয়ে গিয়ে সারদাকে তুলে আনি নতুন-বো। আমি গিয়ে বললে সে 'না' বলতে পারবেনা।

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি অনুরোধ করলেও সে আসতে পারবেনা। শুধু তার ছুঃখ বাড়বে মাত্র।

বিমলবাবু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—তার মানে ?

সবিতা বলিলেন, আর একদিন শুনো।

বিমলবাবু সবিতার মুখের পানে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপারটা কি নতুন-বো ?

সবিতা বলিলেন, তার আসার উপায় নেই দয়াময় ! নইলে আমার সঙ্গে আসা থেকে আমি নিজেও তাকে নিবৃত্ত করতে পারতাম কিনা সন্দেহ। যাই হোক, আমার আরও একটি অনুরোধ তোমার 'পরে' রইলো। সারদা একা থাকলো, মধ্যে মধ্যে তুমি তার খোঁজ-খবর নিও।

সারদার ব্যবহারে তারক তার প্রতি এত বেশি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে নতুন-মা সারদার অকৃতজ্ঞতার উল্লেখমাত্র না করিয়া বরং বিমলবাবুকে তার তদারক করিতে অনুরোধ করিলেন দেখিয়া মনে মনে অলিয়া গেল। মনের বিরক্তি ইহাদের সম্মুখে পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে সেজন্য এখান হইতে সরিয়া যাইবার ইচ্ছায় বলিল, শিবুর-মা আর দরওয়ানটা ঠিক উঠেছে কিনা আমি একবার দেখে আসি নতুন-মা ! এই বলিয়া অনাবশ্যক ক্রতপদে অন্তরিকে চলিয়া গেল।

বিমলবাবু সবিতার পানে প্রশংসূচক দৃষ্টি মেলিয়া বলিলেন, কি হয়েছে বলো তো ? তারককে একটু উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছে যেন।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সারদা আমার সঙ্গে না আসায়

তারক তার উপরে বিষম অসন্তুষ্ট হয়েছে। ওর ধারণা আমি পল্লীগ্রামে নানা অসুবিধার মধ্যে বাচ্চি, সারদা সঙ্গে থাকলে হয়তো আমার অনেক সুবিধা হতো।

বিনলবাবু বলিলেন, সেটা শুধু তারকই যে ভাবছে তা'তো নয়। আমিও যে ঠিক ওই ভাবনাই ভাবছি নতুন-বো!

সবিতা করুণ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি আজ ঠিক এর উল্টো ভাবনাই ভাবছি।

বিনলবাবু সবিতার মুখে এত করুণ হাসি পূর্বে দেখেন নাই। তাঁহার বুকের ভিতরটা বেদনায় যেন মোচড় দিয়া উঠিল। সবিতার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিলেন, আমি কি শুনতে পাইনে নতুন-বো?

ক্লান্তকণ্ঠে সবিতা বলিলেন, সমস্ত কথাই তোমায় একদিন বলবো ভেবেছি। আর কেউই তো আমার এ' অন্তর্দাহ বুঝতে পারবেনা, বিশ্বাস করতেও হয়ত চাইবেনা। আমার অনেক জ্ঞানবার আছে। এই তেরো বৎসর ধরে দিনের পর দিন রাতের পর রাত ক্রমাগত যে-প্রশ্ন আমার বুকের ভিতর আছড়ে পিছড়ে মরছে, আজও তার জবাব পাইনি। ভগবানের চরণে বারবার জানিয়েছি, ঠাকুর, তোমার অজানা তো কিছুই নেই। এতবড় নিশ্চয় জিজ্ঞাসা আমার জীবনে তুমিই পাঠিয়েছ। তার জন্তে তোমাকে অভিযোগ করবনা, শুধু এর সত্য উত্তরটাও তুমি এই জীবনে আমাকে দিয়ে দিও। এ'ছাড়া প্রার্থনার আর কিছুই তো রাখোনি! যত বৃহৎ হৃৎকই দাওনা কেন, আমি তাকে তোমার হাতের দান বলে মেনে নিয়ে সোজা হয়েই চলতে পারতাম। কিন্তু, আমার জীবনে তো তুমি হৃৎক পাঠাওনি, পাঠিয়েচো শুধু তীব্র পরিহাস। নাহুয়ের পরিহাস সওয়া কঠিন নয়, কিন্তু তোমার এ' নির্ভুর পরিহাস যে সহ্য হয়না!

বিমলবাবুর আনন্দসোম্য মুখে একটা কঠিন বেদনানুভূতির ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। তিনি একটিও কথা কহিলেননা। অত্ৰ একদিকে দৃষ্টি মেলিয়া হিরন্মাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি যেন ইহলোক হইতে লোকান্তরে নিরুদ্ভিষ্ট।

অনেক সময় কাটিয়া গেল। সবিতা অশ্রুত মুদুস্বরে ডাকিলেন,
—দয়াময়!—

বিমলবাবু কিরিয়া চাহিয়া মেহসিদ্ধ গাঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন,
নতুন-বো!—

সবিতা হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। মুখে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুর মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সামান্য কণ্ঠে কহিলেন, একটা কথা বলবো? বলো, কিছু মনে করবেনা?

বিমলবাবু সবিতার কথায় সহসা কোনও উত্তর দিতে পারিলেননা। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, নতুন-বো, আজও তুমি “কিছু মনে করা”র ধাপ্ উত্তীর্ণ হয়ে উপরে উঠতে পারোনি, জানতাম না। কিন্তু থাক্ সে কথা, কি বলতে চাও বলো, কিছু মনে করবেনা।

নতদৃষ্টি সবিতা বলিলেন, তুমি আনাকে নতুন-বো বলে ডেকোনা।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ সবিতার পানে তাকাইয়া থাকিয়া শান্ত স্বরে বলিলেন, তাই হবে।

এবার মুখ তুলিয়া বিমলবাবুর পানে চাহিতে দেখা গেল সবিতার সুন্দর চোখ দুটি শিশিরসিক্ত পদ্মপাপড়ির মত অশ্রুভারে টলটল করিতেছে।

বিমলবাবুকে কি-একটা কথা বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেননা বাধিয়া গেল। বিমলবাবু তাহা লক্ষ্য করিলেন।

প্র্যাটফর্মের উপর হইতে কামরার মধ্যে উঠিয়া আসিয়া সবিতার সামনের বেঞ্চে বসিলেন। তারপরে মেহকোমল অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে

বলিলেন, তোমাকে নামধরে ডাকার অধিকার আনায় দিতে পারবে কি তুমি? সন্দোচ কোরোনা। যদি কোনও বাধা থাকে, একটুও আমি দুঃখিত হবনা জেনো। শুধু বলে দিও, কি-বলে ডাকলে তোমার মনে দুঃখ বাজবেনা বা স্মৃতির দাহ জেগে উঠবেনা। আমি তো বেশি কিছু জানিনে। হয়তো না জেনে আঘাত দিচ্ছি তোমাকে।

সবিতা এবারে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেননা, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কি যেন একটা কথা বারংবার বলিবার চেষ্টা করিয়াও লজ্জায় ও দুঃখে কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিমলবাবু আবার বলিলেন, কুণ্ঠিত হোয়ো না। বলো, কি বলে ডাকলে তুমি সহজে সাড়া দিতে পারবে?

সবিতা তথাপি নীরব্তর রহিলেন। তারপরে বিপুল সন্দোচ প্রাণপণে তৈলিয়া মৃদুধরে কহিলেন, আনাকে রেণুর মা বলে ডেকো।

বিমলবাবুর মুখে কোমল সহানুভূতির কারুণ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—সত্যি! ভারী সুন্দর! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে, তোমার এতবড় পরিচয়টা এতদিন আমার মনে হয়নি কেন বলোতো?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

বিমলবাবু আনন্দমধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এ যে তুমি কত বড়ো দান আজ আমাকে দিলে, তা' হয়তো তুমি নিজেও জানানো রেণুর মা! তোমার দেওয়া এই সম্মান এই বিশ্বাসের যেন মর্যাদা রাখতে পারি। আমার আর কোনও কামনা নেই।

বিমলবাবু হয়তো আরও কিছু বলিতেন, ট্রেন ছাড়িবার সঙ্কেতসূচক দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল। হাতঘড়ির পানে চাহিয়া তিনি উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—বাই এবার। হরিণপুরে থাকতে যদি ভালো না লাগে, চলে আসতে দ্বিধা কোরনা যেন। তারক যদি পৌছে দিয়ে যেতে ছুটি না পায়, খবর দিও। রাজু গিয়ে নিয়ে আসবে। প্রয়োজন হলে আমিও যেতে পারি।

বিমলবাবু গাড়ী হইতে নামিয়া গেলেন। তারক দ্রুতপদে আসিতেছিল। হাতে এক গ্লাস বরফখণ্ডপূর্ণ রঙীন পানীয়। সিরাপ জিঞ্জার বা ঐরূপ কিছু। বিমলবাবুর হাতে গ্লাসটি তুলিয়া দিয়া বলিল, নতুন-মাকে তো একফোঁটা জলও মুখে দেওয়াতে পারলামনা। আপনিও যেন এটা রিফিউজ্ করবেননা।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, দাও। গ্লাসটি বিমলবাবুর হাতে তুলিয়া দিয়া তারক পকেট হইতে কলাপাতা মোড়া পানের দোনা বাহির করিল।

শেষ ঘণ্টা পড়িয়া গার্ডের হইসু শোনা গেল। সবিতা বলিয়া উঠিলেন, গাড়ী যে এখনি ছাড়বে তারক। উঠে এসো এইবার। তোমার এই অতিথিবাৎসল্যের মধ্যে আমি যে কি করে দিন কাটাবো তাই ভাবচি।

বিমলবাবু তাঁহার পানীয় তখনও শেষ করিতে পারেন নাই। হাসিতে গিয়া বিষম খাইলেন।

সবিতা ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, আহা—

বিমলবাবু মুখ হইতে গ্লাসটি নামাইয়া সবিতার দিকে চাহিয়া এইবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ট্রেন তখন চলিতে সুরু করিয়াছে। নমস্কার! বলিয়া তারক চলন্ত ট্রেনে উঠিয়া পড়িল।

ব্রজবাবুর আপন ভাইপোরা এবং খুড়তুতো ছোট ভাই নবীনবাবু, বাহারা এই দীর্ঘ বারো তেরো বৎসর দেশের বাড়ী ঘর নিশ্চিন্ত হইয়া ভোগদখল করিতেছিলেন, এতদিন পরে সকল্য ব্রজবাবুর দেশে প্রত্যাবর্তন আদৌ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

গ্রামে ব্রজবাবুর নিজের দ্বোতলা কোঠাবাড়ী, বাগান, পুকুর, জমিজমা সপরিবারে তাঁহারাই এতদিন অধিকার করিয়া বসবাস করিতেছিলেন। যিনি প্রধান সরিক, বলিতে গেলে প্রকৃত মালিক আজ হঠাৎ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত, স্তবরাং বিচলিত হইবারই কথা। কিন্তু তবুও ব্রজবাবুর ভাইপোরা ও খুড়তুতো ভাই নবীনবাবু ব্রজবাবুর দেশে আসার প্রতিবাদ করিতে ভরসা করেন নাই। কারণ, মাত্র কয়েকমাস পূর্বে এই ব্রজবাবুই তাঁহাদের একখানি মূল্যবান তালুক লেখাপড়া করিয়া দান করিয়াছেন, বাহার আয় বার্ষিক প্রায় হাজার টাকার কাছাকাছি। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারাই নিজেদের সংসারে বাসগৃহের অন্তঃপুরে তো ব্রজবাবু ও রেণুকে স্থান দিতে পারেননা। সে কারণে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যুক্তি-পরামর্শ করিয়া ব্রজবাবুকে তাঁহার বাড়ীর সদর অংশ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

সদরবাড়ী একতলা কোঠা। দুইখানি বড় বড় ঘর। ঘরের কোলে ভিতর দিকে দর দালান, বাহিরের দিকে খোলা রোয়াক। দালানের দুই প্রান্তে এক একখানি ছোট ঘর। একখানি চাকরদের তামাক সাজিবার ও অন্তখানি আলোবাতি রাখিবার ফরাস ঘর। এই লইয়া সদরবাটী।

ঘরগুলি ঝাঁটপাট দিয়া ধোওয়াইয়া, খান দুই তক্তাপোষ পাতাইয়া, মাটির নূতন কলসীতে পানীয় জল তুলাইয়া রাখিয়া কর্তব্যনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রগণ তালুকদাতা খুড়ার প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

গ্রামে আসিয়া পৌছিলে ব্রজবাবু ও রেণুর সেদিন একবেলার আহাঙ্গাদির ব্যবস্থাও তাঁহাদেরই নিকট হইয়াছিল। কিন্তু তাহা বাটীর মধ্যে হয় নাই। খাত্তসানগ্রী বহির্বাটীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ব্রজবাবু বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও এ ব্যবস্থার অর্থ বুঝিয়া লইতে বুদ্ধিমতী রেণুর বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু সে আজন্মকালই স্বল্পবাক ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মেয়ে। কোনও ব্যাপারে মনে আঘাত কিংবা অপমান বোধ করিলেও তাহা লইয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

খুড়া দেশের বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র ভ্রাতৃপুত্রগণ প্রণাম ও কুশল প্রশ্নাদির পর প্রথমেই জানিতে চাহিলেন, কি কারণে তিনি এতদিন পরে বাড়ীতে ফিরিয়াছেন? কথাবার্তার পর যখন জানা গেল যে বিশিষ্ট ধনী খুড়া ব্রজবাবু আজ সর্বস্বান্ত ও গৃহহীন হইয়া অনুচ্চ বয়স্থা কন্তাসহ গ্রামে ফিরিয়াছেন, অবশিষ্ট জীবদ্দশা এইখানেই কাটাইবার সংকল্প লইয়া—তখন তাঁহার রীতিমত ভীত হইয়া পড়িলেন। ব্রজবাবুর শরীরের যেক্রম অবস্থা, শেষ পর্য্যন্ত ঐ বয়স্থা অবিবাহিতা কন্তা তাঁহাদের স্কন্ধে না পড়িলে হয়। তালুক দান করিয়া অবশেষে কি খুড়া তাঁহার খুঁড়ো মেয়েটিরও দায়িত্বভার ভাইপোদেরই দান করিয়া যাইবেন নাকি? এমনি হইলেও বা হইত, কিন্তু কুলত্যাগিনী জননীর ঐ অনুচ্চ কন্তাকে সংসারে আশ্রয় দিয়া কে বিপদের ভাগী হইবে?

ব্রজবাবু তাঁহার গৃহদেবতা গোবিন্দজীউকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। পারিবারিক ঠাকুরঘরে গোবিন্দজীউকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে,

কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র ভ্রাতৃপুত্রগণের মুখপাত্র স্বরূপ সম্মুখে আসিয়া জোড়করে ব্রজবাবুকে বলিলেন, মেজদা একটা কথা আপনাকে না জানালে নয়। মুখে আনতে যদিও বুক ফেটে যাচ্ছে তবু না জানিয়েও উপায় নেই। আপনি ভরসা দিলে আমরা খুলে বলতে পারি।

নিধিরোধী ব্রজবাবু ভ্রাতার এই সর্বনয় ভূমিকায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, সে কি নবীন! ভরসা আবার দেব কি? বলো বলো, এখনি বলে ফেলো, কী তোমাদের সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে? তাই তো—কি মুস্কিল—তোমরা কিনা শেষকালে—

ব্রজবাবু সমস্ত কথা ভাষায় ব্যক্ত করিতে না পারিলেও তাঁহাবুদ্ধি নবীনচন্দ্র এবং ভ্রাতৃপুত্রদল তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইলেন। উৎসাহিত হইয়া নবীনবাবু আরও সাড়ম্বরে অতিবিনয় সমেত দীর্ঘ গোরচন্দ্রিকা ফাঁদিলেন। বহু অবাস্তব কথা এবং নিজেদের নির্দোষিতার ভূরি ভূরি প্রমাণ সহ যাহা জানাইলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে,—ব্রজবাবু ও রেণুকে যদি নবীনবাবুরা সংসারে স্থান দেন, তাহা হইলে গ্রামে তাঁহাদের পতিত হইতে হইবে। গ্রামশুদ্ধ সকলেই জানে, এই রেণুকেই তিন বৎসরের শিশু অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহার জননী দূরসম্পর্কের নন্দাই রমণীবাবুর সহিত প্রকাশে কুলত্যাগ করিয়াছিলেন। নাত্র বারো তেরো বৎসর পূর্বের ঘটনা। গ্রামের কেহই আজও তাহা বিশ্বাস হয় নাই।

ব্রজবাবু বিবর্ণমুখে নতশিরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই অসহায় মুখ দেখিলে অতিবড় কঠিন হৃদয়ও ব্যথিত না হইয়া প্যারেনা। নবীনচন্দ্রেরও হৃদয়ে আঘাত লাগিল। কিন্তু তিনিই বা কি করিতে পারেন! একমাত্র আশা ছিল, ব্রজবাবু বিশিষ্ট অর্থশালী ব্যক্তি,—গ্রামে অর্থব্যয় করিতে পারিলে অনেকেরই মুখে চাপা দেওয়া যায়। কিন্তু, ব্রজবাবু আজ নিঃস্ব অর্থহীন। সুতরাং বয়স কত্থাকে এতকাল অনুচা রাখার অপরাধ গ্রামের

কেহই ক্ষমা করিবেনা,—বিশেষতঃ যে-কন্নার গাত্রহরিদ্রা হইয়াও বিবাহ হয় নাট, জননী যাহার কলঙ্কিনী !

নতুন-বৌ গৃহত্যাগ করিলে গ্রামের কুৎসা-আন্দোলনই যে ব্রজবাবুকে দেশের বাড়ী ছাড়িয়া গোবিন্দজীউ ও শিশুকন্যাসহ কলিকাতাবাসী করিতে বাধ্য করিয়াছিল, বাড়ীতে আসিবার পূর্বে এ কথা যে তাঁহার কেন ননে পড়ে নাই ইহা ভাবিয়া ব্রজবাবু সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

দেশের এ অপ্রিয় আন্দোলনের সংবাদ রেণু জানিতনা। জানিলে সে ব্রজবাবুকে গ্রামে আসিবার পরামর্শ দিতনা। কিন্তু এ অবস্থায় এখানে থাকাও তো চলে না। এখন বাইবেনই বা কোথায় ?

ব্রজবাবুর চিন্তাজালে বাধা দিয়া নবীনবাবু ও কৃতজ্ঞ ভ্রাতৃপুত্রগণ বারংবার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকন্না ব্রজবাবুকে নিজেদের মধ্যে সসম্মানে গ্রহণ করিতে একান্ত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও উপায় নাই, ইহা তাঁহাদেরই দুর্ভাগ্য ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

কুণ্ঠিত হইয়া ব্রজবাবু বলিলেন,—নবু, তোমরা লজ্জিত হোয়োন। আমি সমস্তই বুঝতে পারছি। এটা আগেই আমার বিবেচনা করা উচিত ছিল ভাই ! যাই হোক এটাও বোধহয় গোবিন্দজীউর পরীক্ষা। দেখি, তাঁর ইচ্ছা আবার কোথায় নিয়ে যায় !—

ব্রজবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র বলিলেন—কিন্তু মেজকাকা, সবচেয়ে ভাবনা আমাদের, রেণুর বিয়ের জন্তে।

ব্রজবাবু ধীরকণ্ঠে জবাব দিলেন, কিছু চিন্তা কোরোনা বাবা, আমি ওকে আর আমার গোবিন্দজীকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করব। গোবিন্দজীর রাজ্যে মায়ের অপরাধের জন্ত মেয়েকে কেউ দোষী করে না। যে-পর্যন্ত-না যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি, এখানে এই বৈঠকখানা-বাড়ীতেই পৃথক ভাবে থাকব। কাকুর কোনও অসুবিধা ঘটাবনা।

জ্ঞাতিদের কথাবার্তায় বুঝা গেল, বাস্তবচর্চার ঠাকুরঘরে গোবিন্দজী তাঁহার পূর্ব বেদীতে অধিষ্ঠিত হওয়ার বাধা নাই, বাধা রেণুর ঠাকুরঘরে প্রবেশের এবং ঠাকুরের ভোগ রন্ধনের।

মুখে বাহাই বলুননা কেন, এই ঘটনায় ব্রজবাবু নথ্যার্থই মর্শ্বাহত হইলেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের প্রধান লক্ষ্য, পরম প্রিয়তম গোবিন্দজীউ নিজ পূজামন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলেননা, বৈঠকখানা-বাড়ীতে গড়িয়া রহিলেন এই ক্ষোভে ও দুঃখে ব্রজবাবু মুহূর্ত্তমান হইয়া পড়িলেন। সংসারের নানা বিপর্যয় এমন কি সর্বস্বান্ত গৃহহারা অবস্থাও তাঁহার অন্তরকে এমন বিকল করিতে পারে নাই।

গ্রামে আসিয়া পর্য্যন্ত রেণুর নোটে অবকাশ রহিলনা। গোবিন্দ-জীউর সেবা এবং পিতার যত্ন ও শুশ্রূষা লইয়া তাহাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। অল্প কোনও ব্যাপারে তাহার দৃষ্টি দিবার সময় বিরল, হয়তো ইচ্ছাও নাই।

সদরবাটীর দুইখানি ঘরের একখানি গোবিন্দজীউর জন্ম অস্থান পিতার জন্ম সে নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে। পিতার শয়নগৃহেরই একপ্রান্তে একখানি সরু তন্তাপোষে নিজের শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছে। ছোট ছোট দুইখানি কক্ষের একখানি ভাণ্ডার এবং অপরখানি রন্ধনকক্ষ হইয়াছে। উঠানের এক কোণে একটুখানি জায়গা বেড়া দিয়া বিরিয়া রেণু স্নানের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে।

ব্রজবাবু ব্যাকুলচিত্তে চিন্তা করেন,—গোবিন্দ, তোমাকে তোমার আপন মন্দির থেকে বাইরে এনে অসম্মানের মধ্যে ফেলে রাখলাম শেষকালে! এ কি আমার উচিত হ'ল প্রভু? কিন্তু আমার রেণুর বে

তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তাকে তোমার সেবার বঞ্চিত করলে সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে? পতিতপাবন, তুমিও কি অবশেষে আমাদের সাথে পতিত সেজে রইলে?—

নন্দ্যারতির ক্ষণে আরতি করিতে করিতে ব্রজবাবু আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন এই ধরণের ভাবনায়। দক্ষিণ হাতের পঞ্চপ্রদীপ বাম হাতের ঘণ্টা নিশ্চল হইয়া যায়। গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে, খেয়াল থাকেনা।

রেণু ডাকে—বাবা—

ব্রজবাবুর চমক ভাঙ্গে। সলজে ব্রহ্মহস্তে আবার আরক্ত আরতিতে পুনঃপ্রবৃত্ত হন।

কখনও বা সংশয়উদ্বেল চিন্তে ভাবেন,—গোবিন্দ, সম্মানস্নেহে অন্ধ হয়ে তোনার প্রতি ক্রটি করে প্রত্যাবারভাগী হলাননা তো প্রভু!

এইরূপ অত্যধিক নানসিক সংঘাতে ব্রজবাবু যখন বিপর্যস্ত-চিন্ত, সেই সময়ে ঘটিল এক দুর্ঘটনা। দ্বিপ্রহরে একদিন পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্রজবাবু নাখা ঘুরিয়া পড়িয়া মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন। রেণু ভয়ে ও উদ্বেগে কাতর হইলেও স্বভাবগত ধীরতার সহিতই অর্দ্ধ-অচেতন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, নব্বুকাঁকে কিংবা দাদাদের ডাকব কি?

ব্রজবাবু অতিকষ্টে শুধু বলিলেন,—রাজু—

রেণু সেইদিনই রাখালকে আসিবার জন্ত টেলিগ্রাম করিয়া দিল।

গ্রামের চিকিৎসকটি মেডিক্যাল কলেজে ষষ্ঠ বার্ষিকে এম্-বি ফেল্। গ্রামে পণার মন্দ জন্মে নাই। ব্রজবাবুকে পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, নাখায় রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এইরূপ হইয়াছে। সতর্কতা সহকারে শুশ্রূষা ও চিকিৎসা হইলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপ ঘটিলে জীবনের আশা অল্পই। এখন হইতে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন।

.....রাখাল তাহার বন্ধু যোগেশের মেস্ হইতে সেদিন বাসায় ফিরিল রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটায়। যোগেশ কোনওনতে রাখালকে ছাড়ে নাই, খাওয়াইয়া দিয়াছে।

দিল্লীতে কয়েকটি বিবাহযোগ্য অনুষ্ঠান পাত্রী রাখালকে তাহার আপত্তি সম্বন্ধে দেখানো হইয়াছিল। তাহাদেরই মধ্যে একটি পাত্রীর কাকা কলিকাতায় অফিসে চাকুরী করেন। দিল্লী হইতে পাত্রীর পিতার তাগিদে অল্পসারে পাত্রীর খুড়া আসিয়া যোগেশকে ধরিয়াছেন। রাখালরাজবাবুর সহিত তাঁহার ভাইবির বিবাহ দিয়া দিতেই হইবে। সে ভদ্রলোক নাকি যোগেশকে এমনভাবে অল্পনয়-বিনয় করিতেছেন যে, নিজে বিবাহিত এবং অল্প জাতি না হইলে যোগেশই হয় তো এই অরক্ষণীয়টির রক্ষণভার গ্রহণ করিয়া তাহার খুড়ার অল্পনয়বিনয়ের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ফেলিত।

পাত্রীর একখানি ফোটোগ্রাফও যোগেশ রাখালকে দেখাইয়াছে। যদি চেহারা ঠিক মনে না পড়ে সেজন্ত খুড়া এই ফোটোগ্রাফ যোগেশের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন।

রাখাল প্রথমে তো হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল, কিন্তু যোগেশচন্দ্র না-ছোড়। সে প্রাণপণ তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে লাগিল, যদি পাত্রীর বরস, চেহারা, শিক্ষা এবং তাহার পিতৃকুল সম্বন্ধে রাখালের কোনও অপছন্দ না থাকে তবে সে কেন বিবাহ করিবেনা?

যোগেশ জানে, রাখাল বিবাহে পণগ্রহণ প্রথাকে অকৃত্রিম ঘৃণা করে। সংসারে রাখালের অপেক্ষা অনেক অল্প আয়ের মানুষও বিবাহ করিয়া জীপুত্রকত্তা প্রতিপালন করিতেছে। স্বয়ং যোগেশচন্দ্রই তো তাহাদের অগ্রতন উদাহরণ। তবে মধ্যবিত্ত বিবাহিত ব্যক্তির জীবনযাত্রাপ্রণালী এড়লোকদের অল্পকরণে হয়তো চলেনা, যেমন চলে তাহা অবিবাহিত

অবস্থায়। বন্ধুর বিবাহে বা বান্ধবীর জন্মদিনে নিউ নার্কটের ফুলের বাস্কেট উপহার, কিংবা মরক্কো বাঁধাই মূল্যবান সংস্করণের রবীন্দ্রনাথ অথবা শেলি ব্রাউনিঙের গ্রন্থ উপহার দেওয়ার বাধা ঘটিতে পারে। বিলাতি সেলুনে আট আনার চুল ছাঁটার পরিবর্তে দেশী নাপিতের কাছে আট পয়সায় চুল ছাঁটিতে তখন হয়তো বাধ্য হইতে হয়। কিন্তু বিবাহের যোগ্যতা সম্পন্ন পুরুষ যদি বিবাহোপযোগী বয়সে কেবলমাত্র দারিদ্রতার বহনের ভয়ে অথবা নিজের বিলাস ও অবাধ মুক্তির বাধা ঘটিবার আশঙ্কার বিবাহে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তার চেয়ে কাপুরুষ সংসারে বিরল। হিসাব করিলে দেখা যায়, বিবাহের অনুপযুক্ত ব্যক্তি বিবাহ করিয়া যতখানি অপরাধ করে তাহাদের চেয়ে বেশি দোষী এবং অশ্রদ্ধেয়,—যাহারা যোগ্যতা সত্ত্বেও মুক্তির বিষয় আশঙ্কায় এবং দায়িত্ব এড়াইবার জন্য চিরকুমার থাকিতে চায়। ইত্যাদি।

রাখাল নির্বিকার হাসিমুখে বন্ধুর যুক্তি এবং ভৎসনা নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া গেল। শেষে আহালাদির পর বাসায় ফিরিবার সময় যোগেশের বারংবার পীড়াপীড়ির জবাবে বলিল, আমাকে একটু ভেবে দেখতে সময় দাও ভাই!

যোগেশ উৎসাহিত হইয়া বলিল, বেশ বেশ, এ' তো ভাল কথাই। তা' হলে কবে আন্দাজ তোমার উত্তর পাওয়া যাবে বলে দাও। আসছে পরশু? কেমন?

রাখাল হাসিয়া বলিল, এত বেশি সময় দিচ্ছে কেন? বলেন! আসছে ভোরে—

যোগেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, না না, তা' নয়। তবে জানো কি, ওদের কতাদায় কিনা! একটু বেশিরকম ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। তোমার এই 'ভেবে দেখা'র সময়টুকু ওদের কাছে খুণী আসামীর

জজের রায়ের জন্ত অপেক্ষার মতই স্বাস্থ্যরোধকর প্রতীক্ষা। তাই বলছিলাম।

রাখাল বলিল, তুমি ব্যস্ত হোয়ানা। আমি কয়েকদিনের মধ্যে নিজেই তোমাকে জানিয়ে যাব।

যোগেশকে প্রসন্ন করিয়া রাখাল তাহার মেস্ হইতে বখন বাহির হইল রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধের কথাটাই ভাবিতে ভাবিতে রাস্তা চলিতেছিল।

বিবাহের পাত্রীটি সে দিল্লীতে নিজক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। বয়স আঠারো উনিশ হইবে। বেশ মোটামোটা গোলগাল। রং ফর্সা না হইলেও কালোও বলা চলেনা। চেহারায় স্বাস্থ্যের লাবণ্য আছে। লেখাপড়া মোটামুটি শিখিয়াছে। স্থচিশিল্প ও রন্ধনাদি গৃহকর্মে সুনিপুণা বলিয়া পাত্রীর পিতা উচ্ছ্বসিত সার্টিফিকেট নিজগৃহেই অবাচিত দাখিল করিয়াছিলেন।

মেয়েটি রাখালকে এবং যোগেশকে :নমস্কার করিয়া অতিশয় গম্ভীরমুখে অত্যধিক অবনতশিরে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। সেই মেয়েটি যদিই প্রজাপতির দুর্বিপাকে তাহার পত্নী হইয়া গৃহে আসে, কেমন মানাইবে? মেয়েটির সেই অতিগম্ভীর মুখ ও উঁচু করিয়া বাঁধা চিবির মত মস্ত খোঁপাসমেত্ অতি অবনত মাথাটি মনে পড়িয়া রাখালের অকস্মাৎ অত্যন্ত হাসি আসিল।

জীবনের সর্ব অবস্থায় সকল প্রকার দুঃখে-সুখে পাশে দাঁড়াইয়া হাসি-মুখে আশ্বাস দিতে পারে, আনন্দ ও তৃপ্তি পরিবেশন করিতে পারে, এমনতর ভরসা করা যাইতে পারে কি ঐ মেয়ের'পরে? দূর দূর!

দিল্লীতে আরও যে কয়টি পাত্রী রাখালকে দেখানো হইয়াছিল তাহারাও কম বেশি তথৈবচ। রাখালের মানসপটে চিন্তায় চিন্তায় বহু-

বালিকা কিশোরী তরুণীর রকমারি রূপচ্ছবি কুটিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন একজনকেও সে মনে করিতে পারিলনা যাহার উপরে চিরদিনের মতো আপন জীবনের ছঃখস্বথের সকল ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত নির্ভরতা লাভ করা সম্ভব।

সমস্ত মুখগুলিকে আড়াল করিয়া একখানি কোমল শান্ত অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত সুন্দর মুখ বারংবার তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। অথচ বিবাহের পাত্রী নির্বাচন-ব্যাপারে সে মুখ স্মরণে জাগিবার কোনো অর্থই হয়না, তাহা আর যে-কেহ অপেক্ষা রাখাল নিজেই ভাল করিয়া জানে। কিন্তু সে বাহাই হউক, রাখালের প্রতি গুগাঢ় বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় সে-মুখের কাস্তিই অন্তবিধ। বাহা আর কাহারো সহিত তুলনা করা চলেনা।

শুধু বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই নয়, একান্ত আপনজন সুলভ নিবিড় হৃদয়তার মাধুর্য্য সেই চক্ষুদ্বয়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, অনাবিল হাসির ভঙ্গীতে বাহা স্বতঃই ক্ষরিত হইয়া পড়িত, তাহার সহিত সংসারে আর দ্বিতীয় কাহারো কি উপমা চলে? রাখাল যে তাহারই ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জড়িত অকুণ্ঠ নির্ভরতা লাভ করিয়াই আজ নিজেকে বিবাহের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া ক্ষণেকের তরেও চিন্তা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

* ভাবিতে ভাবিতে ভাবনার মূলমন্ত্র হারাইয়া ফেলিয়া রাখাল সারদার ভাবনাই ভাবিয়া চলিল।

সারদা সেদিন রাত্রে তাহাকে বলিয়াছিল,—আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

কিন্তু সত্যই কি তাই? রাখাল অনেকেরই অনেক করে একথা হয়তো গত্য, সারদারও সে সামান্য কিছু উপকার বা সাহায্য করিয়াছে।

কিন্তু, তাহাতে রাখালের কি কোনও ক্ষতিই হয় নাই? তাহা যদি না-ই হইবে তবে কেন সে সেদিন রাত্রে অমনভাবে আত্মসংবরণে অক্ষম হইল? শুধু সারদাকেই যে রুঢ়-তিরস্কার করিল তাহাই নহে, তাহার মাতৃস্বরূপিণী নতুন-মাকে পর্য্যন্ত কটুকথা শুনাইয়া দিল একজন অপরাধবস্তির সম্মুখেই।

তারককে সারদা যদি বড় আদর করে, তাহাতে রাখালের ক্ষুব্ধ হইবার কী আছে! সারদার নিকটে রাখালও যে, তারকও সে। বরং রাখাল অপেক্ষা তারক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। তাহার এই সকল গুণেরই সেদিন উল্লেখ করিয়াছিল সারদা, তাহাতে এমন কি অপরাধ সে করিয়াছে বাহার জন্ত রাখাল অমন জলিয়া উঠিল? কেন সে অকস্মাৎ নিজেকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত অনুভব করিল?

ভাবিতে ভাবিতে মুখ চোখ ও কান উত্তপ্ত হইয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিকটস্থ একটা পার্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরিবিলাি কোণের একটি শূন্য বেঞ্চিতে রাখাল সটান্ শুইয়া পড়িল।

চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল দিন দুই-তিন পূর্বে এস্প্র্যান্ডের মোড়ে সে ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। একখানি চলন্ত মোটর হইতে বুঁকিয়া বিমলবাবু হাত নাড়িয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখাল বিমলবাবুর পানে তাকাইলে তিনি মোটর থামাইয়া হাত ইসারায় তাহাকে নিকটে ডাকিয়া গাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িয়াছিলেন। রাখাল নিকটে গেলে বিমলবাবু সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন,— তোমার কাকাবাবুর ও রেণুর চিঠিপত্র পেয়েছে কি রাজু?

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া রাখাল বলিয়াছিল—কেন বলুন তো?

বিমলবাবু বলিলেন—তঁার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেশে গিয়ে তঁারা কেমন আছেন খবর পাইনি, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাখাল জবাব দিয়াছিল—তঁারা ভালই আছেন।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—তুমি কবে চিঠি পেয়েছ ?

সে উত্তর দিয়াছিল—দিন চারেক হবে। তারপর মৌখিক সৌজন্তে
বিমলবাবুকে প্রশ্ন করিয়াছিল—আপনি কোন্‌দিকে চলেছেন ?

বিমলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন—একবার সারদা-মার খোঁজ
নিতে যাচ্ছি।

ইহাতে অতিমাত্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া সে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিয়া
ফেলিয়াছিল—কোন্‌ সারদা ?

বিমলবাবুও ঈষৎ আশ্চর্য্য হইয়াই জবাব দিয়াছিলেন—সারদাকে তো
তুমি চেনো।

রাখাল শুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল—সেত' এখানে নেই ! নতুন-মার সঙ্গে
হরিণপুরে তারকের কাছে গেছে।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—সে কি ? তুমি কি জানোনা সারদা তোমার
নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুরে যায়নি ?

রাখাল উত্তর দিয়াছিল—না। এ খবর আমি শুনিনি। আমি
তঁাদের যাবার আগের দিন রাত্রি পর্য্যন্ত সারদার সেখানে যাওয়াই স্থির
দেখে এসেছিলাম।

বিমলবাবু বলিয়াছিলেন—তাই স্থির ছিল বটে, কিন্তু আমি ষ্টেশনে
গিয়ে দেখলাম সারদা আসেননি।

তোমার নতুন-মা বললেন—তার যাওয়ার উপায় নেই। আমাকে
বলে গেলেন—সারদা একা থাকলো, মাঝে মাঝে তার খোঁজখবর নিও।
তাই মাঝে মাঝে তার খবর নিতে যাই।

রাখাল পুনরায় প্রশ্ন করিয়া বসিল—সারদা কেন হরিণপুরে গেলনা,
জানেন কি ?

বিনলবাবু বলিলেন—সারদাকে জিজ্ঞাসা করে শুনলাম, মালিকের হুকুম ভিন্ন এ বাড়ী ছেড়ে অল্প নড়বার তার উপায় নেই।

রাখাল বিমূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিল—কে মালিক ?

বিনলবাবু উত্তর দিয়াছিলেন—ঠিক জানি না। হয়ত তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী বলেই মনে হয়।

রাখাল মুদিতচক্ষে পার্কের বেষ্ট্রে শুইয়া এস্প্রাশনেডে বিনলবাবুর সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্তাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ চিন্তা করিতে লাগিল। সারদা হরিণপুরে নতুন-মার সহিত কেন গেলনা ? বলিয়াছে—মালিকের হুকুম ব্যতিত তাহার অল্প যাওয়ার উপায় নাই। সে মালিক কে ? বিনলবাবু কিংবা আর যে কেউ সারদার নিরুদ্দিষ্ট স্বামী জীবনবাবুকে সেই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করুন না কেন—একমাত্র রাখাল নিজে নিশ্চিতরূপে জানে, আর যাহাকেই সারদা তাহার মালিক বলিয়া নির্দেশ করুক, পলায়িত বিশ্বাসঘাতক জীবনচক্রবর্তীকে কখনই করে নাই।

বুঝিতে কিছুই তাহার বাকি রহিলনা। তবুও রাখালের মনের মধ্যে কোথায় যেন কি-একটা বিরোধ বাধিতে লাগিল।

এগারটা বাজিলে পার্কের রক্ষক আসিয়া রাখালকে উঠিয়া যাইতে অনুরোধ করিল। উঠিয়া ভারাক্রান্ত মনে সে বাসায় যখন পৌঁছিল সাড়ে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার পূর্বে মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল—কাল সকালে উঠিয়াই সারদার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিবে। চা বাসায় খাইবে না। সারদাকেই চা তৈয়ার করিয়া দিতে বলিবে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর রাখাল মনে মনে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিল। তার পর নানারূপ সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন যখন রাখালের ঘুম ভাঙিল বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। ফেরিওয়ালার উচ্চ হাঁকে গলি মুখরিত। দেওয়ালের ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া রাখাল একটু লজ্জিতভাবে উঠিয়া পড়িল। মুখ হাত ধোওয়া হইলে কামাইবার সরঞ্জাম বাহির করিয়া পরিপাটরূপে দাড়ি কামাইয়া ফেলিল। ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি বাহির করিয়া জামা কাপড় বদলাইয়া লইল। মনোযোগের সহিত চুল ব্রাশ করিতে করিতে চা-পিপাসায় ঘন ঘন তাহার হাই উঠিতে লাগিল। হাসিয়া ষ্টোভটির পানে তাকাইয়া রাখাল মৃদুকণ্ঠে কহিল—আজ তোমার এ'বেলা ছুটি।

খুঁটিনাটি কাজকর্ম যথাসম্ভব দ্রুতহস্তে সম্পন্ন করিয়া বার্ষিককরা ঝক্-ঝকে জুতা জোড়া পরিত্যক্ত ময়লারুমালে সযত্নে ঝাড়িয়া পায়ে দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে পিওন্ হাঁকিল—টেলিগ্রাম—

রাখাল জুতা ফেলিয়া রাখিয়া উৎসুক আগ্রহে ছুটিয়া আসিল। সহি করিয়া দিয়া টেলিগ্রাম খুলিয়া পাঠ করিতে করিতে ছুঁর্বানায় মুখ তাহার অন্ধকার হইয়া উঠিল। ব্রজবাবু বিশেষ পীড়িত। রেণু তাহাকে সত্বর বাইতে অনুরোধ করিতেছে। টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া অল্পক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল সারদার সহিত আজ আর দেখা করিতে যাইবে কিনা! টাইম টেবল্ বাহির করিয়া ট্রেনের সময় দেখিয়া ফেলিল। বেলা ন'টায় একটা ট্রেন আছে বটে কিন্তু তাহা ধরিতে পারা যাইবে না। এখন সাড়ে আটটা। বেদানা আঙুর কমলা-লেবু প্রভৃতি ফলমূল এবং রোগীর প্রয়োজনীয় অত্যন্ত দ্রব্যসামগ্রীও কিছু কিনিয়া লইতে হইবে। স্নতরাং ন'টায় ট্রেন পাওয়া

অসম্ভব। পরের ট্রেন বেলা সাড়ে বারোটায়, যথেষ্ট সময় রহিয়াছে। দ্বারে তালাবদ্ধ করিয়া রাখাল চিন্তিত মুখে সারদার সহিত দেখা করিতে চলিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার পূর্বে একবার তাহাকে জানাইয়া যাওয়া উচিত। ইচ্ছা, সেখানেই সত্বর চা পান করিয়া ফিরিবার মুখে প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি কিনিয়া লইয়া সাড়ে বারোটার ট্রেনে রওনা হইবে।

সারদার বাসায় পৌছিয়া রাখাল দেখিল রোয়াকে নাছুর পাতিয়া সারদা চার পাঁচটি ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে পড়াইতেছে। কেহ শ্লেটে লিখিতেছে, কেহ বানান শিখিতেছে, কেহ বা করিতেছে ছড়া মুখস্থ। রাখালকে দেখিয়া সারদা বাস্তব অথবা আশ্চর্য্য হইলেন। আন্তে আন্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছেলেদের বলিল—যাও, তোমাদের এখন ছুটি। হুপুর বেলায় আজ পড়তে হবে।

ছেলেরা চলিয়া গেলে সারদা রোয়াক হইতে উঠানে নামিয়া রাখালকে প্রণাম করিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ঘরে বসবেন চলুন।

রাখাল শুক কণ্ঠে কহিল—নাঃ, বসবার আর সময় নেই। দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেই চলে যাব।

রাখাল হয়তো মনে মনে আশা করিয়াছিল সারদা তাহাকে অভাবিত রূপে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইবে। কিন্তু সারদার ব্যবহারে মনে হইল রাখাল যে আজ এই সময়ে আসিবে তাহা যেন সে পূর্বে হইতেই জানিত।

একে রেগুর টেলিগ্রাম পাইয়া মন ছিল উদ্বিগ্ন চঞ্চল, তাহার উপর সারদার সহজ শান্ত অভ্যর্থনা রাখালের চিত্ত বিরূপ করিয়া তুলিল।

মনের ভিতরে এমন একটা অহেতুক অভিমান গুমরাইতে লাগিল বাহার কারণ স্পষ্ট নির্দেশ করা কঠিন।

রাখাল বলিল,—তুমি নতুন-মার সঙ্গে হরিণপুর যাওনি শুনলাল।

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া রাখাল পুনরায় বলিল,—কেন গেলেনা জানতে পারি কি?

সারদা তথাপি নিরুত্তর।

রাখাল কহিল—নতুন-মাকে একলা না পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গী হওয়া তোমার উচিত ছিলনা কি?

সারদা কোনই উত্তর দেয়না দেখিয়া রাখালের মনের মধ্যে উদ্ভাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল। মৌনতা ভাঙাইবার জন্তই বোধ হয় এবার বলিয়া বসিল—আমার ঋণ তো সেদিন কড়ায় গুণায় শোধ করে দিয়েচ, স্মরণ্য কথার উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু নতুন-মার ঋণও এরই মধ্যে শুধে ফেলেচ নাকি সারদা?

সারদার মুখে বেদনার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তবুও সে এই কঠিন উপহাসের উত্তর দিলনা। মুহূর্ত্তে বলিল—আপনার যা' বলবার আছে ঘরে এসে বলুন। এখানে দাঁড়িয়ে হাটের মাঝখানে বলবেন না। ঘরে গিয়ে বসুন। আমি এখুনি আসছি। চলে যাবেননা, আমার অমুরোধ রইলো।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই সারদা মুহূর্ত্ত মধ্যে রোয়াকের অন্ত পাশে বেড়া দেওয়া অপর ভাড়াটেদের অংশে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিরক্ত রাখাল তাহার উদ্দেশ্যে ব্যস্ত স্মরে বলিতে লাগিল—না-না, বসবার আমার মোটেই সময় নেই। এখুনি যেতে হবে। যা বলতে এসেছি— শুনে যাও—

কিন্তু সারদা তখন চলিয়া গিয়াছে। রাখাল অল্পক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়া চলিয়া বাইবে কি আরও একটু অপেক্ষা করিবে দ্বিধা করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত চিন্তে সারদার ঘরে গিয়া বসিয়াই পড়িল। পাঁচজনের বাড়ীর মাঝে চোঁচাইয়া সারদাকে বারবার ডাকাও বায়না, দাঁড়াইয়া থাকাটা আরও অশোভন। রাখাল ঘরে গিয়া বসিবার একমিনিটের মধ্যেই সারদা ক্ষুদ্র এলুমিনিয়াম কেটলীর হাতলে শাড়ীর আঁচল জড়াইয়া মুঠি করিয়া ধরিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঢাক্‌নী চাপা দেওয়া কেটলী হইতে অল্প অল্প গরম ধোঁয়া বাহির হইতেছিল। ঘরের কোণে কেটলী নানাইয়া রাখিয়া দ্রুত হস্তে জানালার মাথায় তাকের উপর হইতে একটি ধবধবে শাদা পাতলা কাচের পেয়লা পিরিচ এবং একখানি নূতন চামচ নামাইল। ক্ষুদ্র চায়ের টিনও একটা নামাইল। চায়ের টিনটি একেবারে নূতন, প্যাক খোলা হয় নাই। সারদা লেবেল্ ছিঁড়িয়া ক্ষিপ্রহস্তে চীন খুলিয়া ফেলিয়া কেটলীর জলে চাপাতা ভিজাইয়া ঢাক্‌নী চাপা দিল। তারপর পেয়লা পিরিচ ও চামচ বাহির হইতে ধুইয়া আনিল এবং সেই সঙ্গে লইয়া আসিল কাগজের মোড়কে চিনি ও ক্ষুদ্র কাঁসার গ্যাসে টাটকা দুধ।

চৌকিতে বসিয়া রাখাল নিঃশব্দে সারদার কার্যকলাপ দেখিতেছিল। বেলা হইয়াছে যথেষ্ট অথচ চা পান করা হয় নাই। মাথাটি বেশ ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। স্মরণে সারদার চায়ের আয়োজন দেখিয়া তাহার বিরক্তি ও অভিমান অনেকখানিই কমিয়া গিয়াছিল। তথাপি সন্দ্রম বজায় রাখিবার জন্তই বলিল—এত সমারোহ করে চা তৈরি হ'চ্ছে ক'র জন্ত?

সারদা পেয়লায় চা ছাঁকিতে ছাঁকিতে মুহূ হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া একবার রাখালের পানে তাকাইল। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল।

মনে মনে লজ্জিত হইলেও রাখাল তখন বলিতে পারিল না—আমি উহা খাইবনা। সারদা ততক্ষণে দুধ চিনি মিশ্রিত সোনালী বর্ণ গরম চায়ে চামচ নাড়িতে নাড়িতে পিরিচ সমেত পেয়ালাটি রাখালের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে।

লইতে দ্বয়ং ইতস্ততঃ করিয়া রাখাল বলিল—এর জন্ত এতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখা তোমার উচিত হয়নি সারদা। কিচ্ছু দরকার ছিলনা এর।

সারদা নিতান্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল—আমি তা' জানতামনা। আচ্ছা তবে থাক্, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

চৌটের প্রান্তে চাপা ছুষ্ঠ হাসি। রাখাল ঐ হাসি চেনে। তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া বলিল—নাঃ, করেইছ যখন আমার নাম করে, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবেনা।

সারদা এইবার চৌট টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। অল্প একটু পরে শাদা কাচের একখানি প্লেটে খান কয়েক গরম শিঙাড়া ও গোটা দুই টাটকা রাজভোগ রসগোল্লা লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাখাল প্লেটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল—ওসব আবার আনাতে কেন সারদা ?

সারদা গম্ভীর মুখে বলিল—চায়ের সঙ্গে জলযোগের জন্ত। কিন্তু চায়ের পেয়ালাটি যে খালি করে দিতে হবে এবার। আর এক পেয়ালা চা আপনাকে হেঁকে দেব। আমার অল্প পেয়ালা আর নেই।

রাখাল এবার আর আপত্তি তুলিলনা। এক নিশ্বাসে অবশিষ্ট চা টুকু পান করিয়া লইয়া পেয়ালাটি মেঝের নামাইয়া দিল। তাহার পর নির্বিবাদে তুলিয়া লইল খাবারের প্লেটখানি।

সারদা দ্বিতীয় পেয়ালা চা লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে রাখাল

খাবার খাইতে খাইতে মুখ না তুলিয়াই প্রশ্ন করিল—আচ্ছা সারদা, তুমি নিজে তো চা খাওনা ! ঘরে চায়ের সরঞ্জাম রেখেচ কার জন্য ?

সারদা নিরীহ মুখে বলিল—এই ধরুন, তারকবাবু টাবু—

রাখাল বলিল—ও—বুঝেচি। হাতের অর্ধ সমাপ্ত শিঙাড়াটি শেষ করিয়া খাবার সমেত প্লেটখানি রাখাল নামাইয়া রাখিল।

সারদা ব্যস্ত হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া অকৃত্রিম ব্যগ্রতায় বলিয়া উঠিল—ওকি ? রসগোল্লা মোটে ছুঁলেনইনা যে। না না, তা' হবেনা দেবতা ! তুলে নিব্ রেকাবি। সবগুলি না খেলে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো কিন্তু বলে রাখচি।

অকস্মাৎ সারদার এই আন্তরিক চাঞ্চল্যে রাখাল হতভম্ব হইয়া বিমূঢ়ের দ্যস্ত পরিত্যক্ত প্লেট তুলিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু আমার যে সত্যিই খেতে রুচি নেই সারদা ! সমস্ত খাবারগুলি না খেলে কি যথার্থই তোনার কষ্ট হবে ?

সারদা আরক্ত মুখে কহিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হবে। আপনি থান্ বলচি। রসগোল্লা আপনি কত ভালবাসেন আমি জানিনে বুঝি ? সকালে গরম শিঙাড়া চায়ের সঙ্গে রোজইত আনিয়া খান্। বলুন, থান্না ?

রাখাল বিস্মিত কৌতুকে বলিল—কিন্তু তুমি এসব গুপ্ত-সংবাদ জানলে কেমন করে ?

সারদা শান্তভাবে কহিল—আমি জানি। তারপরে হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, এক পেয়ালা চায়ে আপনার কোনওদিন তেষ্ঠী মেটে ? দু' পেয়ালা চা না হলে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে না কি ?

রাখাল রসগোল্লাভরা গালে ভারী গলায় বলিল—হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু আমি যে বাসায় চা খাই ঠিক এই রকম বড় পেয়ালায়, তারক কি সে খবরটাও তোমাকে দিয়ে গেছে ?

সারদা জবাব দিলনা। রাখালের চা ও খাবার খাওয়া হইয়া গেলে মুখ ধোওয়ার জল ও স্পারী এলাচ আনিয়া দিল।

হাত-মুখ মুছিবার জন্ত একখানি পরিচ্ছন্ন গামছা হাতে দিয়া সারদা বলিল—উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় বা' বলতে চাইছিলেন, এইবার উঠোনে নেমে, তা' বলবেন চলুন।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—সারদা, তুমি দেখছি আজকাল আমাকে প্রতি কথায় উপহাস করো।

জিভ্ কাটিয়া সারদা বলিল—বাপ্‌রে! কি বলেন দেব্‌তা? এত বড় দুঃসাহস আমার নেই। ব্রহ্মভেজে ভস্ম হয়ে যাবোনা?

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল—আমি জানতে এসেছিলাম তুমি নতুন-মাকে একা হরিণপুরে পাঠিয়ে কী গুরুতর প্রয়োজনে কলকাতায় রইলে? তোমাকে সত্যি করে এর জবাব দিতে হবে।

সারদা অলক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আগে আপনি আমার একটি কথার সত্যি ক'রে জবাব দেবেন বলুন?

—দেবো।

—যে-প্রশ্ন আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, নিজে কি তার জবাব সত্যিই জানেন না?

রাখাল মুস্থিলে পড়িল। আমতা আমতা করিয়া বলিল—আমি বা' অনুমান করেছি সেটা ঠিক কিনা জানবার জন্তই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি সারদা!

সারদা বলিল—তা'হলে জেনে রাখুন, মনের কাছ থেকে যে জবাব পেয়েছেন, সেইটেই সত্যি। নিজের অন্তর কখনও মাহুষকে ঠকায়না।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সারদা উচ্ছিষ্ট পেয়ালা-পিরিচ ও

রেকাবি উঠাইয়া বাহিরে লইবার উত্থোগ করিতেছে, সেইদিকে তাকাইয়া রাখাল কহিল—তবুও নিজের মুখে বুঝি স্পষ্ট বলতে পারলেনা, কেন বাওনি !

সারদা হাসিয়া হাতের উচ্ছিষ্ট পেয়ালা প্লেটগুলি ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল—এরই জন্ত বাইনি। এইবার স্পষ্ট জবাব পেলেন ত ? বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাখাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতে লাগিল কিছুদিন পূর্বে সে বলিয়াছিল—ছুনিয়ার সারদাদের সে অনেক দেখিয়াছে। কিন্তু মতাই কি তাই ? এই সারদার সমতুল্য কি আর একটি মেয়েরও জীবনে দেখা পাইয়াছে ? জীবনদানের মূল্যে এমন করিয়া নিঃশব্দ জীবন উৎসর্গ আর কে করিতে পারে ?

ধোওয়া বাসনগুলি আনিয়া, তাকের উপরে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে সারদা বলিল—প্রথম যেদিন আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছিলেন দেবতা, আপনাকে চা তৈরী করে খাওয়াতে চেয়েছিলাম। আপনি বলেছিলেন—অসময়ে চা খাওয়া আপনার সহ্য হয়না। জলখাবার আনিয়া দিতে চেয়েছিলাম, আমার আগ্রহ দেখে আপনার দয়া হয়েছিল। বলেছিলেন, আবার যেদিন সময় পাবো, আমি নিজে চেয়ে তোমার চা তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো। সেই থেকে আমি চায়ের সরঞ্জাম ঘরে জোগাড় করে রেখে দিয়েছি। জানতাম—একদিন না একদিন আপনি এই ঘরে বসে আমার হাতের চা-জলখাবার গ্রহণ করবেনই। কিন্তু বলেছিলেন নিজে চেয়ে নিয়ে খাব। আমার ভাগ্যে সেটা আর হোলনা।

রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে পড়িল সে আজ বাসা হইতে বাহির হইয়াছিল চা-জলখাবার চাহিয়া থাইবে বলিয়াই।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখালের হঠাৎ মনে পড়িল

বাজার করিয়া শীঘ্র বাসায় ফেরা প্রয়োজন। সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ আমি যাই সারদা! সাড়ে বারটায় আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।

সারদা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় যাবেন?

—কাকাবাবুর বড় অসুখ। রেণু যাওয়ার জন্ত তার করেছে।

সারদা চিন্তিত মুখে বলিল—নতুন-মাকে খবর দিয়েছেন?

—না। নতুন-মা তো হরিণপুরে। তুমি তাঁর চিঠিপত্র পাও নাকি?

হাঁ। তিনি প্রতি চিঠিতেই কাকাবাবু ও রেণুর সংবাদ জানতে চান। আপনার কুশলও প্রতি পত্রেই জিজ্ঞাসা করেন।

রাখাল বলিল—তা'লে খবরটা তুমিই তাঁকে লিখে দিও। আমায় তিনি চিঠিপত্র দেননি।

সারদা বলিল—তা' দেব। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন দেবতা। আমার ফিরতে বেশী দেরী হবেনা।

সারদা টানের তোরঙ্গটি খুলিয়া কতকগুলি কাপড় বাহির করিয়া লইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারদা মিলের ফর্সা শাড়ী ও মোটা সেমিজে পরিচ্ছন্ন বেশে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি হাতে ঘরে ঢুকিল।

বিস্মিত রাখাল সারদার মুখের পানে চাহিতে সারদা কহিল—আমাকেও যে আপনার সঙ্গে বেতে হবে দেবতা।

রাখাল অতিরিক্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুমি কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?

—কাকাবাবুর অসুখ। রেণু ছেলেমানুষ একলা। আমি গেলে অনেক দরকারে লাগতে পারব।

রাখাল অকুণ্ঠিত করিয়া কহিল—কিন্তু—

বাধা দিয়া সারদা বলিল—অমত করবেননা দেবতা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। কাঁকাবাবু আমায় চেনেন, রেণুও আমায় জানে। আমি গেলে ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন না, দেখবেন! সারদার কণ্ঠস্বরে নিবিড় মিনতি ফুটিয়া উঠিল।

রাখাল দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল সারদাকে সঙ্গে লইয়া গেলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবেনা। বলিল—আচ্ছা, চলো তা'হলে। কিন্তু, তোমার খাওয়া তো হয়নি। আমি বাজার করে ফিরে আসছি। তুমি এগারটার মধ্যে স্নানাহার করে তৈরি হয়ে নাও।

সারদা কহিল—আপনার খাওয়ার কি হবে?

—আমি ষ্টেশনে রেস্টোরাঁয় খেয়ে নেব ঠিক করেছি।

—আমার রান্না চড়ে গেছে। আপনি সাড়ে দশটার মধ্যে খাবার তৈরী পাবেন। এখানেই আজ দু'টি খেয়ে নিন্না দেবতা!

—না, না, আমার খাওয়ার জন্ত তোমাকে হাদ্গানা করতে হবেনা। আমি দোকানে খাবার খেয়ে নিতে পারব।

—আপনাকে ভাত খেতে হবেনা। গরম লুচি ভেজে দেব। লুচি খেতে আপনার আপত্তি কি?

—আপত্তি কিছু নেই। এই তো সেদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ খেলায় তোমার কাছে। এখনও পেটের ভিতর চা-জলখাবার হজম হয়নি।

—তা'হলে খানকতক লুচিই ভেজে দিই?

—খাই যদি, ভাতই খাব, লুচি নয়। জাতের বালাই আমার নেই। আমি এখনো তারকবাবু হ'য়ে উঠতে পারিনি।

সারদা হাসিয়া বলিল—তারকবাবুর উপর এত বিরূপ কেন দেবতা।

রাখাল বলিল—নিশ্চয়ই তুমি জানো, তারক বার-তার হাতের অন্ন গ্রহণ করেনা !

সারদা হাসিতে লাগিল, জবাব দিলনা ।

রাখাল বলিল—চললুম তা'হলে । জিনিষপত্র কিনে একেবারে বাসা থেকে স্নান সেরে বাস্তু বিছানা নিয়ে ফিরব এখানে । তুমি প্রস্তুত থেক ।

রাখাল বাহির হইয়া গেল । ফিরিয়া আসিল প্রায় পোনে এগারটায় । একটি ফলের টুকরিতে কমলালেবু, বেদানা, আঙুর প্রভৃতি ফল, তালমিশ্রী, বার্লি, পার্ল সাগু, একটীন উৎকৃষ্ট মাখন, একটীন রোগীর পথ্য হাল্কা বিস্কুট ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়াছে । এ'ছাড়া, বেড্‌প্যান্, হটওয়াটার ব্যাগ, আইস্‌ ব্যাগ, অয়েল রুথ প্রভৃতি রোগীর প্রয়োজনীয় কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রীও কিনিয়াছে । আর আছে তার নিজের বিছানা ও বাস্তু ।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়াই ভাত চাহিল । সারদা ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া ঠাই করিয়া রাখিয়াছিল । রাখালকে হাত পা ধুইবার জল ও গামছা আগাইয়া দিয়া ভাত বাড়িয়া আনিল ।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—তুমি তৈরি তো সারদা ?

সারদা জবাব দিল—আমি তো অনেকক্ষণ তৈরি ।

রাখাল আসনে বসিয়া নিঃশব্দে আহারে মন দিল । আহারের আয়োজন অতি সামান্যই । কিন্তু, তাহার অন্তরালে যে আন্তরিকতা ও সযত্ন আগ্রহ বর্তমান, তাহার পরিচয় রাখালের অন্তরের অজ্ঞাত রহিলনা । তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিয়া উঠিলে সারদা আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দিল । রাখাল জীবনে কোনও দিন এরূপ সেবা গ্রহণে অভ্যস্ত নহে । স্মৃতরাং তাহার যথেষ্ট বাধো বাধো ঠেকিতেছিল । কিন্তু সারদার এই ঐকান্তিক সাগ্রহ যত্নে বাধা দিতে প্রবৃত্তি হইল না । আঁচাইবার জল হাতে ঢালিয়া দাঁত খুঁটিবার খড়িকা দিল । তারপরে গামছাখানি

রাখালের হাতে তুলিয়া দিয়া সারদা গুটিকয় টাটকা সাজাপান আনিয়া সামনে ধরিল।

রাখাল কহিল—একেই বলে বিধাতার মাপা। কোথায় ষ্টেশনে কেন্দ্র খাবার, আর কোথায় সারদার হাতের রান্না অমৃতোপম অন্নবাজন? মাগ আঁচাবার জল, দাঁত খোঁটার খড়কে, হাত মোছার গানছা, ঘরে সাজাপান। আজ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম!

সারদা মূহু হাসিল, কিছু বলিলনা। রাখালের উচ্ছিষ্ট থালা বাটা বাহিরে লইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আপনি একটু বসুন। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

রাখাল একটি সিগারেট ধরাইয়া লইয়া শূন্য তক্তাপোষের এককোণে বসিয়া পরিতৃপ্তি পূর্বক টানিতে প্রবৃত্ত হইল। চাহিয়া দেখিল, সারদা একখানি মলিন ক্ষুদ্র সতরঞ্চি মোড়া বিছানার ছোট বাগিল্ তক্তাপোষে রাখিয়া গিয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলি বা বাক্স নাই।

সারদা ফিরিয়া আসিল সত্য সত্যই দশমিনিটের মধ্যে। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—তোমার খাওয়া হয়েছে সারদা?

সারদা বলিল—খেতেই তো গিয়েছিলাম।

—সে কি? এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল? নিশ্চয়ই তুমি ভাল করে খাওনি।

সারদা হাসিয়া কহিল—আজ আমি সবচেয়ে ভাল করে খেয়েছি। দেবতার প্রসাদ কি হেনস্তা করে খেতে আছে? এখন নিন্, উঠুন। সব প্রস্তুত। আপনার তো দেখছি লগেজ্ অনেকগুলি। একটি স্ট্রেকেস্, একটি এটাচি কেন্, একটি বিছানা, একটি ফলের ঝুড়ি, একটা প্যাকিং বাক্স, মাগ একটি জীবন্ত লগেজ্ পর্য্যন্ত।

রাখাল সারদার পরিহাসের জবাব না দিয়া বলিল—তোমার তো বেড়িঃ প্রস্তুত দেখছি। কাপড়-চোপড়ের বাস্তব কই?

সারদা বলিল—খান তিনেক শাড়ী আর গোটা দুই সেমিজ ঐ বিছানার সঙ্গেই বেঁধে নিয়েছি।

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল—ওতে কুলুবে কেন?

সারদা মুহূ হাসিয়া বলিল—যথেষ্ট। ময়লা হলে সাবান দিয়ে সাফ করে নেব। যা নিত্য এখানে করি।

রাখাল একটুখানি গুম হইয়া রহিল। বারংবার মনে হইতে লাগিল বলে,—কাপড়ের তোমার এত অভাব, এটা কি আমাকে জানালে তোমার অপমান হ'ত সারদা?—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিলনা। রাগের ঝোঁকে টাকা ফেরৎ লইবার কথা মনে পড়ায় নিজেকে অপরাধী মনে হইতে লাগিল। রাখাল উদাস কণ্ঠে কহিল, তা'হলে এবার ট্যাক্সি নিয়ে আসি।

সারদা সচকিতে বলিয়া উঠিল—ওমা,—বলতে একেবারেই ভুলে গেছি দেবতা—আপনি বাজার করতে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই বিমলবাবু এসেছিলেন। তিনি বলে গেছেন একটা জরুরী কাজে যাচ্ছেন, এখনই ফিরে আসবেন। আপনার সঙ্গে তাঁর দরকার আছে। তিনি তাঁর মোটরে আমাদের ষ্টেশনে পৌঁছে দেবেন বলে গেছেন।

রাখালের মুখ-ভাবের কোমলতা অন্তর্হিত হইল। শুদ্ধ স্বরে কহিল—আজকে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই সারদা। ফিরে এলে দেখা হবে দেবী করা চলেনা, আমি ট্যাক্সি আনতে চল্লুম। রাখালের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সদর দরজার সম্মুখে মোটরের হর্ণ শোনা গেল এবং উঠান হইতে বিমলবাবুর আওরাজ পাওয়া গেল—সারদা মা—

সারদা বাহির হইয়া বলিল—আমুন।

বিনলবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—এই যে রাজু এসে গেছ। ভাগ্যে আজ এদিকে একটা দরকারে এসেছিলেন! মনে হল, পাশেই বখন এসে পড়েছি, সারদা-মাকে একবার দেখে যাই। এসে শুনলাম, ব্রজবাবুর অসুখের তার পেয়ে তোমরা আজই রওনা হচ্চ। চলো তোমাদের পৌছে দিয়ে আসি। বড় গাড়ীটাতাই আজ বেরিয়েছি, নালপত্র নেওয়ার অসুবিধা হবেনা।

অনিচ্ছাসঙ্গেও রাখাল আপত্তি করিতে পারিলনা। জিনিসপত্র গাড়ীতে উঠানো হইলে বিনলবাবু রাখালের হাত ধরিয়া বলিলেন—রাজু, আমার একটি অনুরোধ রেখো। ব্রজবাবুর অসুখে যদি কোনওরকম সাহায্যের প্রয়োজন বোঝে, আনাকে তার করতে ভুলোনা। রোগে অর্থবল ও লোকবল দুয়েরই দরকার। তুমি জানালে তৎক্ষণাৎ বড় ডাক্তার নিয়ে রওনা হতে পারব। আমি ব্রজবাবু ও রেণুর অকৃত্রিম হিতার্থী, বিশ্বাস করতে দ্বিধা কোরনা।

বিনলবাবুর কণ্ঠের গাঢ়তায় রাখাল বোধ হয় একটু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই দীর্ঘ আশ্চর্য্য ভাবেই তাঁহার মুখের পানে তাকাইল।

মান হাসিয়া বিনলবাবু বলিলেন—আমি জানি রাজু তোমার চেয়ে বড় বন্ধু আজ তাঁদের আর কেউ নেই। তবুও—আমার দ্বারা যদি তাঁদের কোনও দিক থেকে কোনও উপকার বিন্দুমাত্রও সম্ভব মনে করো, খবর দিতে ভুলোনা। এইটুকু তোমায় জানিয়ে রাখলাম।

রাখাল কি-বেন বলিতে যাইতেছিল, বিনলবাবু বলিলেন—রেণু আর ব্রজবাবু আজ কত বেশি অসহায় আমি তা' জানি রাজু!

রাখালের দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল। বলিল—আপনার প্রতি অবিচার করেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। কাকাবাবুর অসুখে যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, আপনাকে সংবাদ দেব।

তারকের স্ননিপুণ সেবায় বড়ে ও সুন্দর ব্যবহারে সবিতার পরিষ্কৃত মন অনেকখানি স্নিগ্ধ হইয়াছিল। উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যরসে অভিযুক্ত অন্তর লইয়া সবিতা তারকের প্রতি ব্যবহার, প্রতি কৰ্ম্ম, প্রতি কথাবার্তার মধ্যে আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন। তারকও সবিতাকে নিজের মায়ের মতই শুধু নয়, দেবতাকে ভক্ত যেমন নিরঙ্কুশ ক্রটিহীনতায় সেবা করে তেমনই ভাবে সেবা-বহ্ন ও সনাদরের বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই।

কথাপ্রসঙ্গে সবিতা একদিন তারককে প্রশ্ন করিলেন—তারক, তুমি আমাকে যে হরিণপুরে নিয়ে এলে বাবা, রাজুকে কি তা' জানাওনি ?
একটু কুণ্ঠিতভাবে তারক উত্তর দিল—না মা।

বিস্মিত হইয়া সবিতা বলিলেন—কিন্তু তাকেই তো তোমার সবাব আগে জানানো উচিত ছিল তারক।

তারক কহিল—কেন জানাইনি সেকথা আপনাকে অন্ত একদিন বলব মা।

সবিতা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—দুই বছর ভিতরে তোমাদের এমন কি ব্যাপার এরই মধ্যে ঘটে গেল, বা' মাকেও জানাতে কুণ্ঠিত হতে হচ্ছে বাবা !

নতমুখে তারক কহিল—রাখাল হয়তো সে-অভিযোগ আপনাকে জানিয়েচে কিংবা না জানিয়ে থাকলে শীঘ্র একদিন জানাবেই। সেজন্য আমিও আপনাকে সমস্ত বলবো ঠিক করেচি মা !

তারকের কুণ্ঠিত মুখের দিকে ক্ষণকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সবিতা বলিলেন—রাজুর তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুনেচি। আমি জানতাম তাকে তুমি চেনো। এখন বুঝতে পারছি, তুমি আমার রাজুকে চেনোনি বাবা !

তারক চঞ্চল হইয়া বলিল—কেন না ?

সবিতা বলিলেন—যত বড় অস্থায়ী যে-কেউ তার উপরে করুকনা, —রাজু ছুনিয়ায় কারো কাছে কারো নামে কখনো অভিযোগ করেনি, করবেওনা। অভিযোগ করার শিক্ষা জীবনে সে পায়নি তারক, সহ করার শিক্ষাই পেয়েছে।

তারক আরও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বলিল—আমাকে মাগ করুন না। আমার বলবার দোষে ভুল বুঝবেননা। বলতে চেয়েছিলাম রাখালের কাছে আপনি আমার সম্বন্ধে যে-ঘটনা শুনেছেন কিংবা শুনবেন, সেটা বাহ্যতঃ সত্য হলেও সমস্ত সত্য নয়।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন—আমি রাজুর কাছে কিছুই শুনিনি বাবা, কোনওদিন শুনে পাবওনা, সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তারক অকস্মাৎ ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল—কিন্তু এটা আমি কিছুতেই নানতে পারবোনা না, আপনাদের কাছেও আমাদের বিচ্ছেদের কারণ গোপন করা তার উচিত হয়েছে ! আপনি শুধু তাকে স্নেহরসে ও অনুরসেই পুষ্ট করে তোলেননি, আপনাদের কাছেই পেয়েছে সে তার শিক্ষা দীক্ষা বা' কিছু সমস্ত। আজ সে যে পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছে এবং ভদ্রলোকের মতই বেঁচে আছে, এর জন্ত বিপুল ঋণ তার কার কাছে ? কার আশ্চর্য্য অসাধারণ মন অসাধারণ জীবন রাখালের দৃষ্টি ও মনকে এতখানি প্রসার করে তুলেছে ! কার অপার স্নেহ, অন্তরাল হতে বিধাতার করুণার মতই তার জীবনকে

সতর্কভাবে রক্ষা করে আসচে। সেই মায়ের কাছে সত্য গোপন করা আমি ছায় বলে মানতে পারবনা না। আপনি বললেও নয়।

এক নিখাসে এতখানি বক্তৃতা করিয়া তারক দম্ লইতে লাগিল।

সবিতা স্থিরদৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিলেন। দীর্ঘকণ্ঠে কহিলেন—তারক, তোমাদের মধ্যে কি হয়েছে বাবা?

—বলি শুনুন তা'হলে মা। রাখাল আমার কাছে আপনার পরিচয় যা' দিয়েছিল, যদি আপনাকে সত্যিই সে নিজের মা বলেই জ্ঞান করতো, তা'হলে সে-পরিচয় দিতে কখনই পারতনা।

সবিতা কোনও কথা কহিলেননা এবং তাঁহার সম্মিত মুখভাবেরও কোনো পরিবর্তন দেখা গেলনা।

তারক পুনরায় সোৎসাহে বলিতে প্রবৃত্ত হইল,—আপনি বলেছিলেন মা, কারু সম্বন্ধে কোনও কথা উপযাচক হয়ে বলা তার প্রকৃতি নয়। কিন্তু আমিই তো তার বিপরীত প্রমাণ পেয়েছি। সে উপযাচক হয়েই আমার কাছে তার নতুন-মার এমন পরিচয় দিয়েছিল, যা' আমার জানবার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা। কিন্তু নির্বোধ বোঝেনি, আগুনকে ছাই বলে নির্দেশ করলে প্রথমে হয়তো মাহুয ভুল করতে পারে, কিন্তু সে-ভুল বেশিদ্দগ স্থায়ী হয়না। অগ্নি নিজের পরিচয় নিজেই প্রকাশ করেন।

সবিতা এবারও জবাব দিলেননা। পূর্ববৎ সপ্রশ্নদৃষ্টি মেলিয়া মৌনই রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—অদৃশ্য আমি স্বীকার করি না, সে যখন অনেককিছু অতিরঞ্জিত কাহিনী শুনিয়া আমাকে প্রশ্ন করেছিল—এ' সকল শুনে আমার ঘৃণা হচ্ছে কিনা? আমি জবাব দিয়েছিলাম—ঘৃণা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক রাখাল। তখন তো জানতামনা তার উদ্দেশ্যই

ছিল আপনার 'পরে আমার অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া। তা' নাহলে এ'সব কথা বলার তার কোনও প্রয়োজনই ছিলনা।

সবিতা এইবার কথা কহিলেন। শাস্তকণ্ঠে বলিলেন—রাজু মিথ্যা-কথা বলেনা তারক। সে যা' কিছু তোনাকে বলেচে, সমস্তই সত্য।

তারকের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আনতা-আনতা করিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল—আপনি জানেননা না, সে যে কি-ভয়ানক কথা—

সবিতা কহিলেন—জানি। তুমি যা'ই কেন শুনে থাকনা তারক, রাজুর মুখের কোনও কথাই মিথ্যা নয়।

তারকের কণ্ঠনালী কে যেন শব্দ মুঠায় চাপিয়া স্বররোধ করিয়া ফেলিল। চেষ্টা সত্ত্বেও আর একটি শব্দও কণ্ঠ হইতে নির্গত হইলনা।

সবিতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—তুমি রাজুর প্রতি শুধু ভুলই করোনি তারক, অবিচার করেচ। সে তোমাকে ভুল বোঝাতে চায়নি, বরং তুমিই পাছে কিছু ভুল বোঝো, সেই ভয়ে গোড়াতেই সমস্ত ঘটনা খোলাখুলিভাবে তোমাকে সে জানিয়েচে। যদি মনে করে থাকো তার কথা মিথ্যে, তা'হলে খুবই ভুল করেচো।

তারক শুষ্কস্বরে কহিল—কিন্তু না, আমি তো কিছুই জানতে চাইনি, সে উপযাচক হয়ে কেন—

সবিতা মলিন হাসিয়া কহিলেন—তুমি উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান। সমস্তদিকে মন মেলে চিন্তা করে ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি তোমার থাকাই সম্ভব। সংসারে দৃশ্যতঃ অনেক জিনিসই হয়তো আমরা একরকম দেখতে পাই, কিন্তু সাদৃশ্য থাকলেও তারা সমস্তই বস্তুতঃ এক নয়। তাছাড়া—এটা ত জানো—বাহির দিয়ে ভিতরের বিচার কোনও সময়েই করা চলেনা। এ সকল বিষয় সাধারণ লোকে বোঝেনা এবং বুঝতে চায়ওনা।

কিন্তু তুমি তাদের দলের নও রাজু তা জানত বলেই সে তার নতুন-নায়ের দুর্ভাগ্যের কাহিনী তোমার কাছে খুলে জানিয়েছিল।

তারক অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে মুখ তুলিয়া কহিল—রাখাল আমাকে বলেছিল মা একদিন, সংসারে হাজারের মধ্যে ন’শো নিরেনব্বই জন সাধারণ মেয়ে, ক্বচিৎ কখনও একটি অসাধারণ মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়।—নতুন-মা সেই ন’শো নিরানব্বইয়ে পর ক্বচিৎ-মেলা একটি মেয়ে। এঁকে কেউ ইচ্ছা করলেও অবজ্ঞা বা অবহেলা করতে পারেনা। সে সত্যি কথাই বলেছিল।

সবিতা কথা কহিলেননা। অন্তমনস্কে অন্তদিকে চাহিয়া রহিলেন। তারক একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া কণ্ঠস্বরে অনেকখানি আবেগ আনিয়া বলিতে লাগিল—শিশুবয়সে মাকে হারিয়েচি জ্ঞান হবার আগেই, চিনতাম কেবলমাত্র বাবাকে। বাবাই আমাকে নিজহাতে মানুষ করেছিলেন, বড় করেছিলেন। সেই বাবা যখন আত্মস্বথলোভে এনে দিলেন মাতৃহারী হতভাগ্য সন্তানকে এক বিমাতা, সেই দিনই দুঃখে অভিমানে ঘুণায় চলে এসেছিলাম দেশত্যাগী হয়ে। বাপের মুখ আর দেখিনি, দেশেরও নয়। আপনাকে পেয়ে না, জীবনে নতুন করে পেলাম পিতৃমাতৃ স্নেহের আশ্বাদ। আমার কাছে আপনি ‘মা’ ছাড়া অন্য আর কিছুই নয়। আপনার জীবনে যে-ঝড়, যে-আঘাত, যে-গুরুতর পরীক্ষাই এসে থাক্‌না, আপনার হৃদয়ের অপরিমেয় মাতৃস্নেহকে তা বিদূমাত্র শোষণ করতে পারেনি। সন্তানের পক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সবিতা বলিলেন—তোমার বাবা এখনও জীবিত?—তবে যে তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে তুমি পিতৃমাতৃহীন?

তারক হাসিয়া কহিল—ঠিকই বলেছি মা।—আমার জন্মদাতা

হয়তো আজও জীবিত থাকতে পারেন, আমার বাবা কিন্তু জীবিত নেই। পিতার মৃত্যু না ঘটলে মাতৃহারা অভাগা সন্তানের জীবনে বিমাতার আবির্ভাব ঘটেনা, এইই আমার বিশ্বাস।

সবিতা বিস্মিতনেত্রে তারকের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—জীবনে আমার বৃহৎ আশা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা অনেক। শুধু পেয়ে-পরে কোনও রকমে জীবনধারণ করে বেঁচে থাকতে চাইনে। আমি চাই প্রাচুর্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে সার্থক-সুন্দর জীবন নিয়ে বাঁচতে। হাজার জনের মাঝখানে আমারই প্রতি সবার দৃষ্টি পড়বে, হাজার নামের মাঝখানে আমার নামটি চিনতে পারবে সকলেই। কর্মজীবনের সার্থকতায়, যশে গোরবে সম্মানে প্রতিপত্তিতে উন্নত বৃহৎ জীবন নিয়ে বাঁচবো এই আমি চাই। শুধু অর্থ উপার্জনই জীবনের একান্ত কামনা নয়, শুধু স্বচ্ছন্দ-জীবিকানির্ব্বাহই আমার চরম লক্ষ্য নয়।

সবিতা স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—এ ত খুব ভাল বাবা! পুরুষমানুষের জীবনে এমনিতরই উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার প্রয়োজন। লক্ষ্য থাকবে যত উঁচু, যত বিস্তৃত,—জীবনও হবে তত উন্নত তত প্রসারিত।

তারক উৎসাহিত হইয়া কহিল—আপনাকে তো জানিয়েইচি মা, কত ছুংখে-কষ্টে, কত বাধায়, নিজে আত্মনির্ভর হয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হয়েচি। আমি বড় জেদী মা। যা' করবো বলে সংকল্প করি,—বিশ্রাম থাকেনা, আমার বে-পর্যাস্ত না তা' সিদ্ধ হয়।

সবিতা স্মিত মুখে তারকের যৌবনোচিত আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহদীপ্ত মুখখানির পানে তাকাইয়া অন্ত মনে কি ভাবিতে লাগিলেন।

তারক বলিতে লাগিল—আমার জীবনের সমস্ত কাহিনী একমাত্র আপনাকেই খুলে বলেচি মা। কি-জানি-কেন এক এক সময়ে মনে হয়,

জীবনে বুঝি কিছুই পাইনি, কিছুই পেলামনা। মনে হয় যদিই কোনওদিন লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করি, তা'তে কি আর লাভ হবে? যশেও যদি দেশদেশান্তর ভরে যায়, তাতেই বা কি? সম্মান—প্রতিপত্তির সবচেয়ে উচু চূড়াতে উঠলেও কি আমার আশৈশবের অতৃপ্ত তৃষ্ণা মিটেবে? চিরদিন যে-অভিমান যে-দুঃখ নিজের গোপন অন্তরের মধ্যেই একাকী বহন করলাম, বিধাতার কাছে পর্যন্ত জানালাম না অভিযোগ, সে-বেদনা কি কোনোদিন দূর হবে আমার এই অর্থ মান যশ বা কর্ম জীবনের চরিতার্থতা দিয়ে? সমস্ত প্রাণ যেন হা হা করে ওঠে, মুশ্ড়ে পড়ে বা' কিছু কর্মের উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা। মনে হয়েছে, অদৃষ্টদেবতা যে-মাতৃশব্দকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে শৈশবেই করেছেন মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, সে-বে কতো বড়ো দুর্ভাগ্য নিয়ে মাতৃবেরহাটে এসেচে, সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা করেনা।

জীবজগতে স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ দান মাতৃস্নেহ, সেই-স্নেহেই বে আজীবন বঞ্চিত, তার আর—বেদনার আবেগে তারকের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিল।

সবিতার চোখের কোণ সজল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিছুই বলিলেননা, সান্ত্বনাও দিলেননা। মুখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল গভীর সহানুভূতির ছায়া। যে-নিবিড় বেদনা তিনি নিঃশব্দে অতি সঙ্কোপনে অন্তরের নিভূতে একাকী বহন করিয়া আসিতেছেন সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, তাঁহার সেই বেদনাস্থানই তারক করিয়াছে আজ অজ্ঞাতে স্পর্শ। তারকের শেষের কথা কয়টি সবিতার সমগ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। নিঃশব্দে নতনয়নে তিনি নিজের অশান্ত হৃদয়াবেগ সংবত করিতে লাগিলেন।

সদর দরজার পিওন্ হাঁকিল চিঠি—

তারক বাহিরে গিয়া পত্র লইয়া আসিল।

সবিতার নামে চিঠি। সারদা লিখিয়াছে। সংবাদ দিয়াছে বিনলবাবুর সহিত রাজুর দেখা হইয়াছিল রাত্ৰায়। তাঁহার মুখে বিনলবাবু সংবাদ পাইয়াছেন,—দেশে কত্কা সহ ব্রজবাবু কুশলেই আছেন।

সবিতা পত্র পাঠ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রাজু বোধ হয় সারদার সাথে দেখা করতে আসেনা। আদবেই বা কি-করে, সে হয়তো জানেইনা সারদা হরিণপুরে আসেনি। তারক কথা কহিলনা।

সবিতা আবার বলিলেন—দেখি, আমিই না হয় তাকে একখানা চিঠি লিখে দিই। এক কাজ করোনা তারক, তুমি তাকে এখানে আসবার নিমন্ত্রণ করে চিঠি লেখো, আমিও তার সঙ্গে লিখে দেবো এখানে আসতে। এখানে সে এলে তোমাদের দুই বন্ধুর মান-অভিনানের মীমাংসা হয়ে যাবে।

তারক বলিল—বেশতো। আমি লিখে দিচ্ছি আজই।

সবিতা স্নেহ শ্লিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন,—রাজু আমার বড় অভিনানী ছেলে। কিন্তু তার অন্তরের তুলনা কোথাও দেখলামনা।

কথাটা সবিতা বলিলেন এমনি সহজ ভাবেই, কিন্তু তারকের চিত্তে ইহা অশ্রু অর্থে আঘাত করিল। তাহার মনে হইতে লাগিল নতুন-মা বোধ হয় তাহারই অন্তঃকরণের সহিত তুলনা করিয়া রাজুর সম্বন্ধে এই কথা বলিলেন। তাহার মুখ হইয়া উঠিল অন্ধকার, বাকা হইয়া গেল নিস্তব্ধ।

সবিতা তাহা লক্ষ্য না করিয়াই বিগলিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—রাজুর কথা যখন ভাবি তারক, তখন মনে হয়, আমার রাজু বেশি স্নেহের ধন না রেণু? রাজু আর রেণু ওদের ছুজনের মধ্যে কে-বেশি আর কে কম আমি ঠিক করে উঠতে পারিনে।

তারক বলিয়া উঠিল—নিজের অন্তর তা' হলে এখনও আপনি চেেনেননি মা। রেণুর সঙ্গে রাজুর কোনো তুলনাই হতে পারেনা।

সবিতা বলিলেন—কেন বলোতো?

—রাজ্যকে আপনি বতই আপন সন্তানের তুল্য ভাবুননা কেন, তবু সেটা আপন সন্তানের ‘তুল্য’ই থেকে যাবে। তুল্য বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ আপন সন্তান হয়ে উঠবেনা। উঠতে পারেওনা।

সবিতা বলিলেন—সকল ক্ষেত্রে সব ব্যাপার একরকম হয়না তারক।

—তা’ জানি মা। তবু বলি শুনুন। আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন, আপনার অন্তরের স্নেহাধিকারে রেণু আর রাজ্যের সমান দাবী যতই থাকনা, পার্থক্য যে কত বেশি, তা’ দেখিয়ে দিচ্ছি। ধরুন, আপনার এই হরিণপুরে আসা। রওনা হবার আগের রাত্রে শুনলাম, রাখাল আপনাকে নিষেধ করেছিল হরিণপুরে আসতে। আপনি নাকি বলেছিলেন,—ছেলে বড় হলে তার সম্মতি নেওয়া দরকার। তাই শুনে সে অসম্মতিই জানিয়েছিল, আপনি তা’ ঠেলে চলে এলেন আমার এখানে। কিন্তু মা, রেণু যদি আপনার এখানে আসায় এতটুকু অনিচ্ছার আভাস মাত্র জানাত, আপনি হরিণপুরে আসা তখনই বন্ধ করে দিতেন নিশ্চয়।

সবিতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—আনি জানতাম তারক, রাজ্য কেবলমাত্র অভিমান বশে রাগ করেই আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল। ওটা তার তর্ক বা জেদ্ মাত্র। সত্যি সত্যিই যদি আমাকে এখানে পাঠাবার তার অনিচ্ছা থাকত, তা’হলে আনি কখনই আসতে পারতামনা বাবা।

—কিন্তু ধরুন, রেণু যদি কেবলমাত্র জেদ কিংবা তর্ক করেই আপনাকে কোনওখানে যেতে নিষেধ করতো, আপনি তার সেই তর্ক ও জিদেরও খাতির না রেখে পারতেন কি মা ?

সবিতা মৌন হইয়া রহিলেন। বহুক্ষণবাদে ধীরে ধীরে বলিলেন—তুমি ঠিকই বলেচ তারক। মানুষ নিজের অন্তরকেই বোধহয় সবচেয়ে কম চেনে। তবে একটা কথা। রাজ্য আমার কাছে রেণুর বাড়ি না

হতে পারে, আমি কিন্তু রাজুর কাছে মায়ের বাড়ি। আমার দিক দিয়ে না হোক: রাজুর নিজের দিক দিয়ে কিন্তু ও আমার রেগুরও বাড়ি। এখানে আমার ভুল হয়নি।

তারক চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিয়া কহিল—বিমলবাবুর চিঠি তো কই এলোনা মা আজও।

সবিতা বলিলেন—তুমি কি তাঁকে সম্প্রতি চিঠি লিখেচ ?

—নিখেচি বৈকি ! আপনাকেও তিনি চিঠি দেননি বোধহয় আট দশ দিন হবে। তাই নয় কি ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি তাঁর আগের চিঠির জবাব এখনও পর্যন্ত দিইনি। সেই জন্যই বোধহয় আমাকে চিঠি লেখেননি। কারণ, তিনি যে কুশলে আছেন, সারদার পত্রে তো তা' জানতেই পাচ্ছি।

তারক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল—ঐ একটি মানুষ দেখলাম মা। বার পায়ের কাছে আপনিই মাথা নিচু হয়ে আসে।

সবিতা জবাব দিলেননা।

তারক আপনা আপনিই বলিতে লাগিল—কি মহৎ নন, উদার চরিত্র সুন্দর মানুষ। প্রকৃত কর্মবীর। জীবনে এমন সার্থককান পুরুষ অল্পই চোখে পড়ে।

সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—ও-কথা কি-হিসাবে বলচো তারক ? একমাত্র আর্থিক উন্নতি ভিন্ন সংসারে—উনি আর কোন্ চরিতার্থতা লাভ করেছেন ? কি-ই বা বড়ো আনন্দ সঞ্চয় করতে পেরেছেন সারা জীবনে ?

তারক উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিল—যে-পুরুষ নিজেরই সামর্থ্যে অমন বিপুল অর্থ অনায়াসে উপার্জন করতে পারেন, এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারেন, তাঁর জীবনে অল্প ছোটখাটো সার্থকতা কিছু ঘড়ক বা না-ঘটুক তা' নিয়ে আক্ষেপ নেই না। পুরুষমানুষের

কৰ্ম্মনয় জীবনের এই রকম বিরাট সার্থকতার চেয়ে আর অল্প কি কান্য থাকতে পারে বলুন ?

সবিতা হাসিলেন, জবাব দিলেননা। তারকের মুখে পুরুষনায়কের জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত তিনি অনেক বড় বড় কথা ও বৃহত্তর কল্পনাই শুনিয়ে আসিতেছিলেন। কিন্তু তাহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা সার্থকতার লক্ষ্য কোন্ পথে, তাহা সে কোনওদিন স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতে পারে নাই বা করে নাই। সবিতা তারকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপের ঈষৎ আভাস এইবার যেন দেখিতে পাইলেন। তাঁহার চিন্তাধারা কেমন এক অনির্দিষ্ট শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া গেল।

শিবুর না আসিয়া ডাকিল—মা, বেলা হয়ে যাচ্ছে, রান্না চড়াবেন চলুন।

তারক বলিল—অনেকদিনই তো মায়ের হাতের অমৃত প্রসাদ পেলাম। এইবার রাঁধুনীটাকে হাঁড়ি ধরতে অহুমতি দিন। এই দারুণ গরমে আগুন-তাতে আপনার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে—

সবিতা হাসিয়া বলিলেন—আগুন-তাতে রান্না করলে বাঙালী মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙেনা তারক, উন্নতি হয়।

—সে সাধারণ বাঙালী মেয়েদের হতে পারে মা, আপনি তাদের দলে ন'ন্ আমি জানি।

—তুমি কিছু জানোনা বাছা।

—মা মা, আমি শুনবোনা। কলকাতার বাসায় আপনার রাঁধুনী বামুন ছিল দেখেছি। এখানে কেন আপনি রাঁধুনীর হাতে খাবেননা বলুনতো? রাঁধুনীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হয়না এটা আপনার বাজে-ওজর। আমল কথা, নিজে পরিশ্রম করতে চান।

—তাইই যদি হয় তারক, তাতে আপত্তি কেন বাবা ?

অকৃত্রিম আন্তরিকতায় প্রবলবেগে নাথা নাড়িয়া তারক কহিল—না তা' হয়না। আমার রাজরাজেশ্বরী মাকে আমি প্রতিদিন রাঁধতে বাটনা বাটতে কাপড় কাচতে দিতে পারবোনা। এ সত্যিই আপনার কাজ নয় যে মা !

সবিতার চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। একান্ত অন্তমনস্কচিত্তে কি-বেন ভাবিতে লাগিলেন। কিছুই বলিলেননা।

তারক বলিল—আজ থেকে ঝি আর রাঁধুনী আপনার কাজ করবে, আমি বলে দিচ্ছি ওদের। আর আপনার এ-সব অত্যাচার চলবেনা কিন্তু।

সবিতা সঙ্করণ হানিয়া কহিলেন—তারক, আমার 'পরেই অত্যাচার হবে বাবা, যদি আমাকে এইটুকু কাজকর্মও করতে না দাও। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, রাঁধুনীর রান্না আর আমার গলা দিয়ে নামবেনা। দাসী চাকরের সেবা গায়ে আমার বিছুটির চাবুক মারবে। এ' জেনেও যদি তুমি আমার নিজের কাজের জন্য চাকর চাকরাণী বাহাল করতে চাও, আমি নিরুপায় !

তারক বিশ্বয়াভিভূত হইয়া কহিল—আপনি কি চিরদিনই এমনি ভাবে নিজের সমস্ত কাজ নিজেই করবেন মা ?

সবিতা কহিলেন—চিরদিন করবো কিনা জানিনে বাবা। তবে আজকে আমি পারছিনে সইতে দাস দাসীর সেবা, এইটুকু মাত্র বলতে পারি। ঈশ্বর যদি কখনও মুখ তুলে চান্, তোমারই কাছে আবার এক সন্ধ্য এসে পাটে পালঙ্কে বসে থেকে চাকর দাসীর সেবা নেব বাবা !

তারক সবিতার কথার রহস্তভেদ করিতে পারিলনা। দুঃখিত চিত্তে নির্বাক হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিল—মা, মানুষকে মানুষ 'ছোট' ভাবে কি করে, তাই ভাবি। আমি কিন্তু মানুষের পরিচয় একমাত্র মানুষ ছাড়া জাত গোত্র কুলশীল দিয়ে আলাদা করে ভাবতে

পারিলে। সেই জন্তু আনার কাছে মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব শাক্ত গনস্তুই সমান।

সবিতার বিষাদগম্ভীর মুখে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—আমি তা' জানি তারক। তোমার অন্তঃকরণ কতো যে উচু ও উদার, তোমার সাথে পরিচিত হবার পূর্বেই তা জেনেছি। তোমাকে আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করি বাবা।

তারক বিস্ময় ও কৌতূহলমিশ্র কণ্ঠে কহিল—আমাকে দেখার আগে থেকেই আমার পরিচয় জেনে ছিলেন মা? কই, এত দিন তো বলেননি!

সবিতা স্নেহে মুহূ হাসিলেন।

তারক কহিল—কিন্তু, যার কাছেই আমার কথা শুনে থাকুননা কেন, আমিযে বিশ্বাসের উপযুক্ত, তা' কি করে জানলেন বলুন তো?

নমতাকোমলকণ্ঠে সবিতা কহিলেন—কি-করে যে জানলাম তা' নাই বা শুনলে বাবা! তবে, জেনেছি বলেই তোমার স্নেহের আহ্বান রাখতে রাজুরও ননে ব্যথা দিয়ে এখানে এসেছি, এতে কোনও ভুল নেই।

তারক অভিভূত স্বরে কহিল—আমাকে এত স্নেহ এত বিশ্বাস করেন মা?

সবিতা গভীরকণ্ঠে বলিলেন—শুধু বিশ্বাস নয় বাবা, তারও চেয়ে বড় কথা, তোমার উপরে নির্ভর করার সাহস আমি পেয়েছি। তুমি তো জানো তারক, আমার ছেলে নেই। রাজু আমার ছেলের অভাব পূর্ণ করলেও এখনও কিছু অপূর্ণ আছে। তোমাকেই সে শূন্যতা পূর্ণ করতে হবে বাবা।

তারক বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে অভিভূতের মত চাহিয়া রহিল।

সারদাকে লইয়া রাখাল যখন ব্রজবাবুর শয্যাপার্শ্বে গিয়া পৌছিল, রোগের প্রবল প্রকোপ তখন কতকটা সামলাইয়া উঠিলেও তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া নাই। এই অসুস্থতায় ব্রজবাবু দেহের সহিত মনেও নিরতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাখালকে দেখিয়া তাঁহার নিম্নলিখিতেন্ত্র বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। স্বভাবতঃ কোমলচিত্ত রাখাল তাহার পিতৃতুল্য প্রিয় কাকাবাবুর অসহায় অবস্থা দেখিয়া চোখের জল সংবরণ করিতে পারিলনা।

ব্রজবাবু মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজু, তোমাকে আমি ডেকেচি।

বাপ্পাবরুদ্ধকণ্ঠ পরিস্কার করিয়া লইয়া কহিলেন—তোনার বোনটিকে দেখবার কেউ নেই বাবা। ওর জন্মেই তোমাকে ডাকা।

রাখাল কথা কহিলনা। ব্রজবাবু অতিশয় ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন—রাজু, এখানে এরা আমাকে ‘একঘরে’ করে রেখেচে। আমার গোবিন্দজী তাঁর নিজের ঘরে ঢুকতে পাননি, তাঁর নিজের বেদীতে উঠতে পাননি। রেণু আমার গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধে বলে সকলেরই আপত্তি।—আমি অবস্ৰমানে এখানে কেউ আমার রেণুর ভার নেবেনা। ওকে তুমি নিয়ে গিয়ে ওর বিমাতার কাছেই পৌছে দিও। হেমন্ত রাগ করবে জানি। কিন্তু আশ্রয় দেবে নিশ্চয়। এছাড়া আর তো কোনও উপায় খুঁজে পাচ্চিনি বাবা।

রাখাল চুপ করিয়াই রহিল। পিতৃহীনা, কপর্দকশূন্য অনুচ্চ রেণুকে

তাহার বিমাতা ও বিমাতার বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ভ্রাতা নিজেদের সংসারে গ্রহণ করিবেন কিনা সে-সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল। তথাপি মূগে কিছুই বলিলনা।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন—ওর বিয়েটা দিয়ে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত ননে গোবিন্দর পায়ে ঠাই নিতে পারতাম। অন্তিম সময়ে একান্তচিন্তে গোবিন্দকে স্মরণ করতেও বাধা পাচ্ছি রাজু। রেণুর জন্য হুশিয়ারি আমাদের শান্তিতে মরতে দিচ্ছেনা।

রাখাল কহিল—এখন ওসব কেন ভাবচেন কাকাবাবু? আপনার এমন কিছুই হয়নি, বার ভেঙ্গে রেণুকে এখনি হেমন্তমাসের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে! আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন, আমি নিজে এবার রেণুর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লাগছি।

ব্রজবাবু করুণ হাসিয়া কহিলেন—কিন্তু রেণু যে বিয়ে করবেনা বলে রাজু!

রাখাল বলিল—ছেলেমানুষ একটা কথা বলেচে বলেই কি সেইটেই চিরদিন মেনে চলতে হবে? তখন আপনার অতবড় সর্বনাশের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের ধাক্কায়ে সে ওকথা বলেছিল। কিন্তু, আজ আপনার এই অবস্থা দেখে তার বুঝতে কি দেরি হবে যে তার জীবনে অন্য আশ্রয় গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

ব্রজবাবু অত্যন্ত মলিন হাসিয়া কহিলেন—রাজু, রেণু তোমার নতুন-মার মেয়ে। সংসারে একমাত্র আমি আর ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেনা ওর নামের জেদ্ কেমন ছিল। তাকে নিজের সমস্ত জীবনটাই তছনছ করে বলি দিতে হয়েছে শুধু জেদেরই পায়ে। জেদ্ যদি তার চড়তো, তা' ভাঙার শক্তি অন্তলোকের তো ছিলই না, তার নিজেরও ছিলনা। রেণু সেই নামের মেয়ে।

রাখাল কহিল—কিন্তু, আমার মনে হয় কাকাবাবু, রেণু বোধহয় নতুন-নার মত অতো বেশি জেদী নয়।

—তুমি ওদের চেনোনা রাজু। মেয়ে তার মায়ের প্রকৃতি অবিকল পেয়েচে। যে-মাকে জ্ঞান হবার আগেই হারিয়েচে, তার স্বভাব প্রকৃতি অন্তঃকরণ কি করে যে ওর হোল, আমি ভেবে পাইনে। নতুন-বোয়ের মত তেজস্বিনী, সং প্রকৃতির ও সং চরিত্রের মেয়ে সংসারে অতি অল্পই হয়। এটা আমি যত ভালকরে জানি, এত আর কেউ জানেনা। সেই নতুন-বো—ব্রজবাবুর কণ্ঠ বাস্পাবরুদ্ধ হইয়া গেল। কণ্ঠ ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন—আমার ভাগ্য ছাড়া এ আর অষ্ট কিছুই নয় রাজু। তাকে আমি কিছুমাত্র দোষ দিইনে।

ব্রজবাবু এই সকল আলোচনায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া রাখাল পাখা লইয়া বাতাস দিতে দিতে কহিল—ও-সব কথা এখন থাকুক কাকাবাবু। আপনি আগে সেরে উঠুন, তারপর হবে।

ব্রজবাবু জীবনে কোনওদিন সবিতার কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করেন নাই। আজ তাঁহার সন্তানতুল্য রাজুর সহিত সেই বিষয় লইয়া তাঁহাকে আলোচনা করিতে দেখিয়া রাখাল অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রোগে মানুষকে এত দুর্বল করিয়া ফেলে যে তখন তাহার চিন্তায় পর্য্যন্ত সংঘম থাকেনা। বোধহয় ব্রজবাবুরও এখন আর আপন মনের গোপন গভীর চিন্তাগুলি একাকী বহন করিবার সামর্থ্য ছিলনা।

সারদা ঘরে আসিয়া ব্রজবাবুকে প্রণাম করিল। সচকিত্তে রাখালের পানে তাকাইয়া ব্রজবাবু কহিলেন—তোমার নতুন-মাও এসেছেন নাকি রাজু?

রাখাল বলিল—না। তিনি তো কলকাতায় নেই। বর্দ্ধমানে তারকের কাছে গেছেন। সারদা আপনার অমুখের খবর শুনে আসবার

জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে কাকাবাবু আমাকে জানেন, আমার সেবা গ্রহণ করতে তিনি আপত্তি করবেননা।

ব্রজবাবু ক্রান্তিভরে বালিশে মাথা এলাইয়া বলিলেন—কাকরই সেবা নেবার দরকার হবেনা রাজু, আনার রেগুমা যতক্ষণ আছে। তবে সারদা-না এসেছেন, ভালই করেছেন, আনার রেগুকে একটু উনি দেখাশুনা করতে পারবেন। ওকে যত্ন করবার কেউ নেই। সংসারের কাজ, ঠাকুরসেবা তার উপরে রোগীর সেবার চাপে দিনে রাতে একদণ্ড ওর ছুটি নেই।

রাখাল বলিল—নতুন-মাকে আপনার অসুখের খবর দেব কি কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন—না, না,—তোমরা কি পাগল হয়েছো? অমন কাজও কোরনা। আনার অসুখ যদি তিনি শোনেন, তারপরে তাঁকে আর কোন কিছুতেই কোথাও আটকে রাখা যাবেনা। সেই দণ্ডেই এখানে চলে আসবেন।

রাখাল কথা কহিলনা।

মাথায় রক্তের চাপ অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে ব্রজবাবুর বান অঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণহানির আশঙ্কা বর্তমান। গ্রামের ডাক্তার বলিতেছেন, এ রকম সঙ্কটাপন্ন রোগী নিজের হাতে রাখিতে তিনি ভরসা করেননা। উপযুক্ত ঔষধ পথ্য ইন্জেকশন প্রভৃতি গ্রামে পাওয়া যায়না। এমনকি রক্তের চাপ পরিমাপের উৎকৃষ্ট যন্ত্রেরও এখানে অভাব। কলিকাতায় লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু এখন এই অবস্থায় রোগীকে নাড়াচাড়া করা সম্ভবপর নয়। হার্ট অত্যন্ত দুর্বল, নাড়ীর গতি অতি দ্রুত। স্নতরাং, কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ কোনো চিকিৎসক লইয়া আসা সম্ভব হইলে সম্ভব তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

রাখাল বিপদে পড়িল। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার অনেকেরই নান তাহার জানা আছে, কিন্তু সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় কাহারও সাথে নাই। তা' ছাড়া এই রকম রোগীর জন্ম কাহাকে আনা সমীচীন হইবে সেও এক সমস্যা। উপরন্তু অর্থেরও একান্ত অভাব। তাহার নিজের বাহা কিছু যৎসামান্য পুঁজি ছিল রেণুর অসুখের সময় ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ব্রজবাবুর চিকিৎসার জন্ত এখন যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। অথচ তাহাদের কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। এ অবস্থায় নতুন-মাকে সংবাদ দেওয়া ছাড়া গতাত্তর কোথায়? এ সংবাদ পাইলে নতুন-মা না আসিয়া থাকিতে পারিবেননা নিশ্চিত। কিন্তু দেশের এই বাস্তবতাটার আর তাঁহার পদার্পণ করা কোনও দিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নয়। ইহার পরিণাম রোগীর পক্ষেও অশুভকর হইতে পারে। রাখাল দুর্ভাবনার আর কূলকিনারা পাইলনা। অথচ শীঘ্রই একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া ফেলা বিশেষ প্রয়োজন।... এমন সময়ে আসিল রাখালের কাছে বিনলবাবুর পত্র।

ব্রজবাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—আমার একান্ত অনুরোধ, ব্রজবাবুর জন্ত উপযুক্ত চিকিৎসক, নার্স, ঔষধ পথ্য ও অর্থ বাহ্যিকিছু প্রয়োজন, অতি অবশ্য আমাকে তার যোগে জানাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করিতে পারিব।

রাখাল পত্রখানি হাতে লইয়া চিন্তিত মুখে বসিয়াছিল। সারদা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও কার চিঠি দেবতা?

—বিনলবাবুর।

সারদা বলিল—কলিকাতা থেকে ডাক্তার আনবার জন্ত আপনি এত ভাবচেন দেবতা,—অথচ বিনলবাবুকে একটু লিখে দিলেই তিনি এখনি ভাল ডাক্তার পাঠাতে পারতেন।

রাখাল বলিল—হঁ।

সারদা বলিল—আমি বুকেচি আপনি সংশয়ে পড়েছেন। তাঁর সাহায্য নিতে আপনার বাধে।

রাখাল কথা কহিলনা।

সারদাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, আবার ধীরে ধীরে কহিল—
কাকাবাবুর অবস্থা যা' দাঁড়িয়েচে কখন কি ঘটে বলা কঠিন। যা করবেন শিগ্গিরই স্থির করে ফেলুন। নাহয় অন্য কিছু প্রয়োজন জানিয়ে নতুন-নাকেই লিখুন টাকার জ্ঞ।

রাখাল তথাপি চুপ করিয়াই রহিল।

সারদা কহিল—বদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা মনে করিয়ে দিই।

রাখাল সপ্রশ্ন-চোখে তাকাইল।

—তুচ্ছ মান-অপমান, উচিত-অনুচিতের ওজন হিসাব করে চলার চেয়ে এখন কাকাবাবুর প্রাণরক্ষার চেষ্টাটাই কি সবচেয়ে বেশি দরকারী নয়? আপনার নিজের কর্তব্যের দিক থেকে একটু ভেবে দেখবার চেষ্টা করুননা!

—কি করতে বলছ তুমি?

—এ অবস্থায় বিমলবাবুর কিংবা নতুনমার সাহায্য নেওয়া উচিত আমাদের। নতুন-মার সাহায্য নিতে রেণু কুণ্ডাবোধ করলে সেটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আপনার তো সে বাধা নেই।

—তুমি ঠিকই বলেচ সারদা। কাকাবাবুর এই জীবন-সঙ্কট অবস্থায় উচিত অনুচিতের প্রশ্ন অন্ততঃ আগার দিক দিয়ে ওঠা কখনই উচিত নয়। তা'হলে নতুন-মা আর বিমলবাবু দুজনকেই এখানকার সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দু'খানা চিঠি লিখে দিই।

—কিন্তু, মাকে জানাতে যে কাকাবাবু সেদিন বিশেষ করে আপনাকে নিষেধ করে দিয়েছেন।

—তাও ত' বটে। তা'হলে শুধু বিমলবাবুকেই—আচ্ছা—বিমলবাবুত' কাকাবাবুর পরিচিত? কাকাবাবুকে জানিয়েই ব্যবস্থা করা যাকনা—

—এটা মন্দ যুক্তি নয়। তবে রোগীর এ অবস্থায় তাঁকে এসব প্রস্তাবে বিচলিত করা হবেনা তো?

রাখাল অত্যন্ত কাতর ভাবে বলিল, তবে কি করবো সারদা? ঠুঁদের কিছু না জানিয়েই কি বিমলবাবুকে খবর দেবো?

একটু চিন্তা করিয়া সারদা বলিল, তাই করুন দেবতা।

গোবিন্দজীর ভোগ রাঁধিতেছিল রেণু।

সারদা দূরে বসিয়া তরকারি কুটিতে কুটিতে গল্প করিতেছিল। রেণু কাজ করিতে করিতে 'হাঁ' 'না' 'তারপর' এইরূপ সংক্ষিপ্ত ছ' একটি কথা কহিতেছিল।

সর্বদা এইরূপই ঘটে। রেণু থাকে প্রায় নির্বাক শ্রোতা, সারদা গ্রহণ করে বক্তার আসন। কত যে গল্প করে ঠিকঠিকানা নাই। হয়তো নিজের অজ্ঞাতসারেই সারদা সবচেয়ে বেশি গল্প করে তার দেবতার। নতুন-মায়ের গল্পও অনেক বলে, ভাড়াটিয়াদের গল্প তো আছেই। বলেনা কিছু রমণীবাবু সম্বন্ধে এবং নিজের অতীত সম্বন্ধে। রেণু কখনও কোন প্রশ্ন করেনা, বিন্দুমাত্র কোতূহল প্রকাশ করেনা কোনো বিষয়েই। টানা-টানা শান্ত চোখ দুটি মেলিয়া নীরবে গল্প শুনিয়া যায়। নিপুণ হাত দু'খানি ব্যাপৃত থাকে একটা-না-একটা প্রয়োজনীয় কাজে। বেশি কথা কোনোদিনই তার মুখে শোনা যায়না।

সারদা তরকারি কুটিতে কুটিতে বলিতেছিল, বিমলবাবুকে দেবতা আজ টেলিগ্রাম করতে গিয়েছেন, কলকাতা থেকে ভাল ডাক্তার নিয়ে এখানে আসবার জন্ত। বোধকরি কালকের মধ্যেই তিনি ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এসে পড়বেন।

রেণুর দৃষ্টিতে বিশ্বয় প্রকাশিত হইলেও মুখে কোনো প্রশ্ন নিঃসৃত হইলনা।

সারদা বলিতে লাগিল, বিমলবাবু এসে পড়লে অনেকটা ভরসা পাওয়া বাবে। উপযুক্ত চিকিৎসা ওষুধ, পথ্য সমস্তই ব্যবস্থা হবে। কাকাবাবু এইবারে শীঘ্রই স্নহ হয়ে উঠবেন।

রেণু এইবার জিজ্ঞাস্থনয়নে সারদার পানে তাকাইল।

সারদা তখন আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে,—অমন মানুষ কিন্তু সংসারে ছুটি দেখলামনা রেণু। যেমনি সদাশয়, তেমনি অমায়িক। শুনেচি তিনি কোটীপতি, লক্ষ লক্ষ টাকা খাটছে তাঁর দেশ বিদেশের ব্যবসায়, কিন্তু এমন নিরহঙ্কার সহজ-বিনয়ী মানুষ কোথাও দেখিনি এর আগে। যথার্থ বাকে শিবভূলা বলে। এমন না হলে বিধাতা এত ঐশ্বর্য্য দেবেনই বা কেন? কথায় বলে—মনের গুণে ধন। বিমলবাবুর ধনও যেমন, মনও তেমনি।

নির্বাক রেণু তখন গোবিন্দজীর ভোগ রন্ধন শেষ করিয়া পিতার পথ্য প্রস্তুত করিতেছে। মৌন থাকিলেও সে যে মনোযোগ সহকারেই সারদার মন্তব্যগুলি শুনিতোছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সারদার বাক্যশ্রোতে যেন উচ্ছ্বাস আসিয়াছে। সে বলিতে লাগিল বিমলবাবু সেদিন আমাদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন পথে দাঁড়ানর লজ্জা থেকে। সে-দুর্দিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার চোখে অন্ধকার

ঠেকে। যিনি বাড়ীশুদ্ধ লোকের আশ্রয়ই বলো, বলভরসাই বলো, যা কিছু সব, সেই মা আমাদের যখন নিরাশ্রয় হতে বসলেন, তখন আমাদের যে ভয় ভাবনা ও উৎকর্ষা ঘনিয়ে এসেছিল সে শুধু জানেন ঈশ্বর নিজে। বিশেষ করে আমার তো পায়ের নিচে থেকে পৃথিবী সরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। মা ছাড়া তখন আমার ইহজগতে অন্য আশ্রয় বা অবলম্বন কিছুই ছিলনা।

রেণু তেমনই বিস্মিত নয়নে সারদার পানে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল কেন ?

সারদা বলিল, তোমাকে তো সবই বলেচি ভাই। তুমি কি সে-সব কথা ভুলে গেছো ? আমার চরম দুর্দিনে মা আনাকে তাঁর স্নেহের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেইনা আমি আজ দাঁড়িয়ে আছি।

রেণু আত্মবিস্মৃত ভাবে বলিল,—তারপর ?

—তার পরের কাহিনীও তো তুমি শুনেচ ভাই আমার মুখে। আমার পুনর্জন্ম ঘটালেন মা আর এই দেবতা। মাঝে মাঝে এখন ভাবি রেণু, ভাগ্যে সেদিন মরে বাইনি !—

রেণু হাসিয়া কহিল, কেন সারদাদিদি, সেদিন মরে গেলেই বা আজ তোনার কিসের ক্ষতি হত ভাই ?

—অনেক ক্ষতি হত। সে যে কত বড় ক্ষতি, তুমি ছেলেমানুষ বৃত্তিতে পারবেনা বোন্ !

রেণু চুপ করিয়া আপনার কাজ করিতে লাগিল। সারদার তরকারি কোটা শেষ হইলে, বাকি আনাজগুলি ঝুড়িতে গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিল,—সংসারে বখার্ব খাঁটি জিনিষ কিছু পেতে হলে বড় করে তার দান দিতে হয়। দুর্লভের মূল্য অনেক। আমাদের জীবনেও এ নীতি মেনে চলতে হয়। নকল ও ভেজালের সমস্তা মানুষের মধ্যে এত বেশি বেড়ে

উঠেচে যে, এখন কোন্টা খাঁটি কোন্টা মেকি চেনা কঠিন। জীবনে যত বড়ো সঞ্চয় যে পেয়েছে বোন, তাকে ততো বেশি মূল্যও দিতে হয়েছে গভীর দুঃখের মধ্য দিয়ে। অন্ততঃ এটা ঠিক বুঝেছি যে, দুঃখের কষ্টপাথরে না পড়লে জীবনের বাচাই হয়না।

রেণু কোন দিনই কিছু বিশেষ করিয়া জানিবার জ্ঞান সারদাকে প্রদান করিতনা। আজ কিন্তু সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,— সারদাদিদি, তোমার নিজের জীবনে তো অনেক দুঃখই পেয়েচো ভাই, তাতে খাঁটি সামগ্রী কি কিছু সঞ্চয় করতে পেরেছো ?

সারদা চমকিয়া উঠিল। রেণু যে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারে সে সম্ভাবনা তাহার একবারও মনে হয় নাই। একটু বিব্রত হইয়াই বলিল,—কি করে বলবো দিদি ?

কেন ? যেমন করে এই সমস্ত কথা বলচ।

সারদা সহসা অনাবশ্যক গভীর হইয়া বলিল, সঞ্চয় কিছু করতে পেরেছি কিনা জানিনে, তবে সম্ভব যে যথেষ্ট পেয়েছি আর সে যে ষোলো আনাই খাঁটি তাতে আমার সংশয় নেই।

সরলমতি রেণু মমতায় বিগলিত হইয়া কহিল, সারদাদিদি, যে-স্বামী তোমাকে একলা অসহায় ফেলে রেখে পালিয়ে রইলেন, তাঁকে এখনও এত ভক্তি কর তুমি ?

সারদা জবাব দিলনা। মুখে তার বেদনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আনাজের ঝুড়ি ও বাঁটি লইয়া অন্ধ ঘরে রাখিতে উঠিয়া গেল।

রাখাল আসিয়া ডাকিল, রেণু—

—রাজুদা ?

কাকাবাবুর রান্নাটা হয়েছে কি বোন ?

হয়েচে। এইবার গিয়ে বাবাকে চান্ন করিয়ে দেবো।

কাকাবাবু ঘুমুচ্ছেন। তোর যদি রান্না সারা হয়ে থাকে তো একটু ওঘরে আয়না, গোটাকত কথা আছে।

এই যে, আমাদের ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছি ভাই, চলো।

অল্পক্ষণ পরে রেণু যখন হাত-পা ধুইয়া রাখালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, রাখাল ঘরের মেঝেয় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া রেণুকে বলিল, আয়, বোস্।

রেণু বসিল। বলিল, ডাক্তারবাবু আজ তোমার কাছে কি বলে গেছেন রাজুদা?

ভালই বলে গেছেন।

তবে কেন তুমি কলকাতায় টেলিগ্রাম করে এলে, বড় ডাক্তার নিয়ে আসার জন্ত?

তুই পাগল। গোড়া থেকেই তো শুনচিস্ এখানকার ডাক্তারবাবু বলচেন, একজন ভাল ডাক্তার আনিয়ে দেখানো দরকার। ঐ রোগের চিকিৎসা গাঁয়ের ডাক্তারের কর্ণ নয়। হ'ত ম্যালেরিয়া, পিলে, কি পালাজর, ওরা চতুর্ভূজ হয়ে চার হাতে করত চিকিৎসা। কাউকে ডাকতে দিতনা। কিন্তু ও কথা থাক্। তোকে ডাকলাম একটা দরকারি পরামর্শের জন্ত।

রেণু নীরবে রাখালের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল।

বার দুই গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিতে করিতে রাখাল বলিল, বলছিলুম কি, কাকাবাবু একটু সামলে উঠলেই তো এখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলতে হবে। আপাততঃ কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবু সম্পূর্ণ সেরে না ওঠা পর্যন্ত আগের মত একটা ছোট বাসা ভাড়া করে না হয় থাকা যাবে। কিন্তু তার পরে—

রাখাল বলিতে বলিতে চুপ করিল। তাহার কণ্ঠস্বর দ্বিধাজড়িত।

রেণু তেমনই জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

চিন্তিতমুখে রাখাল কহিল, তারপরে' যে কি ব্যবস্থা হতে পারে সেই কথাই ভাবচি। এখানে তো আর ফিরে আসা চলবেনা!

রেণু শান্তগলায় বলিল, কেন?

রাখাল বিস্মিত হইয়া কহিল, তাও কি বুঝতে পারিস্নি রেণু, এতদিন এখানে বাস করে? দেখছিস্ তো জ্ঞাতিদের আচার ব্যাভার! কাকা-বাবুর এতবড় অসুখ, একটা ঔকি মেরে খোঁজ নেয়না কেউ।

রেণু অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু তুমি তো জানো রাজুদা, কলকাতায় বারোনাশ থাকা আমাদের অবস্থায় কুলুবেনা। এখানে বাসাতাড়া লাগেনা, ঝিয়ের নাইনে মাত্র এক টাকা। আনাজ তরকারী কিনে খেতে হয়না। খরচ কত অল্প।

রাখাল বলিল, কিন্তু কাকাবাবুর যা' শরীরের অবস্থা, গুঁর উপর তো নির্ভর করা চলেনা বোন! একটু ভেবে দেখ্ গুঁর অবর্তমানে তোর আশ্রয় কোথায়? এখানে জ্ঞাতিরা তো তোদের সম্পর্কই ত্যাগ করেছেন। সংমা আগেই পৃথক্ হয়ে নিজের পিতৃকুলে সরে পড়েছেন। কলকাতায় ফিরে যে-কদিনই থাকা হোক, তার মধ্যে তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলে কাকাবাবু তখন আনার কাছে নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারবেন। তাঁর বা' সামান্য আয় আছে, আমার সঙ্গে একত্রে থাকলে স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছল ভাবেই চলে যাবে। কাকুর সাহায্য নিতে হবেনা আমি থাকতে।

রেণু চুপ করিয়া শুনিতেছিল। তাহার মৌনতায় উৎসাহিত হইয়া রাখাল বলিতে লাগিল, আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখেচি বোন, এ' ছাড়া অন্য সুব্যবস্থা আর কিছু হতে পারেনা। মেয়ের ভবিষ্যতের দুর্ভাবনাই কাকাবাবুকে সবচেয়ে বেশি বিব্রত করে তুলেছিল। তোমাকে সংপক্ষে

সম্প্রদান করতে পারলে তাঁর মনের গুরুতর দুঃশিষ্টা কেটে যাবে। তখন তিনি সহজেই সুস্থ হয়ে উঠবেন আশা হয়।

রেণু মৃদুকণ্ঠে বলিল, বাবাকে "ফেলে আমি কোথাও যেতে পারবোনা রাজুদা !

—কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই দিদি। তুমি যদি ছেলে হতে, ফেলে যাওয়ার কথাই উঠতনা। কিন্তু মেয়েদের যে আশ্রয় ছাড়া উপায় নেই।

—অল্পবয়সী বিধবা মেয়েরা তো সারাজীবন বাপের বাড়ী থাকে দেখেচি।

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া জবাব দিল, থাকে সত্যি, কিন্তু তাদের যদি পিতৃকুলে দাঁড়াবার মত আশ্রয় না থাকে কোনও সময়ে, তখন তারা স্বশুরকুলেই গিয়ে আশ্রয় নেয় এও দেখেচো নিশ্চয়। স্বামী না থাকলেও তাদের স্বশুরকুল তো থাকে !

রেণু নতমুখে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, রাজুদা, আমি বাবাকে নিজের মুখে জানিয়েচি, বিয়েতে আনার একটুও রুচি নেই। আমি বিয়ে করতে পারবনা।

রাজু হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোকে বুদ্ধিমতী ঠাওরাতাম, এখন দেখছি তুই একেবারে পাগল রেণু। আরে, সেদিন তুই ওকথা না বললে কাকাবাবু কি বেঁচে থাকতে পারতেন? হঠাৎ কারবার ফেল্ হয়ে সর্বস্ব গেল। বসত্ বাড়ীখানি শুদ্ধ নিলামে ওঠায় একেবারে পথে দাঁড়ালেন। সেই দুঃসময়ে তোর বিয়ে বন্ধ হওয়ার ছুতো নিয়ে ঝগড়া করে হেমন্তমানা তাঁর বোন আর ভাগ্নীর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আঠারো আনা বুঝে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন। পাছে কাকাবাবুর দেনার দারে তাঁদেরও পথে দাঁড়াতে হয় ! সংসার এমনিই স্বার্থপর বোন !

রাখাল একবার থামিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারপরে আবার বলিতে লাগিল, স্বামীর অত বড়ো দুঃসময়ে স্ত্রী নিজের ভাইয়ের সঙ্গে একজোট হয়ে আপনার আর্থিক ভালমন্দের দিকটাই কেবলমাত্র বিবেচনা করলে, স্বামীর পানে তাকালেওনা। তুই যদি সেদিন তাঁকে অমন করে ভরসা দিয়ে না বলতিস রেণু, ‘তোমাকে একা ফেলে রেখে আমি কখনো কোথাও যাবনা বাবা—’ তা’হলে কাকাবাবু সংসারে দাঁড়াতেন কাকে অবলম্বন করে?

রেণু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, কিন্তু রাজুদা, আমি তো বাবাকে সাঙ্গুনা বা সাহস দিতে ওকথা বলিনি। আমি যে সত্যি কথাই বলেছি।

রেণুর কথা বলার ভঙ্গীতে রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিলেও মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,—সত্যি কথা নয় তো কি তুই মিথ্যে কথা বলেছিস্ বলছি আমি? কিন্তু কি-জানিস্ বোন, সংসারে বেশির ভাগ সত্যই সাময়িক সত্য। চিরকালের সত্য বলে যদি কিছু থাকে তা’ সংসারের বাইরের বস্তু। তুমি সেদিনকার সেই মুখের কথাটিকে রক্ষা করবার জন্ত আজ যদি বন্ধপরিকর হয়ে ওঠো, জেনো, তার ফলে হয়তো তোমাদের জীবনে অকল্যাণই দেখা দেবে! বা’ কল্যাণ বহন করে আনে, তাকেই বলে সত্য। অশুভকর যা, তা’ সত্য নয়। সেদিন তোমার মুখের যে-কথাটি কাকাবাবুকে সবচেয়ে সাঙ্গুনা ও শান্তি দিয়েছিল,—আজ সেই কথাটিকেই রক্ষা করবার জন্ত তুমি যদি জিদ ধরে বোসো, তা’হলে জেনো সেই অবস্থিত ব্যাপারই কাকাবাবুর সবচেয়ে দুঃখ দুর্ভাবনার হেতু হবে। এমনকি হয়তো সেটা তাঁর মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। একটা কথা ভুলোনা রেণু, যে-উগ্রবিষ ধাতু ছাড়া রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে জীবনদান করে, সেই বিষ পান করেই আবার সুস্থ মানুষ আত্মহত্যা করে। স্থান কাল ও অবস্থা

অনুসারে একই ব্যবস্থা কোনও সময়ে যেমন মঙ্গলকর, আবার অত্র এক সময়ে তেমনি অমঙ্গলকরও। বড় হয়েচ, সব দিক্ সুস্পষ্ট করে ভেবে দেখ। বিশেষ প্রয়োজনে একবার একটা কথা বলেচো বলেই সেই মুখের কথাটাকেই জীবনের সকল মঙ্গলামঙ্গল প্রয়োজন অপ্রয়োজনের চেয়ে বড় করে তুলতে গিয়ে অকল্যাণ ডেকে এনোনা।

রেণু নতচক্ষে চুপ করিয়া রহিল।

কলিকাতার দুইজন খ্যাতনামা বিচক্ষণ চিকিৎসক ব্রজবাবুকে বিশেষ ভাবে পরীক্ষান্তে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। বিনলবাবু আরও কয়েকদিন তাঁহার নিকটে আছেন। ব্লাডপ্রেসার আর একটু কমিলেই ডাক্তারের নির্দেশমত ব্রজবাবুকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইবে।

মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি কোনও জায়গায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাস যুক্ত একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিবার জন্ত বিনলবাবু কলিকাতায় পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার কর্মচারীরা সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিবে।

কলিকাতার চিকিৎসকেরা আসিয়া রোগীর ব্যবস্থা করিয়া যাইবার পর হইতে ব্রজবাবু অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। সকলেরই মন বেশ উৎফুল্ল।

ব্রজবাবু বৈকালে উত্তরদিকের বারান্দায় একখানি ডেক্‌চেয়ারে শুইয়া ছিলেন। পাশের চৌকিতে বিনলবাবু খবরের কাগজ হাতে বসিয়া। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছিল জগৎবাপী ট্রেড্‌-ডিপ্রেসন্ বা ব্যবসায়ের দুর্বস্থা লইয়া।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রজবাবু বলিলেন,—আপনি যখন প্রথম আমার কাছে এসে আমার ব্যবসায় কিনে নেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল, সাধারণ বড়লোকদের মতই ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার শুধু মৌখিক আগ্রহ উৎসাহই আছে, স্বল্প ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও ভালমন্দ জ্ঞান—অর্থাৎ যাকে ব্যবসায়বুদ্ধি বলে, তা’ আপনার নেই। তারপরে যখন

আপনার অগ্ন্যাগ্নি সব প্রচুর লাভজনক বড় বড় ব্যবসায়ের বিবরণ শুনলাম, তখন আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি। আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এইজন্য যে, এতবড় ব্যবসায়ী লোক হয়েও আপনি ক্লী দেখে আমার ভরাডোবা ব্যবসা অত চড়াদামে কিনতে চাইছিলেন !

বিমলবাবু হাসিলেন।

ব্রজবাবু পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা বিমলবাবু, সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি বুঝতে পারেননি ও-ব্যবসা সে অবস্থায় কিনে নেওয়া দূরে থাক, যেচে সেধে হাতে তুলে দিলেও কেউ নিতে চাইতনা ওর দেনার পরিমাণ দেখে ! সে অবস্থায় ওর ভার নেওয়া নানে ইচ্ছে করে টাকাগুলো গঙ্গাগর্ভে ফেলে দেওয়া।

বিমলবাবু তেমনই মুছ মুছ হাসিতে লাগিলেন, এখারও কোনো জবাব দিলেননা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য্য মানুষ আপনি।

এবার বিমলবাবু কথ' কহিলেন। বলিলেন, আমার চেয়েও অনেক বেশি আশ্চর্য্য মানুষ আপনি।

—কিসে বলুনতো ?

—আপনি জেনেশুনেও অবিশ্বাসী ও প্রতারক আত্মীয়দের হাতে আপনার নিজহাতে গড়া বৃহৎ ব্যবসা তুলে দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন।

ম্লান হাসিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করা কি এতই অপরোধ বিমলবাবু ? বিশ্বাস আমি কোনও কারণেই হারাতে চাইনে।

—বার বার ক্ষতি স্বীকার ও দুঃখভোগ করেও কি বিশ্বাস বজায় রাখা সম্ভব ?

—তা' জানিনে, কিন্তু রাখা ভাল। অবিশ্বাসীর কোথাও আশ্রয় নেই. কোনও সাহায্য নেই।

—আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় এইই কি সত্য জেনেচেন ?

—হাঁ। আমি বিশ্বাস করে ঠিকিনি। বাইরে থেকে মানুষ আমাকে বার বার নির্দোষ বলেচে, কিন্তু আমি জানি আমি ভুল করিনি, তারাই ভুল করেছে।

বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ব্রজবাবুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

দূরদিগন্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, আমার সমস্ত কাহিনী একদিন বলবো আপনাকে। আপনি অতের মুখে কতদূর কি শুনেছেন তা' জানিনি, তবে আমার মুখে সেদিন যেটুকু শুনেছিলেন তা' কিন্তু সমস্ত নয়। নিজের কথা বলবার আগে আপনাকে আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।

—বলুন, কি জানতে চান ?

—আপনার যা' আর্থিক অবস্থা, তাতে আপনাকে লক্ষ্মীর বরপুত্র বলা যেতে পারে। আপনি সবল, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, ভাগ্যদেবী সকলদিক দিয়েই আপনার প্রতি প্রসন্না,—অথচ এত বয়স পর্য্যন্ত সংসারে প্রবেশ করেননি এর যথার্থ কারণটা জানতে পারি কি ? অবশ্য যদি বলতে আপনার বাধা না থাকে।

—বলতে কিছুমাত্র বাধা নেই। কারণটা নেহাৎ সোজা। প্রথমতঃ সময় ও সুযোগের অভাব, দ্বিতীয়তঃ, বিবাহে অনিচ্ছা।

প্রথমটা হয়তো একদিন সত্য ছিল, কিন্তু আজ তো আর তা' নয়। তখন ব্যবসায়ের উন্নতির চেষ্টায় দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সংসার পাতার ভাবনা ভাববার অবকাশ ছিলনা। কিন্তু তার পরে—

—বললুম তো এইমাত্র, রুচি হয়নি।

—রুচি অরুচির কথা উঠলে আর কোনো প্রশ্নই চলেনা বিমলবাবু। তবু

আমার আর একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিন। এখন কি সংসারী হবার কোনও বাধা আছে আপনার ?

ব্রজবাবুর প্রশ্নে বিমলবাবু বিস্ময় বোধ করিতেছিলেন যতখানি, তারও বেশি করিতেছিলেন কৌতুকবোধ। চাপা হাসিতে তাঁহার চোখ মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন, বাধা কোনওদিনই ছিলনা ব্রজবাবু, আজও নেই। হয়তো বা আমার বিবাহের পথ এত বেশি অবাধ বলেই স্বয়ং প্রজাপতি পথ আগলে বসে রইলেন। নববধূর আর শুভাগমন হোলোনা।

ব্রজবাবু বলিলেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলামনা।

—দেখুন, আমাদের দেশে একটা মেয়েলী প্রবাদ হয়তো শুনেছেন,

অতিবড় ঘরগী না পায় ঘর। }
অতিবড় সুন্দরী না পায় বর ॥ }

আমারও হয়েছে তাই। বিবাহের পাত্র হিসাবে নাকি আমি সকল-দিক দিয়েই উপযুক্ত, একথা অনেকেই বলেছেন, অন্ততঃ ঘটক সম্প্রদায় তো বলেনই। তবুও বার সারা যৌবনে বিয়ের ফুল ফুটলোনা, সেস্থলে প্রজাপতির বাধা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন ?

—কিন্তু এতদিন ফোটেনি বলেই যে কোনও দিনই ফুটবেনা এও তো নয়।

—সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে দাদা। অকালে কি আর ফুল ফোটে ? জোর করলে তার বিকৃতি ঘটানো হয় মাত্র। বিবাহ ব্যাপারটা অনেকটা মসৃণী ফুলের মতো। ঠিক নিজের ঋতুতে আপনি ফোটে। মরশুম চলে গেলে আর ফোটেনা, তখন সে দুর্লভ।

ব্রজবাবু একটু চিন্তা করিয়া হাসি মুখে বলিলেন, ভাল মালী চেষ্টা করলে অসময়েও ফুল ফোটাতে পারে। কিন্তু সে কথা থাক,

বিবাহটা যে ঠিক নয় শুধী ফুল, আমি মানতে পারলাম না। বিয়ের ফুল ফোটা বলে একটা কথা এদেশে আছে, কিন্তু কোনো দেশেই ওটা যে ফুলের চাষের নিয়ম মেনে চলে এমন প্রমাণ বোধহয় নেই।

বিললবাবু বলিলেন, না না, তা' নয়। আমি বলতে চাইছি, জীবনে বিবাহের একটা নির্দিষ্ট শুভ লগ্ন আছে। সে লগ্নটি উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আর বিবাহ হয় না। যারা তারপরেও বিবাহ করেন, সে ঠিক বিবাহ নয়।

—সেটা তা'হলে কি ?

—সেটা শুধু স্ত্রী-পুরুষের একত্র বসবাস মাত্র। কোনও ক্ষেত্রে বংশ রক্ষার প্রয়োজনে, কোনও ক্ষেত্রে সংসার যাত্রা নির্বাহের কিংবা সুখ সুবিধা ও আরামের প্রয়োজনে,—কোনও ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হৃদয়গনের বিলাসিতা চরিতার্থের জন্ত।

বিস্মিত কৌতূহলে ব্রজবাবু প্রশ্ন করিলেন ঐ সকল বাদ দিয়ে বিবাহকে আর অস্ত্র কি বস্তু বলতে চান আপনি ?

—সেটা ঠিক বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। সংসারে দেখা যায় সমাজ অনুমোদিত পুরুষ ও নারীর মিলনকে বিবাহ বলা হয়। কিন্তু আমি তা' মনে করিনা। মানুষের জীবনে এমন একটা বসন্তস্বপ্ন আসে, এমন একটা আনন্দকাল আসে, যে-পরমক্ষণে নর-নারীর ঈশ্বিত মিলন, দেহে মনে অপূর্ব রসে ও রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। ছুটি প্রাণের, ছুটি দেহমনের সেই যে রস-মধুর বর্ণরাগ—তাকেই বলি বিবাহ। স্বর্ধ্যাস্তের পর মুহূর্তেই, যখন সন্ধ্যা নয় অথচ দিন অবসান হয়েছে, সেই সুন্দর সন্ধ্যা, সেটুকুর আয়ু অতি অল্পমাত্র স্থায়ী। তাকে আমরা গোখলিষ্ণ বলা। সেই রমণীয় সময়টুকুর মধ্যে পশ্চিমের আকাশে জেগে ওঠে—অপরূপ আলোর নীলা আর অফুরন্ত রঙের বৈচিত্র্য যা' সমস্ত দিবা-রাত্রির দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোনক্রমে কোনো মুহূর্তেই

ধরা বায়না। সে ঐ বিশেষ ক্ষণটুকুরই সামগ্রী। মাছুষের জীবনে বিবাহও ঠিক তাই।

ব্রজবাবু মুছ হাসিয়া বলিলেন, বুঝেচি। কিন্তু আপনি যা' বললেন বিমলবাবু, তা' হয়তো আপনাদের কল্পনার কাব্যের পাতায় লেখে, বাস্তব জীবনের হিসাবের খাতায় লেখেনা।

—সেই জন্মই তো আমাদের বিবাহিত জীবনের পাতায় এত গরমিল্ জমে ওঠে, হিসাব মেলেনা কিছুতে—

অর্থাৎ আপনি বলছেন, বিবাহ ব্যাপারটা কাব্যের খাতার ছন্দের অন্তর্গত, হিসাব খাতার অঙ্কের অন্তর্গত নয় ?

সে কথা'র জবাব এড়াইয়া গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনিই বলুননা দাদা ! বিবাহের অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবনে একবারও ঘটেনি, কিন্তু আপনার ঘটেছে একাধিকবার। আপনি ও-বিষয়ে আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ।

—আমার কথা যদি মানেন তো বলি।

—বলুন।

—বিয়ে'র ফুল ফোটার দিন আজও আপনার অটুট আছে।

—তার মানে ? আপনি কি বলতে চান্ এই বয়সে—

বিমলবাবুর বাক্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আপনি সত্যিই হাসালেন কিন্তু বিমলবাবু।

—কেন বলুন তো ?

আপনার বিয়ের আর বয়স নেই, এরকম একটা অসম্ভব ধারণা কি করে হল ? তা'হলে আমরা তো—

—কিন্তু আপনার বেশি-বয়সে বিবাহের অভিজ্ঞতা যে একবারও স্মৃথের হয়নি এওতো সত্য ?

—আপনি ভাগ্য মানেন কি ?

—কতকটা নানি বৈকি। তবে অন্ধ অদৃষ্টবাদী নই।

—‘জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ’ এই তিনটে ব্যাপার যে সম্পূর্ণ ভাগ্যের পরে নির্ভর করে এটা স্বীকার করেন কি ?

—না। এযুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে জন্ম ও মৃত্যুকে সম্পূর্ণ না হলেও, কতকটা ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত করতে পেরেচে মানুষ। যদিও জন্ম-মৃত্যু ব্যাপারটা একেবারেই প্রকৃতির নিয়ম; জীবনাত্রেই প্রকৃতির নিয়মের অধীন। সুতরাং ও দু’টো বাদ দিয়ে বিবাহটাই ধরুন। ওটা সামাজিক সুবিধার জন্য মানুষের গড়া নিয়ম। কাজেই, ও ব্যাপারটায় অদৃষ্টের বিশেষ হাত নেই। মানুষের ইচ্ছাই এক্ষেত্রে প্রধান।

এ সকল যুক্তিতর্ক ব্রজবাবুর হয়তো ভাল লাগিতেছিলনা। সুতরাং তিনি এ আলোচনায় আর যোগ না দিয়া নীরবে চক্ষু মুদিয়া ডেক্‌চেয়ারে পড়িয়া রহিলেন।

বিমলবাবুও হস্তস্থিত সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া উঠিতেছিল, সংবাদপত্রের অক্ষরগুলি ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। বিমলবাবু দুই একবার মুখ তুলিয়া তাকাইলেন আলো জ্বালা হইয়াছে কিনা।

অর্দ্ধশায়িত ব্রজবাবু মুদ্রিত নয়নে কি ভাবিতেছিলেন কে জানে। হঠাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া ডান হাত বাড়াইয়া বিমলবাবুর একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, বিমলবাবু, তা’হলে আপনি সত্যি বিশ্বাস করেন বিবাহ নিয়তির অধীন নয়, মানুষেরই ইচ্ছার অন্নগত ?

বিমলবাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হাঁ, আগার নিজের বিশ্বাস তাই বটে। কিন্তু আপনি হঠাৎ এ নিয়ে এত চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন ব্রজবাবু ?

—বলছি। কিন্তু তার আগে আপনি কথা দিন আমার অমুরোধ রক্ষা করবেন। না—না, অমুরোধ নয়, প্রার্থনা, এ আমার ভিক্ষা।—ব্রজবাবু ব্যাকুল হইয়া বিমলবাবুর দুটি হাত চাপিয়া ধরিলেন।

অতি মাত্রায় বিপন্ন হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, আপনি একি বলছেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের মত। যে-আদেশ যখনি করবেন, পালন করব। এমন অমুচিত কথা উচ্চারণ করে আমাকে অপরাধী করবেননা।

—না না, কথাটা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন এ আমার অমুরোধ নয়, একান্ত প্রার্থনাই। বলুন, আমার মিনতি রাখবেন?—

—সাধের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই রাখব।—বিমলবাবু কথাটা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়াই বলিলেন।

অশ্রুপূর্ণলোচনে ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ আপনার মঙ্গল করবেন। আমার জন্ম-দুঃখিনী নেয়েটার তার আপনি নিন্ বিমলবাবু। ওকে আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিত হতে চাই।

বিমলবাবু স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই, ব্রজবিহারীবাবু তাঁহাকে বিবাহের পাত্ররূপে নিজ কন্যার জন্ত নির্বাচন করিতে পারেন। ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া বলিলেন, আপনি আগে একটু স্থস্থ হয়ে উঠুন ব্রজবাবু! ও'সব আলোচনা পরে হবে।

ব্রজবাবু সকাৎতরে বলিতে লাগিলেন, আপনি উদার প্রকৃতি, মন আপনার উন্নত। অল্প কারু কাছেই আমি ভরসা করে এ প্রস্তাব করতে পারতামনা। আমার জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী আপনি সমস্তই জানেন। দেবতার নিশ্চাল্যের নতই মেয়ে আমার নিষ্পাপ। তার গুণের মীনা নেই, রূপও নিতান্ত অবজ্ঞার নয়। অথচ এমন মেয়েরও ভাগ্যে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছিলেন। আপনি হয়তো জানেননা, রেগুর

বিবাহ হওয়াই এখন দুর্ঘট। আনার না আছে আজ অর্থবল, না আছে লোকবল, না আছে কুলের গোরব। ওর বিবাহের আশা ভরসাই আর নেই।

অতিশয় আশায় আগ্রহান্বিত হইয়া ব্রজবিহারীবাবু এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু বিমলবাবু নতমুখে নিরন্তর বসিয়া আছেন দেখিয়া অকস্মাৎ তিনি ভগ্নোৎসাহে চক্ষু মুদিয়া আরাম কেমারায় এলাইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণ পরে যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া নিরুপায়ের মত বলিলেন, গোবিন্দ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

সারদা বারান্দায় লষ্ঠন লইয়া আসিল।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, রাজু কি বাড়ী আছে ?

সারদা বলিল, না, একটু আগে ডাক্তারখানায় গিয়েছেন। এখুনি ফিরবেন। ব্রজবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল কাকাবাবু, আপনার কমলা লেবুর রস আনবো কি ?

ব্রজবাবু ইসারায় হাত নাড়িয়া মানা করিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন,—না কেন দাদা, আপনার কমলার রস খাওয়ার সময় হয়েছে যে, নিয়ে আসবে বৈকি। আনো সারদা-মা। ব্রজবাবু আর নিষেধ করিলেননা। মুদিত চক্ষে নির্জীব ভাবে পড়িয়া রহিলেন। লষ্ঠনের মূঢ় আলোকে বিমলবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন, অসুস্থ ব্রজবাবুর রক্ত-হীন মুখ মণ্ডল পাংশু বিবর্ণ। মুদ্রিত চক্ষুর দুই কোণে দুই বিন্দু অতি ক্ষুদ্র অশ্রু কণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাণাধিকা কন্ঠার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতখানি গভীর হতাশার গোপন বেদনায় ঐ পরম সহিষ্ণু নান্নুঘটির নেত্রকোণে আজ অশ্রু কণা নিঃসৃত হইয়াছে বিমলবাবুর বুঝিতে বাকি রহিলনা। নিরুপায়-বেদনায় ঠাঁহার

সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।
সাম্বনা দিবার উপায় বা ভাষা কিছুই খুঁজিয়া পাইলেননা।

গোবিন্দজীর আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রেণু নিজে
উপস্থিত থাকিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের সাহায্যে আরতি করাইতেছে। ব্রজবাবু
আরান কেদারায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। যতক্ষণ ঘণ্টা কাঁসর
নিশ্চর না হইল, ললাটে যুক্ত কর ঠেকাইয়া নতশিরে প্রণামরত রহিলেন।
ধূপ, ধূনা, চন্দনকাঠিচূর্ণ ও গুগ্গুলের ধূনমোরতে শীতল সন্ধ্যার মৃদুবায়ু
সুস্বাদিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁসর ঘণ্টা নিঃশব্দ হইলে তাহার পরও
ব্রজবাবু অনেকক্ষণ একই ভাবে উদ্ভিষ্ট ইষ্টদেবতাকে মনে মনে বন্দনা করিয়া
পরে চেয়ারের উপর আবার লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

রেণু আসিয়া তাঁহাকে গোবিন্দের চরণামৃত ও কমলার রস পান
করাইল। একটু পরে রাখাল আসিয়া বিমলবাবুর সাহায্যে ব্রজবাবুকে
ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। দুইজন নাহুষের কাঁধে দুই হাতে অপটু শরীরের
ভার রাখিয়া অতি কষ্টে ব্রজবাবু অল্প হাঁটিতে পারেন। এখনও সমস্ত অঙ্গে
স্বাভাবিক জোর ফিরিয়া পান নাই।

আহারাদির পর রাত্রে বিমলবাবু কোনও এক সময়ে ব্রজবাবুর শয্যা-
পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ব্রজবাবুর রোগশীর্ণ শিথিল হাতখানি নিজ
মুঠায় তুলিয়া লইয়া বিমলবাবু চুপিচুপি কহিলেন, আপনি সন্ধ্যা বেলায়
বে প্রস্তাব আমাকে জানিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখতে চাই।
আপনার কাল আমি জানাবো।

ব্রজবাবু মাথা হেলাইয়া ইসারায় সায় দিলেন।

বিমলবাবু উঠিয়া গেলে ছায়াচ্ছন্ন নির্জন কক্ষে শয্যাশায়ী ব্রজবাবু
অশ্রুটস্বরে বারংবার তাঁহার ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নাম উচ্চারণ
করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু যখন ব্রজবাবুর নিকটে আসিয়া বসিলেন ব্রজবাবু লক্ষ্য করিলেন একটি পরিতৃপ্ত আনন্দের স্নিগ্ধ-দীপ্তি বিমলবাবুর মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। 'সেই উজ্জ্বল মুখের পানে তাকাইয়া ব্রজবাবু মনে-মনে হয়তো অনেকটাই আশাঘ্রিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু ভরসা করিয়া প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিলেননা।

কহিলেন, খবরের কাগজ এসেছে। রাজু পড়ে শোনাতে চাইছিল, নিবেদন করলাম। কী হবে পৃথিবীশুদ্ধ লোকের দৈনিক বিবরণ শুনে। তার চেয়ে কোনো সদগ্রন্থ শ্রবণে মনেরও শান্তি পরকালেও কল্যাণ।

বিমলবাবু হাসিলেন। বলিলেন, কোন্ বই শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে বলুন, পড়ে শোনাই।

—চৈতন্যচরিতামৃত পড়বেন?

বিমলবাবু বলিলেন—বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে ঐ একখানা আশ্চর্য্য পুঁথি।

—পড়েছেন আপনি? ব্রজবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

—অল্পসল্প নেড়েছি মাত্র। পড়া হয়েছে ঠিক বলা চলেনা।

—সে তো নয়ই। চৈতন্যচরিতামৃত যে-মালুম পাঠ করতে পেরেছে অর্থাৎ ওর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে সে তো গোবিন্দ-পাদপদ্মে পৌছে গিয়েছে।

বিমলবাবু বলিলেন, 'চৈতন্য-চরিতামৃত' এখানে আছে কি?

—হাঁ আছে। রেণুকে আমি ভাগবত আর চরিতামৃত সঙ্গে আনতে বলেছিলাম। রেণু নিজেও ঐ পুঁথিখানি পড়তে খুব ভালবাসে কিনা!

—তাই নাকি? মেয়েকেও তা'হলে আপনি ভাগবৎ প্রেমায়তনের আশ্বাদন দান করছেন বলুন?—

জিত্ কাটিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, ছি ছি এমন কথা মুখে আনতে নেই। , ওতে আমার অপরাধ হবে। গোবিন্দ-প্রেমের আশ্বাদ মৈকি মানুষ মানুষকে দিতে পারে বিমলবাবু? জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, মেধা সবই সেখানে ভুচ্ছ অর্থহীন। কেবল তিনি নিজে যাকে কৃপা করেন সেই ভাগ্যবানই সংসারে তাঁর প্রেমের দূর্লভ আশ্বাদন লাভে ধন্ত হয়।

বিমলবাবু নীরব রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন—এই যে কাল সন্ধ্যার ত্রৈকান্তিক আকাজক্ষায় আপনার কাছে এক প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, আজ সকালে আর তো তার জন্ত এতটুকুও আগ্রহ অনুভব করচিনে। এ কি গোবিন্দেরই করুণা নয়? নিরুদ্বেগ সরল হাসিতে ব্রজবাবুর মুখখানি কোমল হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, আগি কাল রাত্রে চিন্তা করে ও-বিষয়ে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি।

ব্রজবাবুর রোগ-পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তির আনন্দ-রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আনি জানি, তোমাকে উপলক্ষ্য করে গোবিন্দ আমার ভারমুক্ত করবেন।

বিমলবাবু বলিলেন, কি করে টের পেলেন বলুন তো?—কথা কয়টি স্নিগ্ধ কোঁতুকে সমুজ্জল।

ব্রজবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, গোবিন্দই যে তাঁর অধম সেবকের সকল ভাবনা নিরাকরণ করেন। তোমাকে পাঠিয়েছেন তিনি আমার কাছে সেইজন্তই। ব্রজবাবুর মুখে অপরিসীম বিশ্বাস ও ভক্তির পবিত্র আভা।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সংসারের বহুবিধ দুঃখে নিপীড়িত এই রোগাতুর বৃদ্ধের সরল চিন্তের পরিতৃপ্তির প্রফুল্লতাটুকু নষ্ট করিয়া দিতে তাঁহার মন সরিতেছিলনা, অথচ কথাটা এখানে না বলিলেও নয়। বৃদ্ধের ভ্রান্ত ধারণা সত্ত্বে দূর করিতে না পারিলে জটিলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

বিমলবাবু বলিলেন, আমি কাল বিশেষ ভাবে চিন্তা করে দেখেছি—আপনার প্রস্তাব সম্বন্ধে। সকলদিক বিবেচনা করে রেণুকে গ্রহণ করাই স্থির করেছি। কিন্তু, এ সম্বন্ধে একটু কথা আছে। আপনি প্রতিশ্রুতি দিন, 'আমি যা' চাইব, আপনি দেবেন।

ব্রজবাবু বিমূঢ় নেত্রে বিমলবাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রুত কণ্ঠে কহিলেন, বলুন—

বিমলবাবু বলিলেন, আপনি আমাকে আপনার কত্যা দান করতে চেয়েছেন। আমি তাকে স্বৈচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণই করতে চাই। যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ করে ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ ও আইনতঃ পত্নীরূপে গ্রহণ করলে সে আমার গোত্র ও উপাধি নিয়ে আমাদেরই বংশের অন্তর্ভুক্ত হত। আমার সম্পত্তিতে তার অধিকার বর্ত্তাত, আমার মরণে তাকে অশৌচ স্পর্শ করত। আমি যাগযজ্ঞ মন্ত্রোচ্চারণ করেই ধর্ম্মতঃ সমাজতঃ ও আইনতঃ তাকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করতে চাই। তাতেও সে আমার বংশে ও গোত্রে অধিকার পাবে। আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়ে আমার মরণে অশৌচ পালন করবে।

ব্রজবাবু নির্ব্বোধ চাহনিতে বিমলবাবুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, কথা কহিতে পারিলেননা।

বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, রেণু আপনার কতো স্নেহের সামগ্রী আমি জানি। আমারও সে কম স্নেহের নয়। ওকে সন্তানরূপেই গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত হয়েছি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলবাবু বলিলেন,—বিবাহযোগ্য সংপাত্র কেউ আমার বংশে থাকলে, তাকে আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে রেগুকে আমি পুত্রবধূরূপে নিয়ে যেতাম। কিন্তু সেরকম আপনজন কেউ নেই আমার। দূরসম্পর্কে বারা আছে, তারা আমার রেগুনার উপযুক্ত পাত্র নয়। কাজে কাজেই আমি স্থির করেছি সোজাসুজি ওকে আমার দত্তক-কন্যারূপে গ্রহণ করবো। রেগুনাকে উপযুক্ত সংপাত্রে দান করার ভার এবং ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবনার দায়িত্ব সমস্ত আমি তুলে নিলাম,—আপনার আর নয়।

ব্রজবাবু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। জবাব দিলেননা। তাঁহার মুখমণ্ডলে ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোনও রেখাই ফুটিয়া উঠিলনা। যেমন নির্ঝাঁক ছিলেন তেমনই রহিলেন।

ছপুরবেলায় রাখাল বিমলবাবুকে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অতিশয় গম্ভীর মুখে বলিল, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে।

বিমলবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইলে রাখাল বুকপকেট হইতে ডাকঘরের মোহরাক্ষিত একখানি পোষ্ট্‌কার্ড বাহির করিয়া বলিল—পড়ে দেখুন।

বিমলবাবু কার্ডখানি হাতে লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া নান সহি লক্ষ্য করিলেন—‘নঙ্গলাকাজী শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র।’ বলিলেন, ইনি কে রাজু? টিনতে পারলাননা তো।

—কাকাবাবুর এ-পক্ষের শ্যালক। আনাদের শকুনী-মানা। নাম শোনেননি কি?

—ওঃ, ইনিই ব্রজবাবুর কারবারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন না?

—হাঁ। শুধু কারবারের কেন, বিষয়-আশয়ের, ঘর-সংসারের,

স্বী-কৃত্যার সব ভারই তিনি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়ে কাকাবাবুকে নির্বাক্ষাটে গোবিন্দজীর পায়ে সমর্পণ করেছিলেন।

নিঃশব্দে নতনয়নে পোষ্টকার্ডখানি পাঠ করিয়া বিমলবাবু চক্ষু তুলিয়া রাখালের মুখের পানে তাকাইলেন।

রাখাল বলিল, বলুন দেখি, এ চিঠি এখন কাকাবাবুর হাতে দেওয়া উচিত কিনা ?

বিমলবাবু নিরুত্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাখাল পুনশ্চ কহিল, কাকাবাবুর কাছে এ' সংবাদ গোপন রাখাও তো আমাদের পক্ষে অলুচিত হবে।

বিমলবাবু বলিলেন, তা' তো হবেই।

তারপর একমুহূর্ত চিন্তা করিয়া কহিলেন, এ' চিঠি গুর হাতে দিয়ে কাজ নেই, পড়ে শোনালেই চলবে। কারণ, চিঠির কতকটা অংশে অনাবশ্যক কটু কথা আছে। ওঁকে সেটা না শোনালেই ভাল হয়।

—নিশ্চয়। কোন্ অংশ বাদ দিয়ে কতটুকু ওঁকে শোনানো যেতে পারে বলুন তো ?

—এই যে লিখেছেন, “যে কলঙ্কিত বংশে রাণী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কলুষের লজ্জা তো তাহাকে চিরদিন বহন করিতে হইবেই জানি। আমার আশঙ্কা হয়, আপনাদের অপরাধ ও মহাপাপের শাস্তি শেষ পর্য্যন্ত আমার নিরপরাধা ভাগিনেয়ীকে স্পর্শ না করে। সেই জন্তই তাহাকে যথাসম্ভব সত্বর সংপাত্রস্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনাকে সংবাদ দিবার প্রবৃত্তি ছিলনা, কিন্তু লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ—” ইত্যাদি। এসব অংশ ওঁকে শোনাবার দরকার নেই।

রাখাল কহিল—রাণীবিবাহ স্থির হয়ে গেল তার পিতার ইচ্ছা-

অনিচ্ছা সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা না করেই। আশ্চর্য্য। সংসারে এমন দেখেছেন কি বিনলবাবু?

বিনলবাবু একটু হাসিলেন মাত্র।

রাখাল আবার পড়িতে লাগিল—“অত্ৰ নিক্সিয়ে শুভ গাত্রহরিদ্রা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আগামী কল্য গোথূলি-লগ্নে শুভ বিবাহ।”—ব্যস্ এইটুকু মাত্র লিখেচে। কোথায় বিবাহ হচ্ছে, পাত্র কেমন, কোনও সংবাদই দেয়নি। আক্কেল-বিবেচনা দেখলেন?

বিনলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, বড় মেয়ে অবিবাহিতা রইল, অথচ ছোটমেয়ের ঘটাকরে বিয়ে।

বিনলবাবু শান্তকণ্ঠে কহিলেন, সংসারের এই-ই নিয়ম রাজু। কোনো কিছুই কাকুর জন্ত অপেক্ষা করে থাকেনা।

—কাকাবাবু ওদের সর্ব্বস্ব দিয়ে আজ কপর্দকশূন্ত বলেই এতটা বেশি বাড়াবাড়ি সম্ভব হল, নইলে হতে পারতেনা।

উদাস কণ্ঠে বিনলবাবু বলিলেন—এটাও হয়ত’ সংসারেরই সহজ নিয়ম।

পত্রখানা পাওয়া অবধি রাখালের অন্তরের মধ্যে জ্বালা করিতেছিল। তিস্তকণ্ঠে কহিল, সংসারের নিয়ম বলে সবকিছুই সহ্য করা যায়না বিনলবাবু।

বিনলবাবু হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু সহ্য না করেও তো উপায় নেই রাজু।

শীতের সন্ধ্যা। কলিকাতায় সরু গলির মধ্যে একখানি একতলা বাড়ীর ছুয়ার-ভেজানো ঘরে রেণু হারিকেন লণ্ঠনের সামনে বসিয়া পশমের ছোট টুপি বুনিতেছিল। ছুয়ারের বাহির হইতে সারদার অমুচ্চকণ্ঠ শোনা গেল—দিদি—

রেণু সাড়া দিল, এসো—

সারদা দরজা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার পিছনে প্রকাণ্ড ধামা লইয়া দাসী।

রেণু তাহাকে দেখিয়া সারদার দিকে চাহিতেই সারদা বলিল, গোবিন্দজীর জন্ত মা কিছু ফলমূল তরীতরকারী আর ভাল মাখন পাঠালেন।

রেণুর চোখের দৃষ্টি প্রথর হইয়া উঠিল। অল্পক্ষণ স্তব্ধ রহিয়া ধীরকণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, ও তো আমরা নিতে পারবোনা।

সারদা কুণ্ঠিত কণ্ঠে কৈফিয়তের সুরে কহিল, সেকি দিদি, এ' তো তোমাদের জন্ত নয়। এ যে গোবিন্দজীর—

রেণু সারদার কথা শেষ হইতে না দিয়া শাস্ত গলায় কহিল, গোবিন্দজীকে উপলক্ষ্য করে মা এসব আমাদেরই পাঠিয়েচেন। এ তুমিও জানো আমিও জানি সারদাদিদি—কিন্তু এ নেওয়ার উপায় নেই। মাকে বোলো—তিনি যেন আমাদের ক্ষমা করেন।

শাস্তকণ্ঠের এই সহজ কথা কয়টির পিছনে কতখানি স্নানিশ্চিত অটলতা আছে তাহা সারদার বুকিতে ভুল হইলনা। দাসীকে ইঙ্গিতে

ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সারদা রেণুর কাছে আসিয়া বসিল।
জিজ্ঞাসা করিল,—কাকাবাবু ভাল আছেন তো ?

হাতের পশমের কাজটা শেষ করিতে করিতে রেণু জবাব দিল,—হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কহিবার মত
কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া সারদা মনে মনে সঙ্কোচ ও
অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। তাই উঠি-উঠি ভাবিতেছে এমন সময়ে
রেণুই কথা কহিল।

উলের টুপি বুনিতে বুনিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, সারদাদিদি, মাকে বুঝিয়ে
বোলো তিনি যেন মনে কষ্ট না পান। আনার জন্ম তাঁকে মনের মধ্যে
ছুঃখ দুর্ভাবনা রাখতে মানা কোরো। যা' হবার নয় তা' যে হয়না তিনি
আমার চেয়ে ভালই জানেন। ছুঃখমোচনের চেষ্টায় উভয় পক্ষেরই ছুঃখের
বোঝা ভারি হয়ে উঠবে নাত্র।

সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল ঐ কৰ্ম্মনিবিষ্টা
নতনেত্রা মেয়েটি তার অত্যন্ত নিকটে বসিয়া থাকিয়াও অতিশয় সূদূর
হইতে শান্ত কথা কয়টি যেন বলিয়া পাঠাইল।

আরও কতক্ষণ সময় কাটিয়া গেলে সারদা একটু ইতস্ততঃ করিয়া
কহিল—আমি তা'হলে আজ যাই ভাই।

মাথা হেলাইয়া ইসারায় রেণু সম্মতি জানাইল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সারদা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রেণু একই ভাবে অথও মনোযোগের সহিত উলের ক্ষুদ্র টুপিটি
ক্ষিপ্ৰহস্তে বুনিতে লাগিল। রাত্রের মধ্যেই এটি শেষ করিয়া ফেলিয়া
একজোড়া ছোট মোজা ধরিতে হইবে।

প্রায় সাত আটনাস হইল ব্রজবাবু গ্রামের বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায়

আসিয়া বাস করিতেছেন। বিমলবাবুর ভাড়া-করা ভাল বাসায় রেণু কিছুতেই বাইতে চাহে নাই। ব্রজবাবু অনেকটা স্ন্যহ হইয়া ওঠাতে রেণু জেদ করিয়া অল্প ভাড়ায় ছোট একটি একতলা বাসায় আসিয়াছে। পিতার অসুখে অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে বলিয়া বরাবর অন্তের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে সে অসম্মত। এই নীরবপ্রকৃতি স্ত্রীলা মেয়েটির সম্মতি অসম্মতি যে কত সূদৃঢ় ও দুর্লভ্য এই ঘটনার পর তাহা সকলেই বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে।

রেণু অল্প মাহিনায় একটি ঠিকান্নি রাখিয়াছে। সংসারের কাজকর্ম ও দেবসেবার অবকাশে সে নিজে ছোট শিশুদের জন্ম জাঙ্গিয়া, পেনি, ফ্রুক্, প্রভৃতি সেলাই করে। উলের মোজা, টুপি, সোয়েটার, বোনে। আচার জেলি ও বড়ি তৈয়ারি করিয়া ঠিকান্নির সাহায্যে দোকানে বিক্রয়ের জন্ম পাঠাইয়া দেয়।

খেলা ছাদের উপরে করোগেট টিনের ছাদযুক্ত একটি সিঁড়ির ঘর আছে। সেই ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুরঘর করা হইয়াছে। ব্রজবাবু স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত সর্বক্ষণ এই পূজার ঘরেই যাপন করেন। সংসার কি করিয়া চলিতেছে, কোথা হইতে খরচ আসিতেছে সংবাদ জানিতে চাননা। জানিতে ভয় পান। রেণু ছাড়া আর কাহারও সহিত বড় কথাবার্তা বা দেখাসাক্ষাৎও করেন না।

সারদা আশঙ্কা করিয়াছিল দ্রব্যসামগ্রী ফেরৎ আসায় সবিতার অত্যন্ত আঘাত লাগিবে। তাই বাড়ী পৌছিয়া দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণ ধামাটি নিঃশব্দে একতলায় ভাঁড়ার ঘরে তুলিয়া রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

সবিতা নিজের ঘরে বসিয়া পঞ্জিকার পাতা উল্টাইতেছিলেন। সারদাকে দেখিয়া সপ্রশ্ন-চোখে তাকাইলেন।

ঘরের মেঝেতে সবিতার নিকটে বসিয়া পড়িয়া সারদা বলিল,
কাঁকাবাবু ভাল আছেন না।

—রেণু?

—রেণুও ভাল আছে।

সবিতা আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া পঞ্জিকার পাতে পুনরায় মনঃ-
সংযোগ করিলেন।

সারদা বিস্মিত হইল। অন্তর্দিন রেণুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ী
ফিরিলে দেখিতে পায় সবিতা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় তাহার পথ চাহিয়া
আছেন। তারপরে কতই না সতৃষ্ণ আগ্রহে একটির পর একটি প্রশ্ন
করিয়া সনস্ত কথা খুঁটিয়া খুঁটিয়া জানিতে চাহেন। রেণু কি করিতেছিল,
কি কি কথা কহিল, তাহার চুল বাঁধা হইয়াছিল কিনা, কাপড় কাচা
হইয়াছিল কিনা, রেণু আগের চেয়ে বোকা হইয়া গিয়াছে না তেননই
আছে, ইত্যাদি। ব্রজবাবু অপেক্ষা রেণুর সম্বন্ধেই সবিতা অনেক কিছু
বেশি জানিতে চাহেন ইহাও সারদা লক্ষ্য করিয়াছে।

কতক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া গেল। সারদা 'আপনা আপনিই বলিতে
লাগিল, 'ওদের অভাব এমন কিছু বেশি নয় না, যার জন্য আপনি এত
বেশি ভাবচেন। ছুটি নাত্র প্রাণী। খরচই বা কি, কাজই বা কি!
ইচ্ছে করেই তাই রেণু রাঁধুনী রাখেনি। সংসারে অনটন তো কিছু
দেখলান না।

'সবিতা' পঞ্জিকার একটি পাতার কোণ মুড়িয়া চিহ্ন রাখিয়া
বইখানি বন্ধ করিলেন। সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া
মুহূর্ত্তান্ত্রে বলিলেন, তা' বেন ওদের না-ই রইলো! কিন্তু তুমি জিনিষের
ধামাটা কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে সারদা?

সারদা থতনত থাইয়া গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্নমাত্র নাই। বরং ঠোঁটের প্রান্তে চাপা হাসির রেখা।

সবিতা বলিলেন, 'তুমি বুঝি এই ভেবে ভয় পেয়েছ সারদা যে, জিনিষ ফেরৎ এসেছে শুনে তোমাদের মা ছুঁখে ফোঁভে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন, নয় ?

সারদা লজ্জিত হইয়া বলিল, না, তা ঠিক ভাবিনি। তবে—হয়তো মনে খুবই আঘাত পাবেন ভয় হয়েছিল।

সবিতা সম্মুখে সারদার পিঠে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বোকা নেয়ে, তোমার মতন করে মায়ের হৃদয়টার দিকেই কেবলমাত্র তাকিয়ে মাকে ভালবাসতে সবাই কি শিখেচে ? এ নিয়ে রেগুর উপরে তো রাগ করতে পারিনে মা, তার দোষ নেই কিছু।

সে কথা আর আপনাকে বলতে হবেনা। রেগু যে আপনারই মেয়ে আজ যেন তা' সব চেয়ে স্পষ্ট করে দেখে এলাম না।

সবিতা সেকথা এড়াইয়া গিয়া সহজস্বরে কহিলেন, কি বলে তোমায় ফেরালে সে আজ ?

সারদা আত্মপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইয়া শেষে বলিল, আচ্ছা না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি ফেরৎ আসবে জেনেই জিনিষ পাঠিয়েছিলেন ?

সবিতা মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, না। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা, ঠিক করে বলো তো মা, সত্যিই কি ওদের কোনো অভাব অনটন নেই দেখে এলে ?

ভিতরের কথা কি করে জানবো মা ?

দেখে কী মনে হ'ল ?

সারদা নতশিরে নিরন্তর রহিল।

সবিতা আর প্রশ্ন করিলেন না। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে চিন্তার কালো ছায়া বনাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ বাদে সবিতা প্রশ্ন করিলেন, আজ যখন তুমি গেলে, সে তখন কি করছিল?

উলের টুপি বুনছিল।

সবিতার মুখে বেদনার চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ক্রিষ্ট কর্তে কহিলেন, আমি চেষ্টা করেছিলাম রাজুকে দিয়ে ওর ঐ উলের সামগ্রী কিনবার। সে রাজুকে বেচতে চায়নি।

কেন না?

রাজু যে-দামে ওকে বেচে দিতে চেয়েছিল, ও সে-দাম নিতে রাজি হয়নি। বলেছিল এ তোমাদের সাহায্য করার ফন্দি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। সবিতার শান্ত গম্ভীর মুষ্টির পানে তাকাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ঐ স্থির প্রশান্তির অন্তরালে কী বিক্ষুব্ধ ঝটিকাই না বহিয়া চলিয়াছে। সংসারে কেহই তাহার সন্ধান জানেনা।

সারদা বলিল, না, শুনেছিলাম রেগুর জন্ত একটি ভাল ডাক্তার পাত্রেয় সন্ধান এনেছিলেন দেবতা। সে সম্বন্ধের কি—

উদগত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া সবিতা বলিলেন, না সে হ'লনা। মেয়ে বিয়ে করবেনা পণ করেছে।

সারদা আস্তে আস্তে বলিল, এমন বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েও সে—

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই সবিতা বলিলেন, সে নাকি বলেচে, হিঁদুর মেয়ের ছু'বার গায়ে হলুদ হয়না। বাগ্‌দত্তা মেয়েও বিবাহিতারই সামিল। আমার বিবাহের ব্যাপার বাগ্‌দানের পর অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়েছিল। এখন আবার ছু'বার করে সে ব্যাপারগুলো হোক

শেষের পরিচয়

এটা আমি চাইনে। তোমরা আমার বিয়ের চেষ্ঠা কোরোনা রাজুদা, ওতে আমার মঙ্গল হবেনা আমি জেনেচি।

সবিতা চুপ করিলে সারদা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাই যদি মেয়ের মত, তা'হলে নাহয় সেই পাত্রেই রেণুর বিয়ের চেষ্ঠা করুন না, যার সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে ওর গায়েহলুদ পর্য্যন্ত শেষ হয়েছিল! ভাগ্যে থাকলে স্বামী হয়তো পাগল না-ও হতে পারে।

সবিতা স্নান হাসিয়া বলিলেন, সে পাত্রেরই সঙ্গে সাত আটমাস আগে রেণুর বৈমাত্রবোন রাণীর বিয়ে হয়ে গেছে।

শুনিয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

একটা নশ্বভেদী দীর্ঘশ্বাসের সহিত সবিতা বলিলেন, আমার ভুলেই এমনটা হ'ল।

সারদা নিম্পলক নেত্রে সবিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

সবিতা মুদুস্বরে স্বগতভাবেই বলিতে লাগিলেন, এতদীর্ঘ গৃহহীন হয়ে হয়তো বা ওদের পথে দাঁড়াতেও হোতোনা, আমি যদি না অনন জেদ করে রেণুর বিয়ে বন্ধ করাতাম। অবশ্য পথে ওদের একদিন-না একদিন নামতে হোতোই, আমি সেটা এগিয়ে দিয়েচি মাত্র। অন্ততঃ রেণুর বিমাতা এত সহজেই চট করে সম্পত্তির অংশ ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়ার অছিলা পেতেননা।

শিবুর মা আসিয়া ডাকিল, মা, দাদাবাবু ভিতর-বাড়ীতে এসেচেন, তাঁর খাবার দেবেন চলুন। রাত হয়ে যাচ্ছে।

সারদা ত্বরিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনাকে বেতে হবেনা না, আমিই তারকবাবুর খাবার দিচ্ছি গিয়ে, আপনি বরং একটু বিশ্রাম করুন।

না সারদা, চলো আমিও যাই। সে ব্যস্ত হবে খাওয়ার কাছে আমাদের দেখতে না পেলে।

সারদার সহিত সবিতাও নিচে নামিয়া গেলেন।

হরিণপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সবিতা বাসা বদলাইয়াছেন। রমণী বাবুর সেই পুরাতন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় নাই। নিয়তির দুর্লভ্যাবিধানে সুদীর্ঘ বারোবৎসরের অধিককাল যেখানে প্রতিপলে আশ্রয়-হত্যার দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, আচ্ছন্নতার মধ্যে অন্ধ অচেতনবৎ কাটাইতে হইয়াছে, আজ সেই বাড়ীখানার দিকে তাকাইতেও আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া ওঠে। অথচ ঐ বাড়ী হইতেই আশ্রয়চ্যুতির সম্ভাবনায় এই সেদিনও তো তাঁহাকে ভাবনায় দিশাহারা হইতে হইয়াছিল। দীর্ঘকাল নিজের রুচিকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত করিয়া, স্বভাবের বিপরীত স্রোতে অগ্রসর হওয়ার ফলে যে অপরিসীম শ্রান্তিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে ভার ক্রমেই দিনের পর দিন দুঃসহ হইয়া উঠিতেছিল।

বিমলবাবু বে-বাড়ীখানি ব্রজবাবু ও রেণুর জ্ঞাতিক করিয়া রাখিয়া-ছিলেন, সবিতা সেই বাড়ীটিতেই উঠিয়াছেন। বিমলবাবু কলিকাতায় নাই। ব্যবসায় সংক্রান্ত জরুরী টেলিগ্রাম আসায় সিদ্ধাপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সবিতার দেখাশুনার ভার লইয়া রাখালকে এই নূতন বাসায় থাকিবার জ্ঞাত বিমলবাবু অনুরোধ করিয়াছিলেন। নতুন-মার তত্ত্বাবধান ভার লইতে সম্মত হইলেও তাঁহার বাসায় বসবাস করিতে রাখাল অক্ষমতা জানাইয়াছিল। বিমলবাবুর নিকট এ সংবাদ শুনিয়া তারক স্বেচ্ছায় নতুন-মার বাসায় থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

সবিতার আত্মকূল্যে তারক বর্দ্ধমানের স্কুল-মাষ্টারি ছাড়িয়া দিয়া হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস্ শুরু করিয়াছে। একতলায় বহির্বাটীতে তাহার বসিবার ঘর আইনজীবির প্রয়োজনীয় উপযুক্ত আসবাবপত্র নিখুঁতভাবে

সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমলবাবু নিজে ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে হাইকোর্টের একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ উকীলের জুনিয়র করিয়া দিয়াছেন। বিমলবাবুরই ছোট মোটরগাড়ী খানিতে সে আদালতে বাতায়ত করে। তারকের আবশ্যকীয় পোষাক পরিচ্ছদ গাউন প্রভৃতি সরঞ্জাম সমস্তই সবিতা কিনিয়া দিয়াছেন।

তারকের আহার শেষ হইলে সবিতা উপরে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণবাদে সারদা উপরে আসিয়া বলিল, মা, আজও আপন কিছুই মুখে দেবেন না ?

না সারদা। আমার গলা দিয়ে কিছু গলবেনা। তবে তুমি যদি আমার জন্ত না খেয়ে উপোষ করতে চাও, তা'হলে আমাকে খেতেই হবে, কিন্তু আমি জানি তুমি তোমার মায়ের 'পরে এমন জুলুম করবেনা।

সারদা মলিন মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, যাও মা, তুমি খেয়ে এস।

সারদা তবুও নত মুখে দাঁড়াইয়া শাড়ীর আঁচলের একটা কোণ ছইহাতে অনাবশ্যক পাকাইতে লাগিল।

সবিতা বলিলেন, মাহুষ একবেলা না খেয়ে মরেনা সারদা। কিন্তু খাওয়া অনেক সময়ে তার পক্ষে মরণাধিক যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তবুও যদি তুমি আমাকে আজ খাওয়ার বার জন্ত পীড়াপীড়ি করতে চাও, চলো না হয় যাচ্ছি।

সারদা এবার মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, থাক মা। আমি একাই যাচ্ছি।

শূন্যকক্ষে আলো নিভাইয়া দরজায় খিল্ দিয়া সবিতা অনাবৃত মেঝের 'পরে এলাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

ছপুরে আজ রাখাল আনিয়াছিল। সাবতাবপন্ন স্বামী ও কন্যার সকল সংবাদই জানিতে পারিয়াছেন। সমস্তদিনটা যেন অসাড়তার মধ্য দিয়া ছায়ার মত কাটিয়া গিয়াছে, রাত্রির শুক নিৰ্জ্জন অবকাশে বেদনাভারাতুর অন্তরতলে কতকটা যেন সাড় ফিরিয়া আসিতেছে। নিম্নীলিত নয়নদ্বয়ের অবিরল বিগলিত অশ্রুধারার কঠিন কক্ষতল এবং অবলুপ্ত কোমল তুলের রাশি ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। কোনও শব্দ নাই, চাকল্য নাই, নিষ্পন্দদেহে প্রসারিত বাহুর 'পরে মাথা রাখিয়া, মাটীতে একপার্শ্ব হইয়া পড়িয়া আছেন। উপায়হীন ক্ষতির ক্ষোভে তাঁহার সমস্ত হৃদয় মন আজ কাতর ও বিকল। কোনও সাহু্যনাই আর খুঁজিয়া পাইতেছেননা! আপন সন্তানের এই দুঃখ ও ক্লেশসাধন তাঁহাকে অহরহ যেন অগ্নিকশার আঘাতে জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে। সমস্ত অন্তর ক্ষতিবিক্ষত হইয়া গেলেও বেদনার আৰ্ত্তনাদ করিবার উপায় কই? বলির পশুর মতই রক্তাক্ত দেহে ধূলয় পড়িয়া ধড়ফড় করা ছাড়া গতি নাই।

আজ তাঁহার তৃষিত নাহৃদয় দুই বাহু বাড়াইয়া বাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জ্ঞান ব্যাকুল, হৃদয় নিঙড়ানো অকুবন্ত স্নেহরসে বাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়াও তৃপ্তি নাই, সংসারে সে-ই আজ তাঁহার সবার বাড়া পর, সবার বেশি দূরের মানুষ হইয়া গিয়াছে।

পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বসিত বসন্তদিনে যখন জীবন স্বতঃই আনন্দ পিপাসাতুর, তাঁহাকে 'সেদিন উহা সম্পূর্ণ একাকী নিঃসঙ্গ বহন করিতে হইয়াছে। না মিলিয়াছে অন্তরের অন্তরঙ্গ সাথী, না পাইয়াছেন যৌবনের প্রাণবন্ত সহচর। সেই একান্ত একাকীত্বের মাঝে হঠাৎ একদিন কোথা হইতে কী যে আকস্মিক বিপ্লব হইয়া গেল তুহা নিজেও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই। যখন চৈতন্ত হইল, আশে-পাশে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন, সমগ্র

বিশ্বসংসারে তাঁহার কেহ নাই, কিছু নাই। স্বামী, সন্তান, গৃহ পরিজন, সংসার প্রতিষ্ঠা, মানমর্যাদা সমস্তই ঐন্দ্রজালিকের ভোজবাজীর হায়ে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। ভয়চকিতচিত্তে, সহসা অনুভব করিলেন, সংসার ও সমাজের বাহিরে নির্বাক্‌ব নিরাবলম্ব তিনি একা শূন্যের মধ্যে ছলিতেছেন। পা রাখিয়া দাঁড়াইবার মত মাটিটুকুও পারের নিচে আশ্রয় আর নাই।

জীবনের এই আকস্মিক সর্বনাশের ক্ষণে যে অতিপঙ্কিল আশ্রয়ভূমির সঙ্কীর্ণতম পরিধির মধ্যে নিজেকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা সামাজিক জ্ঞানবুদ্ধি বিবেচনার সম্পূর্ণ অগোচরে। কেবলমাত্র জৈব প্রকৃতির স্বাভাবিক আত্মরক্ষা প্রবৃত্তিবশেই, জীবনধারণের অনিবার্য প্রয়োজনে। কিন্তু দিন বাইবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কলুষিত আশ্রয়ের ক্লেদ ও কদর্যতার তাঁহার দেহ মন প্রতিদিন ঘুণায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছে, জাগ্রত আত্ম-চেতনা প্রতি মুহূর্তে অনুতাপের মর্মান্তিক আঘাতে আহত ও জর্জরিত হইয়াছে। তবুও এই অসহ ও অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণ আশ্রয়টুকু ত্যাগ করিয়া আরও অনিশ্চিতের মধ্যে কাঁপ দিতে ভরসা পান নাই। নিজের একান্ত নিরুপায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এগনি করিয়াই তাঁহার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিয়ত-অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে।

জীবনের প্রারম্ভক্ষেণে বলিষ্ঠ প্রাণবন্ত পুরুষ কেহ যদি তাঁহার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তাঁহার উজ্জ্বল নারীজীবনের দীপ্তিতে সংসার ও সমাজ আলোকিত হইয়া উঠিত না কি? প্রগম দেহ মনের, আনন্দিত হৃদয়ের অনুকূল আবেষ্টন প্রভাবে তিনি কি আজ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পত্নী, আদর্শ জননী, মমতা মাধুর্যময়ী নারী হইয়া উঠিতে পারিতেন না? কিসের জন্ত তাঁহার জীবনের উদয়উষা এমন অকাল

কুজ্জটিকায় বিলীন হইয়া গেল ? মুহূর্তের অবকাশে এত বড় প্রশ্নই কেমন করিয়া সংঘটিত হইল, বাহা তাঁহার নিজেরই স্বপ্নের অগোচর ।

সবিতার এই অবাধ অশ্রুনিষিক্ত চিন্তাধারায় মহিমা বাধা পড়িল । দ্বারে ঘন ঘন করাঘাতের সহিত তারকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—নতুন-মা—
নতুন-মা—একবার দোরটা খুলুন—

সবিতা উঠিয়া বসিয়া নিজেকে একটু সম্বৃত্ত করিতে না করিতে দ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত ও উপন্যূপরি ব্যগ্র ডাক শোনা বাইতে লাগিল ।

সত্বর মুখ চোখ মুছিয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে গায়ে নাথায় বসন স্রসংবৃত্ত করিয়া সবিতা দ্বার খুলিলেন । তারকের এই অধীর ব্যস্ততার তিনি বাড়ীতে কোনো দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে অনুমান করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন । দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তারক বলিল, আপনি নাকি রোজই রাত্রে অনাহারে কাটাচ্ছেন শুভলান ! আজও কিছুই মুখে দেন্নি । শরীর কি খুবই খারাপ হয়েছে ?

তারকের প্রশ্ন শুনিয়া সবিতা বিস্ময় ও বিরক্তিতে স্তব্ধ হইয়া গেলেন । কোনো উত্তর দিলেননা ।

তারক পুনরায় প্রশ্ন করিল ।

না, আমি ভালই আছি । সবিতা শান্ত গলায় জবাব দিলেন ।

তবে কেন রোজ এমন করে উপোস করে থাকেন ? না না, সে আমি গুনবোনা । কিছু-না-কিছু খাওয়া দরকার । কাগই আমি ডাক্তার নিয়ে আসব । তারকের কণ্ঠে যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্রকাশ পাইল ।

ও-সব হাদ্জানা কোরনা তারক । আমি নিবেদ করচি ।

তা'হলে বলুন, কেন অকারণ উপোস দিয়ে শরীরের উপর এমন অত্যাচার করছেন ?

রাত হয়েছে, শোওগে তারক ।

সবিতার কণ্ঠে নিরতিশয় ক্লান্তি ফুটিয়া উঠিল।

তারক ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। বলিল, বেশ, আপনার বা' খুঁসি করুন, আমি সিঙ্গাপুরে সমস্ত ব্যাপার লিখে জানাই। তিনি এসে শেষে যদি বলেন, 'তারক তোমাকে দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, আমাকে জানাওনি কেন,' তখন কী জবাব দেব তাঁকে?

সবিতার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ধীরভাবেই বলিলেন, আমি কেন দু'দিন খাইনি কিংবা তিনদিন ঘুমুইনি এর জন্য কারুর কাছেই তিনি কৈফিয়ৎ চাইবেননা।

তা'হলে এখানে আমার থাকার কি দরকার নতুন-মা?

তারকের স্বরে অভিমান প্রকাশ পাইল।

সবিতা 'অবসন্ন' কণ্ঠে বলিলেন, আজ আমি বড় ক্লান্ত তারক। তর্ক করবার শক্তি নেই। শুতে চললাম।

সবিতা আস্তে আস্তে আবার দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

সারদা সিঁড়ির মুখেই দাঁড়াইয়াছিল। তারক ফিরিবার পথে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—নতুন-মা বে প্রতিদিন রাতে উপোসী থাকচেন, একথা আমাকে কেন জানাননি? আজ শিবুর মার মুখে জানতে পারলাম!—

আপনি তো তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে চাননি!

সারদার কণ্ঠের নির্লিপ্ততায় তারক গর্জিয়া উঠিল।—কী, এতবড় মিথ্যে অপবাদ! আমি নতুন-মার খবর রাখিনা? দেখাশোনার ক্রটি করি?

—অকারণ চোঁচাবেননা। আমি ও-সব কিছুই বলিনি।

—নিশ্চয়ই বলেচেন। আমি বুঝতে পারছি, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলচে। আজ রাত্রেই আমি সব লিখে দিচ্ছি বিমলবাবুকে।

—লিখতে আপনি পারেন। কিন্তু নতুন-মা তাতে বিরক্ত হবেন।

—আমার কর্তব্য আমি করবই। সমস্ত দায়িত্ব তিনি আমাবই উপরে দিয়ে গিয়েছেন একথা ভুললে তো আমার চলবেনা!

—নতুন-নার রুচি অরুচির উপরে জুলুম করতে তিনি কাউকেই বলে যান্দি। বলবেনই বা কেন? সে অধিকারও কারুর নেই।

সবিকল্প কর্তে তারক বলিল, তা'হলে সে অধিকারটা কার আছে শুনি? রাখালবাবুর নয় আশা করি।

সারদার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। নিজেকে প্রাণপণে দমন করিয়া যত্নকর্থেই বলিল, নতুন-নার উপর জোর করবার অধিকার যদি আজ কারুর থাকে তো রাখালবাবুই আছে, আর কারুর নয়।

মৃদুস্বরে কথিত কথাগুলি তীক্ষ্ণাগ্র হৃদয়ের জ্বার তারককে বিদ্ধ করিল।

গৃহ ক্রোধ সংযত করিতে না পারিয়া তারক বলিয়া উঠিল, —তা'তো বটে। সেইজন্য তিনি নতুন-নার অসহায় অবস্থায় দেখাশোনা করার ভারটুকু পর্যন্ত নিতে পারলেন না! নতুন-নার বাড়ীতে এসে থাকলে পাছে তাঁর সুনামে কালি লাগে!

শান্ত গলায় সারদা কহিল, যারা স্বার্থের প্রয়োজনে সব কিছুই করতে প্রস্তুত, রাখালবাবু তাদের দলের নন। নতুন-মাকে দেখা-শোনার ভার নেওয়ার চেয়ে নতুন-নারই পক্ষ থেকে ঢের বড় কর্তব্যভার তিনি নিয়ে রয়েছেন। আপনি তা' জানেননা, কাজেই বুঝতে পারবেন না।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সারদা সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

ছুপুর বেলায় সত্যমাতা সবিতা দিল্লী কেশের বনপুঞ্জ পিঠের 'পরে ছড়াইয়া রোদে পিঠ রাখিয়া নিবিষ্টচিত্তে পত্র লিখিতেছিলেন। পরিধেয় শাড়ীর কালো পাড়টি শঙ্খের মত সুন্দর গ্রীবার একপাশ দিয়া লতাইয়া

গিয়া পিঠের 'পরে ঝাঁকিয়া পড়িয়া আছে। উদাস বিষমচ্ছায়া শীর্ণ শুভ্র মুখে সঙ্করুণশ্রী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

সারদা সেইখানেই বারান্দার একধারে বসিয়া নিজের জন্ত একটি সেমিজ সেনাই করিতেছিল। পথের দিকে চাহিতে দেখিতে পাইল রাখাল আসিতেছে। সেলাইটা হাতে নিয়াই সে নিচে নামিয়া গেল সদরদরজা খুলিয়া দিতে।

কড়া নাড়িয়া ডাকিবার প্রয়োজন হইলনা। খোলা দ্বারে সারদা তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া রাখাল মনের ভিতরে ঈষৎ খুশি হইয়া উঠিল। সেটা প্রকাশ না করিয়া বলিল, ঠিক-দুপুর বেলায় সদরদরজায় দাঁড়িয়ে কেন সারদা?

একজনের জন্ত অপেক্ষা করছি।

কে সে? ফেরিওলা নিশ্চয়ই!

উঁহ, চিনতে পারবেন না।

তুমিই না হয় চিনিয়া দিলে—

নিজে থেকে চিনে নিতে না চাইলে অন্তে তাকে চিনিয়া দিতে পারেনা যে দেবতা!

কথাটা হেঁয়ালি ঠেকচে—

পেয়ালী মানুষদের কাছে সব কথাই হেঁয়ালী ঠেকে শুনেছি। সঙ্কন, দরজা বন্ধ করি।

সারদা দরজায় খিল্ দিয়া রাখালের সঙ্গে ভিতরের দালানে আসিল।
রাখাল মুহু হাসিয়া বলিল, অল্প দিনেও এননি করে নিস্তরু দুপুরে কারুর জন্ত দুয়োরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকো নাকি সারদা?

কণ্ঠে তাহার স্বচ্ছ পরিহাসের লঘু সুর।

সারদা মুহূর্ত্ত মাত্র রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল

এ বক্রোক্তি কিনা। তারপরে সেও হাসিয়া জবাব দিল, হ্যাঁ, সব দিনই থাকতে হয়। বেদিন প্রথম আপনি আমাকে দেখেছিলেন, সেদিনও তো একজনের পথ চেয়ে এমনি করে দুরোর খুলে অপেক্ষা করছিলাম!

—তাই নাকি? কে তিনি বলোতো?

সারদা হাসিয়া বলিল, আমার পরমবন্ধু মরণ-দেবতা। তাঁর আমার দুরোর তো মোদিন এমনি করে নিজের হাতে খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই খোলা দুরার পথে মরণ-দেবতার বদনে এলেন মন্তোর দেবতা।

রাখালের কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। কথাটা হাল্কা করিবার জন্তই সে বলিল, বাক্য, অপদেবতা যে কেউ এসে পড়েনি এই যথেষ্ট। চলো উপরে বাই। নতুন-না কি এখন বিশ্রাম করছেন?

—না। চিঠি লিখছেন। এই নাত্র তো তাঁর থাওয়া হোলো।

—সেকি! এতো বেলায়?

—প্রতিদিনই তো এমনি হয়। সংসারের সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে শেষ করে স্নান আত্মিক সেয়ে খেতে বসেন যখন, তিনটে বেজে বায়। আজ বরং একটু আগে হয়েছে।

—এর মানে কি? নিজের হাতে ও সকল কাজ করা ত' নতুন-মার অভ্যাস নেই। এমন করলে যে একটা কঠিন অস্ত্রখে পড়ে বাবেন! লোকজন, স্ত্রী রাধুণী এসব কি আর নেই? একলা মানুষ উনি, এমনই কি গুরূ অভাব—

—অভাবের জন্ত নয় দেবতা।

—তবে?

—এ তাঁর কঠিন আত্মনিগ্রহ।

রাখাল নিরুত্তর রহিল।

সারদা দার্বীন্দ্রস ফেলিয়া কহিল, বসবেন চলুন।

সারদার মুখের পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল আমি ছুপুরবেলায় আসি, নতুন-নার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাইনে তো সারদা ?।

—তা' যদি মনে হয় আপনার, এ সময়ে না এলেই পারেন।

রাখাল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, কিন্তু এই সময় ছাড়া এখানে আসার বে আমার অবসর নেই সারদা !

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সারদা জবাব দিল, সে আমি জানি।

রাখাল সন্দিগ্ধসুরে বলিল, তার মানে ? তুমি এর কী জানো ?

—জানি বইকি। এই সময়ে এ বাড়ীর নতুন উকীলবাবু কোটে থাকেন। অতএব আপনার বন্ধুসঙ্কট—থুড়ি, বন্ধুসম্মিলন ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

—হঁ, খড়ি পেতে গুণ্ডতে শিখেছ দেখছি। এখন চলো, উপরে উঠবে না নিচেই দাঁড় করিয়ে রেখে দেবে ?

সারদা বলিল ওধারের ঐ বেকিটার উপরে একটু বসবেন চলুননা দেবতা। মায়ের চিঠি লেখা শেষ হতে এখনও একটু দেয়ী হবে। সেই অবকাশে আপনাকে আমি গোটা কয়েক কথা জিজ্ঞেসা করতে চাই।

—চলো, উপরে গিয়েই শুনবো।

—মার সামনে বলতে পারবোনা। আমার বাধবে।

সারদা রাখালকে একতলায় দালানের উত্তর দিকে লইয়া গেল। একপাশে পিঠওয়ালা কাঠের মোটা ভারী একখানি বেঞ্চি পড়তা আছে। নিজের আঁচল দিয়া বেঞ্চির উপরের ধূলা ঝাড়িয়া সারদা বলিল, বসুন।

রাখাল বসিয়া পড়িয়া বলিল, অতঃপর ? তোমার আসন কৈ ?

না। আমি বেশ আছি। আমার কথা অল্পই। বেশিক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করতে হবেনা।

—তথাস্তু । অথ কথারস্তু হোক ।

—আপনি এমন করে ঠাট্টা তামাসা করলে বলবো কি করে ?

—আচ্ছা, ঠাট্টা এবং তামাসা দুইই প্রত্যাহার করলাম । বলো ।

সারদা রাখালের নিকট হইতে একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল । হাতের অসমাপ্ত সেলাইয়ের কাজটা নতচোখে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,

—আনি ঠিক জানিনা এসব জিজ্ঞাসা করা আমার উচিত কিনা । তারপর অল্প খামিয়া বলিল, আচ্ছা, রেণুর বোন রাণী বিয়ের পরে কেনন আছে জানেন আপনি ?

রাখাল সারদার কাছে এ প্রশ্ন আশা করে নাই । তাই বেশ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন বলোত ? আনি তো বিশেষ কিছুই জানিনে । তবে, সে ভাল ঘরে-বরেই পড়েছে এবং বিয়ের পরে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে শুনেছিলাম । কিন্তু, তুনি একথা হঠাৎ জিজ্ঞেসা করচো কেন সারদা ?

—পরে বলবো । আচ্ছা, রাণীর নাকি সম্ভান সম্ভাবনা হয়েছে, ওরা চিঠি লিখে কাকাবাবুকে এই স্তুত্ববাদ জানিয়েচে ?

—হয়তো হবে । কিন্তু আনাদের এসব খবরে দরকার কি সারদা ? এই স্তুত্ববাদ জানাবার জন্তই কি তুনি বটা করে আনাকে এখানে এনে বসিয়েচো ?

—না । সারদার কণ্ঠস্বর একটু ভারি হইয়া উঠিল । বলিল, আপনি কি জানেন-রাণীর বিয়ে হয়েছে সেই পাত্রেই, যে-পাত্রের সঙ্গে রেণুর বিয়ে ঠিক হয়ে গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছিল ।

রাখাল অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি ? তা'তো কৈ জানতামনা ! রাখালের মুখে চোখে চিন্তার ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল ।

—হ্যাঁ তাই ।

অল্পপরে সারদা আবার প্রশ্ন করিল, কাকাবাবু নাকি বৃন্দাবনবাস করবেন মনস্থ করেছেন ?

—হ্যাঁ।

—রেণুও সঙ্গে যাবে ?

—নইলে কোথায় আর থাকবে সে ?

সারদা ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কতকটা আপন মনেই বলিল, কিন্তু সেখানে এই বয়সে কুমারী নেয়ে—

রাখাল বলিল, সবই তো বুঝি। কিন্তু এ ছাড়া অন্য পথই বা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারো সারদা ? একটু থানিয়া আবার বলিতে লাগিল, যার যা অদৃষ্টে ঘটবার, তার তাইই ঘটে থাকে। এই-ই ছুনিয়ার নিয়ম। এ মেনে নিতে না পারলে খালি জটিলতা আর দুঃখ বেড়ে ওঠে মাত্র।

—তার মানে, আপনি বলতে চাইছেন, রেণুর অদৃষ্টে যা' আছে তা' হবেই। আনাদের দুশ্চিন্তা নিরর্থক ?

—নরতো কি ? ওর ভাগ্যবিড়ম্বনা ত' শৈশবেই শুরু হয়েছে ওর জীবনে। তুমি আমি কেন, দেশশুদ্ধ লোক এখন ওকে স্মৃতে রাখবার চেষ্টা করলে তা' ব্যর্থ হবে।

এইই কি আপনার অন্তরের বার্থ বিশ্বাস দেবতা ?

হ্যাঁ। অনেক হৌচটু খেয়ে এইই এখন আমি শেষ বুঝছি।

সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “না কিন্তু এটা সহ্য করতে পারবেন বলে মনে হয়না।

তার মানে ?

আপনি বাই বলুন দেবতা, সারদাকে ভোলাতে পারবেননা। জোর করে নিষ্ঠুর সাজতে বাওয়া আপনার মত মানুষের সাধ্য নয়। সনস্তুই

আপনি জানেন, বোঝেন। আপনার জ্ঞানের কাছে আমার জ্ঞান বুদ্ধি তুচ্ছ। জানি, রেগুর আজকের অবস্থার জন্য তার নিজের মা-ই দায়ী। কিন্তু যা' এই সংসারে বহু মানুষেরই জীবনে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঘটে যায়,—তার বি' কোনও জবাবদিহি আছে? নিজেই সে কি খুঁজে পায় তার কারণ? তার অর্থ?

রাখাল ভাবহীন শূন্য দৃষ্টিতে সারদার পানে তাকাইয়া রহিল।

সারদা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তবুও ভেবে দেখুন, সেদিনের মা আর আজকের মা একমানুষ নন। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। আর যে-কেউ যাই বুঝুকনা কেন দেবতা, মায়ের নতুন-মা পরিচয়টা আপনার চেয়ে ভাল আপনার চেয়ে বেশি আর কে জানে?...

নিরন্তর রাখালের মুখে চোখে নিগূঢ়বেদনার বিষণ্ণতা নামিয়া আসিয়াছিল। সারদা অত্যন্ত মৃদুগলায় বলিল, মার পানে আর চাওয়া যায়না আজকাল। কি-মানুষ কী হয়ে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। ভিতরে ভিতরে অহরহ তুঁষের আগুনে পুড়ে পুড়ে দেহ-মন তাঁর থাক হয়ে গেল। খাওয়া ছেড়ে পরা ছেড়ে সংসারের অনাবশ্যক কাজে দাসী-রাণুনীর বাড়ি খাটুনি খেটে—নেয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে দেহপাত করে ফেলছেন। তবুও একবিন্দু শান্তি পাচ্ছেননা একদণ্ডও।

রাখাল উদাসনেত্রে উঠানের দিকে তাকাইয়া রহিল; কথা কহিলনা।

সারদা বলিল, মায়ের উপরে আপনি অবিচার করবেননা। আপনিও যদি অভিযুক্ত না হইতেন, তা'হলে পৃথিবীতে সত্যের 'পরে যে আর নির্ভর করাই চলবেনা। মানুষ বাঁচবে কিসে?

রাখাল দৃষ্টি নত করিল। কি বলিবে খুঁজিয়া পাইলনা। জবাব দিবার ছিলওনা কিছু।

—দেবতা, আপনি চলুন একটু মার কাছে। আজকের দিনে তাঁর

মনের এই মর্শাস্তিক জ্বালা এতটুকু জুড়োতে পারে এমন কেউ নেই আপনাকে ছাড়া। ২৭.

—এবার থেকে তোমারই কথামত চলতে চেষ্টা করব সারদা।

গাঢ়কণ্ঠে সারদা বলিল, আপনি শুধু আমার জীবনদাতা দেবতা নন, আমার গুরুও। অন্ধ ছিলাম, দৃষ্টি দান করেছেন আপনিই। অজ্ঞান ছিলাম জ্ঞান দিয়েছেন আপনি। আপনারই দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতায় আজ আমার দৃষ্টি বদলেচে। এ'কথা একটুও বাড়ানো নয়, অন্তর্যামী জানেন।

বিমলবাবু সিঙ্গাপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

তারকের পত্রে সবিতার শারীরিক রুচ্ছসাধনের সংবাদ পাইয়া তাহাকে লিখিয়াছিলেন, “তোমাদের নতুন-মা নিজে বাহা করিয়া তৃপ্তি পান, তাহাতে আনাদের বাধা দেওয়া সম্ভব নয়।”

তারক এই পত্র পাইয়া একরূপ বাঁচিয়াই গেল। কারণ, নূতন আইন-প্র্যাকটিস লইয়া সে অহরহ ব্যস্ত, অক্লদিকে মনোযোগ দিবার মত অবকাশ এখন তাহার নিতান্ত সঙ্গীর্ণ।

নতুন-মার স্নানাহারের নিত্য অনিয়ম, উপবাস ও পরিশ্রমের কঠোর অত্যাচার, কোনো কিছুই সে আর এখন একটিও শব্দ উচ্চারণ করেনা। গম্ভীর মুখে ও বথাসম্ভব নীরবে নিজের স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া যায়।

সবিতা হাসেন। একদিন কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তারক, মায়ের উপর রাগ করেছ বাবা ?

মুখ অন্ধকার করিয়া তারক জবাব দিল, সে অধিকার তো আমার নেই নতুন-মা। আমি একজন পথের কাঙাল বইতো নয়।

, সবিতা স্নেহে বলেন, ছি, ওকথা বলতে নেই।

তারক আরও গোটাকয়েক বাঁকা বাঁকা কথা ঠেস্ দিয়া শুনাইয়া দিতে উত্তত হইয়াছিল, কিন্তু সারদাকে আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। সে ভালই জানে, নতুন-মা কিছু না বলিলেও সারদা ইহা সহ্য করিবেনা। এমন অনেক অপ্রিয় সত্য হয়তো এখনই অসঙ্কোচে স্পষ্ট বলিয়া বসিবে,

মহা সহ করা তারকের পক্ষে একান্ত কঠিন, অথচ প্রতিকারেরও উপায় নাই।

বিমলবাবু তাঁহার কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সংবাদ সন্ধ্যাবেলায় পত্র দ্বারা এবং তারযোগেও জানাইয়াছিলেন। সন্ধ্যাবেলায় নিকট সে সংবাদ শুনিয়া তারক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকালে উঠিয়াই জাহাজঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। গিয়া দেখিল, বিমলবাবুর ছোট ও বড় দুইখানি মোটরগাড়ী লইয়া তাঁহার ম্যানেজার সরকার ও দ্বারবানেরা সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। বিমলবাবু তারককে দেখিতে পাইয়া নিজের গাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইলেন।

মোটরে বিমলবাবু তারককে সর্ব প্রথম প্রশ্ন করিলেন, রাজু ভাল আছে তো তারক?

বিস্মিত হইয়া তারক জবাব দিল, কেন, তার কী হয়েছে?

—না, এমনই জিজ্ঞাসা করছি। আমি তাকে লিখেছিলাম কিনা, যদি তার অসুবিধা না হয়, যেন জেটীতেই আমার সঙ্গে এসে দেখা করে।

তারকের মুখের দীপ্তি মুহূর্তে নিভিয়া গেল। শুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কোনও জরুরি প্রয়োজন ছিল বোধহয়।

—হ্যাঁ। আসেনি দেখে মনে হচ্ছে হয়তো বা অসুস্থ হয়ে পড়েছে কিংবা কলকাতার বাইরে গেছে। আমার চিঠি পায়নি।

তারক বলিল, না, পরশু সন্ধ্যাতেও তাকে আমাদের বাসায় দেখেছি। বিমলবাবু বলিলেন, তা'হলে সম্ভবতঃ কোনও কাজে আটক পড়ে আসতে পারেনি। ড্রাইভারকে বলিলেন,—শিউরণ, পটলডাঙা চলো।

তারক বলিল, একটু আগে আমাকে নামিয়ে দেবেন বিমলবাবু। আমার আজ একটা জরুরী কন্সাল্টেশন্স আছে এ পাড়ায়।

—তোমার প্র্যাকটিস্ তা'হলে বেশ জমে উঠেছে বলে!
তা' আপনার আশীর্বাদে নেহাৎ মন্দ নয়। ~~পার~~ ^{পার} রোজই ^{নুগেজড্}
আছি।

—বেশ বেশ, তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারবে।

তারক বিনয়হাস্তে বিমলবাবুর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া গেল।

পটলডাঙায় আসিয়া দেখা গেল, রাখালের বাসা ডবল তালায় রুদ্ধ।
সংবাদ পাঠবারও কোনও উপায় সেখানে নাই।

বিমলবাবু সেখান হইতে ফিরিয়া সবিতার বাসায় আসিয়া নামিলেন।
তাহার কণ্ঠের সাড়া পাইয়া সারদা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া হাসি-
মুখে প্রণাম করিল। বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া বলিল, আপনি ভারি
রোগী হয়ে গেছেন। কালোও হয়েছেন খুব। সেদেশের জল-ত্যাগী বৃষ্টি
ভাল নয়?—

বিমলবাবু সহাস্তে জবাব দিলেন, দুনিয়ার মায়েদের নজর চিরকাল ধরে
এই একই কথা করে আসছে। ছেলে কিছুদিন ঘরের বাইরে ঘুরে
ঘরে ফিরলে মায়েরা তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে গায়ে মাথায় হাত
বুলিয়ে বলবেনই, অহা, বাছা আমার আধখানা হয়ে ফিরেচে।) আমি যে
এরচেয়ে কম কালো ছিলাম বা বেশি মোটা ছিলাম, তার উপযুক্ত প্রশ্ন
কৈ সারদা-মা?

সারদা লজ্জিত হইয়া পড়িল। বিমলবাবুর কথা এড়াইয়া বলিল, বস্তু;
নাকে ডেকে দিচ্ছি।

ডাকিতে হইলনা। রান্নাঘর হইতে সবিতা বাহির হইয়া আসিলেন।
পরিধানে আধময়লা মোটা মিলের শাড়ী, শুভ্র ললাটের 'পরে ও
কানের পাশে কেশগুচ্ছ রুদ্ধ রেশমের ত্রায় ঢুলিতেছে। চেহারা

ওগ্রে'র চেয়ে অনেক শীর্ণ। আরত নয়নদ্বয়ের মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাপা বিষণ্ণতা ছাড়া।

সবিতার শরীর এত বেশি খারাপ দেখিবেন বিমলবাবু বোধহয় আশা করেন নাই। তাই চকিত হইয়া বলিলেন, একি, তোমার শরীর এত বেশী খারাপ হয়ে পড়ল কি করে? অসুখ করেনি তো?

ভোরের অন্ধকার আকাশে পাণ্ডুর আলোর মত মুখ হাসিয়া সবিতা বলিলেন, অসুখ করেনি। কিন্তু তুমি যে আমাকে লিখেছিলে, জাহাজ থেকে নেমে নিজের বাড়ীতেই উঠবে। সেখানে স্নানাহার বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে এখানে আসবে। অথচ এ'তো দেখচি একেবারে ধূলোপায়েই উত্তরণ!

সারদা অন্তর চলিয়া গেল। গমনশীলা সারদার পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠস্বর একটু নিম্নে নামাইয়া বিমলবাবু বলিলেন, ধূলোপায়েই দেবীদর্শন যে শাস্ত্রের বিধি।

—তাই নাকি?

—বিশ্বাস না হয় পঞ্জিকা খুলে দেখতে পারো। কিন্তু সেকথা থাক। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও?

—কী প্রশ্ন?

—শরীর এত বেশি খারাপ হল কেন?

ঠোঁটের কোণে সবিতার চাপাহাসি ফুটিয়া উঠিল। বিমলবাবুরই কণ্ঠপূর্ব্বের সারদাকে বলার অবিকল ভঙ্গীতে কহিলেন, ছুনিয়ার দয়াময়দের নজর অসহায় দীন-দুঃখীদের সম্বন্ধে চিরকাল ধরে ঐ একই কথা কয়ে আসচে।

সবিতার মুখে আপনার কথার অনুরূপিতা শুনিয়া বিমলবাবু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। সবিতাও হাসিতে লাগিলেন। অস্পষ্ট বেদনা

ছায়াচ্ছন্ন গৃহের আকাশ বাতাস বেন বহুদিন পরে আজ উন্মুক্ত হাসির/
স্বচ্ছ-ধারায় মালিন্যহীন হইয়া উঠিল।

বিনলবাবু বলিলেন, তোমার কাছে হার মানিচি সবি—রেণুব-না।

‘সবিতা’ বলিত গিয়া বিনলবাবু যে তাড়াতাড়ি সেটা সামলাইয়া
‘রেণুব-না’ বলিলেন, সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া শুধু একটু হাসিলেন।
বলিলেন, কোথায় মানাহার করবে? এখানে না বাড়ীতে?

—তুমি যেখানে বলো।

—বাড়ীই যাও।

—সেখানে আমার জ্ঞান অপেক্ষা করে বসে থাকবার কেউ নেই, তুমি
জানোই। আছে শুধু চাকর-বাকর আর কন্সচারীর দল। দূর সম্পর্কের
একজন মানিনা থাকেন বটে তাঁর একটি জড়বুদ্ধি ছেলেকে নিয়ে, কিন্তু
তাঁর কাছে আমার আসাটা প্রীতির ব্যাপার কিংবা ভীতির ব্যাপার সঠিক
নির্ণয় করা কঠিন।

—তা’ হোক, বাড়ী যাও। ধারাই থাকুন সেখানে, সকলেই যে তাঁরা
তোমার আসার প্রতীক্ষা করছেন এটা সঠিক। তা’ প্রীতিতেই হোক বা
ভীতিতেই হোক। সরাসরি এখানে এসে ওঠা ভাল দেখাবে না।

—নিন্দে হবে বুঝি? কা’র হবে? তোমার না আমার?

—কা’র মনে হয়?

—হয় যদি দু’জনেরই নাম জড়িয়ে হবে।

—তা’ হলে আর দেবী করচ কেন?

—ভাবচি। মনের অবস্থা বিশেষে নিন্দাও অনেক সময়ে প্রশংসার চেয়ে
বেশি প্রলুব্ধ করে।

—দার্শনিকতত্ত্ব থাকুক। বাড়ী যাও এখন।

—যাচ্ছি। কিন্তু তুমি দেখচি আমাকে—

বিমলবাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সবিতা বলিলেন,—তাড়াতে পারসেই বৈন্য বাচি। কেমন তো? হ্যাঁ, তাইই। এখন তারই সাধনা করচি যে দয়াময়! কণ্ঠস্বর শেষের দিকে ভারী হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু চিচিলিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত বিষয়ে এই অসতর্ক মুহূর্তে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—সবিতা!

সকলুপহাস্ত্রে বিমলবাবুর পানে তাকাইয়া সবিতা কহিলেন, পরে সব বলবো। এখন আমার কিছু জিজ্ঞেস করোনা।

—না, আমি সমস্ত না জেনে বাড়ী যাবোনা। তোমাকে বলতে হবে কী হয়েছে?

—বলবো। বিকেলে এসো। রাত্রে বরং এখানেই থেকো। আমি এখন নিজের হাতেই রাঁধচি।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই হবে। কিন্তু দেখো, তখন যেন আমাকে ফাঁকি দিয়ে অন্য কথার ভুলিয়োনা।

—ভয় নেই। জীবনে একমাত্র নিজেকে ফাঁকি দেওয়া ছাড়া আর কাউকে দিয়েছি বলে তো মনে পড়েনা। সবিতার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

বিমলবাবু লক্ষ্য করিলেন, সবিতা আজ সহজ পরিহাসের উত্তরেও কি যেন গুরুবেদনার গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে। ইহা যে তাহার অন্তর্গুঢ় কোনও একটা বিক্ষোভেরই বহির্লক্ষণ, ইহা বুঝিতে ভুল হইলনা। তাই আর কোনও কথা না কহিয়া বিকালেই আসিবেন বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিমলবাবু যখন আসিলেন, সবিতা এবেলার রন্ধন শেষ করিয়া সান্ধ্যস্নান সমাপনান্তে পরিচ্ছন্নবাসে তেতালার ছাদে একখানি ডেক্চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সামনে আর একখানি চেয়ার পাতা।

শুভ্র আবারও ঢাকা একটি ছোট টীপয়ের উপরে স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে চাঁপা দেওয়া পরিষ্কার পানীয় জল, সচা চাকনি খোলা এবং তিন বিহীন সিগারেট, বে-ব্যাণ্ডের সিগারেট, বিমলবাবু সর্বদা ব্যবহার করেন। টীপয়ের 'পরে এক বায় নূতন দেশলাই ও ছাই ঝাড়িয়া খোলিবার একটি পিতলের বাকঝকে ক্ষুদ্র আধার।

বিমলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলে, মুণালদেওর মত দেহলতা নত করিয়া সবিতা বিমলবাবুর দুই পায়ে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন।

বিমলবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পিছু হঠিয়া গিয়া বলিলেন—ওকি করো, এ আবার কী পাগলামি—

আরও চক্ষু দুইটি উজ্জল করিয়া সবিতা বলিলেন, পাগলামি নয়, তোমার প্রধান প্রশ্নের উত্তর যে আমার এই। প্রভাতে করেচি আমন্ত্রণ, সন্ধ্যায় নিবেদন করলাম প্রণাম। আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন, তো দয়াময় ?

সবিতার কণ্ঠস্বরে এমনই এক অশ্রুতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ক্ষরিত হইল যে, বিমলবাবু অল্পক্ষণ অভিভূতের ছায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে হইল এ বেন তাঁহার পূর্ব্বপরিচিতা সে-সবিতা নয়, যে অসহায়াকে তিনি রনগীবাবুর সুসজ্জিত অট্টালিকায় দিনের পর দিন নিগূঢ় বেদনার মৌন ছায়াতলে বিষণ্ণ প্রতিমার মতো বারংবার দেখিয়াছেন। আজও সকালে রান্নাবরের সম্মুখে বাহার স্নান ক্রিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া বৃকের মধ্যে বেদনা গোচড় দিয়া উঠিয়াছিল,—এ বেন সে-সবিতাও নয়। সুগোর শীর্ণ মুখে একটি প্রশান্ত কোমল মেহুরতা। সে মুখে হৃদয়াবেগের আতিশয্যজনিত উচ্ছ্বাস-দীপ্তি নাই, সলজ্জ প্রেনিকার প্রণয়মূলভ সরমরাগের রক্তিমামা নাই।

সুকুমার ওষ্ঠাধরে প্রীতিসিদ্ধ সংবতহাস্তের মাধুর্য্যময় সুসমা। বিবাদ শান্ত নয়ন যুগলে বিচ্ছুরিত হইতেছে সুদূরপ্রসার দৃষ্টি।

কল' অল্পভঙ্গিমার রেখায় রেখায় বিকশিত হইয়া উঠিতেছে আজ এমন একটি সুচারু-সুন্দর অথচ সম্মনন্যক অভিব্যক্তি, যাহাতে মেহ ও শ্রদ্ধা, বৈদ্যাস ও নির্ভরতার সম্মিলিত ব্যঙ্গনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। নাবীর এ মূর্তি সংসারে একান্তই দুর্লভদর্শন। বিনলবাবুর বহুবিচিত্র জীবনেও এমনটি তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

সবিতার মহিমময়ী মূর্তির পানে চাহিয়া, আজ সর্বপ্রথম বিনলবাবুর মনে ইল, তিনি এ জগতে যে-স্তরের মানুষ, সবিতা তাহার অনেক উর্দ্ধলোকের মণিবাসিনী। মানবজীবনের যে অন্তরতম অল্পভূতি, চরম দুর্ঘ্যোগের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, দুঃখের দুর্গমগথে বিক্ষতপদ-যাত্রীর য ভ্রমোদর্শন আজ তাঁহার অন্তর-বাহির ঘিরিয়া এমন একটি মহিমাকে উপায়াত করিয়া তুলিয়াছে, যাহাকে শুধু যথেষ্ট ব্যবধান হইতে মাগা তে কারিয়া প্রণাম করাই চলে, পাশে বাইয়া দাঁড়ানো চলেনা।

বিনলবাবুর এই অভিজুত ভাব লক্ষ্য করিয়া সবিতা মনে মনে কুণ্ঠিত ইলেও সহজ মুখেই সম্ভাষণ করিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে, বোসো।

বিনলবাবু নিশেধে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তখনও বিতার পানে অপলক নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার সে চাহনিত্তে মাজ আর বিমূগ্ধের বিহবল আকুলতা নাই, আছে অমুরাগীর সশ্রদ্ধ বিষয়। এ যেন বাঞ্জিত দেবমূর্তির প্রতি ভক্তের বন্দনা-সুন্দর সন্দর্শন।

সবিতা সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, একদৃষ্টে চেয়ে দেখচ কি ?

—তোমাকেই দেখচি।

—আমাকে কি কখনও দেখনি ?

—আজকের তোমাকে সত্যিই কখনো দেখিনি। যাকে দেখেছি সে এ তুমি নও।

—সে কোন আমি দয়াময় ?

—সে অল্প তুমি। দুঃখের পীড়নে বিচলিতা, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ
ভাবনার কাতর তুমি। আশ্ব-চিন্তায় আত্মহারা অসহায় তুমি।

—আর আশ্রয় কোথায় ?

—এ-তুমি আর এক নতুন মানুষ। আজই প্রথম দেখা শৈলাম। এর
সাথে সত্যিই আমার পরিচয় ঘটেনি এতদিন। শিঙ্গাপুরে লেখা তোমার
চিঠিগুলির মধ্যে এর চরণধ্বনি শুনতে পেয়েছি বটে। আজ এসে দেখলাম
অনুপূর্ব আবির্ভাব।

সবিতা হাসিলেন। সে হাসি উদাস। গোবুলির রক্তিম আলোকে
দূরগত বাঁশির পূর্বস্মরণ বেগম মানুষের চিত্তকে ফণেকের জন্তুও
অকারণ উদাস করিয়া তোলে, সবিতার এই হাসিতে সেই মুহূর্তের উদাস
করিয়া তোলার আশ্চর্য্য মারা নিহিত। বলিলেন, কি জানি, হতেও
পারে। এক জন্মেই যে কত জন্মান্তর ঘটে যায় মানুষের, তার কি
হিসাব আছে ?

বিমলবাবু কথা কহিলেননা। বিস্মিত নয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন,
সবিতার পরিবানে একখানি থরেরীপাড় দুঃখেগরদ শাড়ী। কার্যোপলক্ষে
একবার কাশী গিয়া বিমলবাবু এই গরদশাড়ীখানি পূজা-আঙ্গিকে
ব্যবহারের জন্ত সবিতাকে আনিয়া দিয়াছিলেন। শাড়ীখানি পরিবার
জন্ত অনুরোধ করিলে সবিতা হাসিয়া জবাব দিয়াছিলেন, এখন থাক।
সময় হলে পরবে।

*আজ-সেই শাড়ীখানি পরিয়াই তিনি বিমলবাবুর জন্ত অপেক্ষা
কুরিতেছিলেন।

বিমলবাবু বলিলেন, জন্মান্তর মানতামনা, কিন্তু তুমি আমার মানালে।
সত্যি বটে ঠাট্টা এই জীবনেই ঘটে। তাই এতদিন পরে তোমার তো সময়
হয়েছে আমার এজন্মেই আমার দেওয়া শাড়ী পরবার।

সবিতাকে নিরন্তর দেওয়া বিমলবাবু বলিলেন, হয়তো ভুল বলছি। সময় হয়েছে না বলে সময় ফুরিয়েচে বলাই উচিত ছিল আমার, না সব—
রেণুর না ?

বিমলবাবু প্রশ্নের জবাব এড়াইয়া সবিতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি এই বিড়ম্বনা আরও কতোদিন ভোগ করবে বলোতো ? ভিত্তয় থেকে সে-ডাকটা আপনাকে হতে বেরিয়ে আসচে, তাকে বারে বারে গলা টিপে ঠেলে সরিয়ে অন্তের মুখের ডাক আওড়াতে চেষ্টা করছো ! কতবারই তো ঠোকর খেলে ! তবু ছাড়বেনা ?

বিমলবাবু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

সবিতা বলিতে লাগিলেন, আগে ডেকেচো নতুন-বৌ, সেটা তোমার নিজের মুখের ডাক নয়। ও নামে প্রথম যিনি ডেকেচেন তাঁরই মুখে ওটা নানায়। তোমার মুখে বেসুরো শোনালো। তারপরে ডাকতে চেষ্টা করেচো ‘রেণুর মা’ সেও তোমার মুখে বার বার বাধা পাচ্ছে, স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারেনি, পারবেওনা হয়তো কোনওদিন।

—তবে কী বলে তোমায় ডাকব বলে দাও তুমি।

—কেন, ‘সবিতা’। যে-ডাক আপনাকে হতে সহজে মুখে আসচে।

—তাই নাহয় ডাকব। কিন্তু ‘রেণুর মা’ নামে ডাকতে তুমিই যে আমাকে বলেছিলে একদিন।—আচ্ছা সত্যি করে বলো, না জেনে কোনও দিন অমর্যাদা ঘটিয়েছি কি সে-ডাকের ?

—ওকথা মনেও এনোনা। তোমাকে ও-নামে ডাকতে বলা আমারই ভুল হয়েছিল। তোমার কাছে তো আমার ও-পরিচয় নয়। কোনও দিনই ও-ডাকটা তাই তোমার কাছে সজীব হয়ে উঠলনা। দেখো, অনেক দুঃখ পেয়ে, একটা কথা আমি এখন বেশ বুঝেছি, যার মা, তা তাই

ভালো। তোমার মুখে সবিতা ডাক যত সহজ-সুন্দর, এমন অন্ধ কিছুটি নয়।

বিনলবাবু হাসিমুখে বলিলেন, আন্নার অন্তরের আনন্দ-নিঃসরণে যে নামের বৃদ্ধদুগুণি আপনা হতেই রানধরুর রং নিয়ে ফুটে উঠে আপনিই ভেঙে ভেঙে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেই নাম দিয়েই এবার থেকে ডাকতে অচুমতি দাও তা'হলে। কিন্তু, বৃদ্ধদের ভাঙা-গড়ার বিরাম নেই জানো তো?

—জানি।

—তুমি কি তা' সহ্যে পারবে রেণুর না? ছোট্টনা সে জলধিনুর বৃদ্ধদ মাত্র, তবুও তোমাকে হয়তো তা' বিধবে আমার ভয় করে।

সবিতার মুখে ছায়া নামিয়া আসিল। বলিলেন, (ঐ গো তোমাদের দোষ। মেয়েদের সম্পর্কে কোনও দিনই সহজ হতে পারোনা তোমরা। হয় অতিভক্তি অতিশ্রদ্ধার গদগদ হয়ে বহু সময়ে উচুতে তুলে পরতে চাইবে না হয় একেবারে নর-নারীক চিরদিনের আদিম সম্পর্ক পাতিয়ে ঘনিষ্ঠতা করে বসবে। পুরুষ আর নারীর মধ্যে নাচুষের সহজসুন্দর সম্বন্ধ কি পাতানো যায়না সত্যিই?)

বিনলবাবু শাস্ত গলায় বলিলেন, তোমার আমার সম্বন্ধের মধ্যে এ প্রশ্ন ওঠবার সময় যদিও আজও আসেনি সবিতা, তবু তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি, বলতে পারো কি কেন এমন হয়?

একটু চিন্তা করিয়া সবিতা বলিলেন, ঠিক জানিনে। তবে অচুনান হয়, সমাজবিধির বনেদের নিচেয় এর বীজ পোঁতা আছে হয়তো। নইলে সর্বত্র সর্বক্ষেত্রেই একই বিষয় ফল ফলে ওঠে কি করে? দেখো, সমাজের বাইরে এসে আজ আমার চোখে সমাজের কল্যাণ ও অকল্যাণের দুটো দিকই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে। ওর ভিতরে থাকতে এমন করে দোষ ও গুণ দু'দিক দেখতে পাইনি।

ঝিলবাবু নিবিষ্টচিত্তে সবিতার কথা শুনিতেছিলেন, নিজে কথা কহিলেননা? সবিতা বলিতে লাগিলেন, মানুষ নিজের মন নিয়ে কতই না বড়াই করে, কিন্তু কতোটুকুই বা তার পরিচয় যে জানে? জীবনের প্রতি অঙ্কে অঙ্কেই তার রূপ বদলাচ্ছে।

—এই তো সেদিন পর্য্যন্তও মনে ভেবেছি, আমার মতো স্বামীকে ভক্তি জগতে বৃন্নি আর শোনো মেয়েই কখনো করেনি। স্বামীকে আমার মতো এতটা ভালবাসতেও হয়তো অল্প কোনও কেউ পারবেনা। বাইরের পৃথিবী বিপরীত সংবাদ জানলেও, আমার আপন অন্তরের খবর আমি তো ভাল করেই জানি। কিন্তু এতদিন পরে আজ সে-ধারণা বদলে গেছে আমার। আপন অন্তরের মথার্থ অর্থ এতকাল বাদে বুঝতে পারছি।

—আশ্চর্য্য হইয়া ঝিলবাবু বলিলেন,—কী বুঝেচ সবিতা?

কতকটা আত্মগত ভাবেই সবিতা বলিলেন, ঠিক স্পষ্ট করে সেটা বলা শক্ত। আজ শুধু এইটুকুই আমি বেশ বুঝতে পারছি, অন্তরের শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সংস্কারগত ধারণা—আর হৃদয়ের প্রেম একই বস্তু নয়।

—কিন্তু, আমি শুনেছি অনেক সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তিই তো হয়ে দাঁড়ায় প্রেমের ভিত্তি।

—হাঁ, তা' হয়। করুণা মমতা বা সমবেদনাও অনেকক্ষেত্রে হয়তো প্রেমকে গড়ে তোলে। কিন্তু আমার বিশ্বাস নারী ও পুরুষের পরস্পরের মধ্যে ভিতর ও বাহিরে স্বাভাবিক মিল না থাকলে প্রেম ফুটত হলেও সুসার্থক হয়না। তা'ছাড়া আরও একটা কথা। অনেক সময়ে শ্রদ্ধা ভক্তিকে কিংবা স্নেহ মমতাকে মানুষ প্রেম বলে ভুলও করে।

—তুমি কি বলতে চাও স্নেহ বা মমতা হতে যে-প্রেমের উদ্ভব, তা' সত্য কিংবা সার্থক নয়?

—এমন কথা কেন বলবো? নিশ্চয় তা' সত্য এবং সত্য-হলেই সার্থক না হয়ে পারেনা। আমি বলছি,—স্নেহ মনত বার্থ-ই যদি প্রেমে পরিণত হয়, তবেই সত্য। সাগরে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তখন সকল জলই এক, স্বর্ণারজল নদীরজল ও বা, বুটীর জল বজ্রার জলও তাই।

। বিনলবাবু সবিতার গানে স্থির দৃষ্টি স্থানান্তর করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এ সকল কথা তুমি জানলে কেমন করে?

অল্পকণ নিঃশব্দে থাকিয়া সবিতা মুক্ত আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া কহিল, নিজেরই বিড়ম্বিত জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে কেনেচি দ্যায়ময়।

বিনলবাবু প্রশম্পূর্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, বলবো তোমাকে একদিন আমার সমস্ত কথাই।

বিনলবাবু অনুবোধের সুরে বলিলেন, তুমি সমস্ত কথাই অল্প একদিন বলবো বলে সরিয়ে রেখে দাও। কবে তোমার সেই অল্প একদিন আসবে সবিতা? একদিন বলেছিলে তোমাকে আমার স্বামীর সমস্ত কথা শোনাবো। সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ নয়।

সবিতা বলিলেন, বলতে ইচ্ছে হয় কিন্তু—বলা হয়ে ওঠেনা। নিজেকে সম্বরণ করা কঠিন হয় পড়ে। কিন্তু—সে সব কথা শুনে লাভই বা কি? স্বেচ্ছায় স্বামীত্যাগ করে যে-মেয়ে অকূলে ভেসেছে,—স্বামীর প্রতি আজও তার মনোভাব কেমনতরো, জানতে বুঝি কোতুল হয়?

—ছি—ছি,—পরিহাস করেও এমন কথা আনাকে বলা তোমার উচিত নয়, একি তুমি জানোনা সবিতা?

—নি। মাপ করো। তোমাকে অকারণ আঘাত করলাম, আমার অপরাধের শেষ নেই। তারপর অন্তমনস্কচিত্তে সবিতা কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

বি নীরবে একদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশেষে কাটিয়া গেল।

বিমলবাবু ডাকিলেন, সবিতা—

কি বলচ ?—

সত্যি করে বলো, তুমি কি আমাকে ভয় করো ?

—কী জন্ত ভয় ? সবিতা কণ্ঠে বিষয় ধ্বনিত হইল।

বিমলবাবু জবাব দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া সবিতা স্নান হাসিয়া বলিলেন, তোমাকে ভয়ের তো আমার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। কী ক্ষতি থাকি নাছে। এখনো আমার জন্ত ভয় করবো।

বিমলবাবু বলিলেন, জীবনের উপর এতবড় অভিমান আর যে-কেউ কবে করুক, তোমাকে করতে দেবোনা। মানুষের বা কিছু মর্যাদা জীবনের একটা কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনার নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যায়না। যতক্ষণ বেঁচে থাকে মানুষ, ততক্ষণ তার সবই থাকে। কোনও কিছুই কুরিয়ে যায়না।

সবিতা মৌন রহিলেন। কতক্ষণ পরে স্থির গলায় বলিলেন, তোমাকে ভয় একটুও করিনে। বরং তোমার সম্বন্ধে নিজের এই একান্ত নির্ভরতাকেই ভয় করেছি এতদিন। এখন সে ভয়ও কেটেচে। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, সংসারে বুঝি আর কোনো মেয়েই এমন করে কোনও নিঃসম্পর্কীয় পুরুষকে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারেনি।

অল্প থামিয়া কণ্ঠস্থর একটু নিচু করিয়া সবিতা আবার বলিলেন, আমি জানি তুমি কোনওদিন আমাকে নিচে নামাতে পারোনা। পুরুষদের কাছে মেয়েদের অপমান ও অবহেলা যা' হ'তে পারে, তা' তুমি কখনই ঘটতে দেবেনা। সবার চেয়ে বড় কথা, আমাকে বুঝতে তোমার তুল হয়নি।

বিমলবাবু মূহুর্তে কহিলেন, মানুষ মানুষই। দেবতা তো নয়। তার সমস্ত ভালো-বন্দ, দোষ গুণ, বলিষ্ঠতা দুর্বলতা নিয়েই তার সমগ্র রূপ। সুতরাং তার উপরে কি এতটা বেশি বিশ্বাস রাগ সঙ্গত?

—কী সঙ্গত আর কি অসঙ্গত জানিনে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে জানতে চাইওনে। যা' নিজের অন্তরে মধ্যে একান্তভাবে অনুভব করেচি তাই বললাম মাত্র।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমার সংস্পর্শ এসে আমাদের লাভ হয়েছে জানো সবিতা? আমি সর্বপ্রথম অনুভব করেছি, অকল্যাণের ভিতর দিয়েও পরমকল্যাণ এসে জীবনকে স্পর্শ করেছে।

সবিতা বলিলেন, মানি এ কথা আমি। অকল্যাণের পথেই আমার দীর্ঘ চলার ক্রান্ত সীমায় তোমার সঙ্গে হয়ে ছিল হঠাৎ সাক্ষাৎ। হয়েছিল বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে অবাস্তিত পরিচয়। ভাগ্যে জোর করে তুমি সেদিন দেখতে এসেছিলে আমাকে।

বিমলবাবু আহত হইয়া অকৃত্রিম দুঃখিত স্বরে বলিলেন, এ ধারণা তোমার সত্য নয় সবিতা। জীবনের অজ্ঞাতপথে মানুষের সাথে মানুষের নিবিড় পরিচয় কবে কোন্‌দিন কোথা দিয়ে কেমন করে ঘটে যায়, কেউই জানেনা। কথাটা আমি আমার নিজের দিক থেকেই বলেছিলাম। এতদিন নিজের অতীতের অপরিচ্ছন্ন অংশটার পানে তাকিয়ে হয়েছে বিভ্রাট, এসেছে ঘৃণা, ক্ষোভ, লজ্জা। কতবার ভেবেছি, জীবনের অন্তি অসম্পূর্ণ যদি কোনও উপায়ে ধুয়ে সাদা করে ফেলা যেতো! ছিঁড়ে নিশ্চিত করা যেতো স্মৃতির খাতা থেকে ঐ ঘানিময় দিনগুলির পৃষ্ঠা! কিন্তু আজ সর্বপ্রথম মনে হচ্ছে, ভগবান মঙ্গলই করেছেন, ঐ দিনগুলির ছুরপোয়ালির দাগ একে দিয়ে এই জীবনে।

সবিতা মুখ উচু করিয়া বলিলেন, তার মানে?

—বুঝতে পারলেনা? আজ আমার লোভের অন্তিম স্পর্শ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করতে পারবো। নিজের জীবনের এই কলহিত আত্মনায় তোমাকে এনে দাঁড় করাতে পারবোনা আমি। এখানে তোমার উপস্থিতি আগুন নেই যে।

সবিতা অক্ষুট স্বরে কহিলেন, সোনায় কলঙ্ক লাগেনা দয়াময়। কলঙ্কের কণামাত্র স্পর্শে চিরমলিন হয়ে বাই আমরাই, নিকৃষ্ট ধাতু।

বিমলবাবু গভীর দীর্ঘ বলিলেন, আমি তা' একটুও মানিনে। দেগো সবিতা, আর যা কাঙ্ক্ষা করছি হও, আমার জীবনে পরম কল্যাণরূপিনী তুমি। এ কথা মিথ্যা নয়। জীবনে ঘটেছে আমার বহু বিচিত্র নারীর সংস্রব; কিন্তু তোমার সাথে হলো সন্দর্শন। আমার মধ্যে যে সত্য মানুষটি এতকাল ঘুমিয়েছিল, তুমিই তার ঘুম ভাঙিয়ে জাগিয়ে তুললে সেদিন, যেদিন তোমার স্বতঃ অভিজাতপ্রকৃতির আপন স্বরূপ, সেই বিষম স্নান অন্ততাপদগ্ধ অগ্নি সহজ মর্যাদামহিম রূপের প্রথম দর্শনেই চিনতে পারলাম। রমণীবাবুর প্রমোদ-আমন্ত্রণে দেখতে গিয়েছিলাম এক, দেখলাম তার বিপরীত। তোমার জীবনের ইতিহাস আজ আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্র ভুলিয়ে দিয়েছে সবিতা। সংসারে আমারই অনুরূপ অনুরূপিত ঘটেছে এমন মানুষ এই প্রথম দেখলাম, সে তুমি। যে, নিজের প্রকৃতি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবাস্তবিক অন্তর জীবন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। নিজের স্বভাবকে চাপা দিয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাবী মিটিয়ে, আয়ুকে কোনোমতে শেষের পানে টেনে নিয়ে চলা বৈ তো নয়। অনুরূপিত ক্ষেত্রে তুমি আর আমি এইখানে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি। হয়তো এই জন্তই তোমার অন্তরের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা যা' সম্ভবপর ছিল না, তা সম্ভব শুধু নয়, সহজও হয়েছে।

সবিতা নৃত্য মেত্রে নীরবে শুনিতেছিলেন। এখনও অবনত নয়নে মৌনসিঁড়ি।

লিলাধর ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আর আমার কাছে জীবনের অর্থগেছে বদলে। মনের পুরানো ধারণাগুলির উপর থেকে বছদিনের সঞ্চিত পুরু ধুলো নিঃশেষে যাচ্ছে মুছে। দীর্ঘকাল উপেক্ষায় পড়ে থাকা—আয়নার উপরের জমাট ময়লা তা যে স্বচ্ছত্ব আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে যেন আজ কোন্ নব গুল্মাশ্রয় স-মার্জনায়ে একেবারে নিম্নল হয়ে উঠেছে। সনস্ত পৃথিবী আমার তক্কা আঁচুব ঠেকচে আজ। এ যৌবনের উদ্দান হৃদয়াবেগ নয়, দেহের দ্বিগুণ শিরায় তরুণ রক্তের চঞ্চল নৃত্য নয়। এ আনার হিমকঠিন অন্তরলোকে মুচ্ছিত আত্মার জাগরণ। হৃদয়ের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে নবচেতনার প্রথম সূর্যোদয়।

স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী বিমলবারু যে এমন করিয়া আপন অন্তরের গভীর অনুভূতিগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন, সবিতার কল্পনাও ছিলনা। সংসারে বুদ্ধি সব কিছুই সম্ভব। তাই অত্যন্ত ধীরে—প্রায় অস্পষ্ট স্বগতোক্তির মতই সবিতা বলিতে লাগিলেন,—এ তো তোমার নিজের মনের রচনা করা—আমি। ওর সঙ্গে সত্যিকার আমার মিল কতটুকু, সে সন্ধান তুমি জানানো, আমিও জানিনে। নাই থাক্ সে জানাজানি, ভগবান করুন, তুমি যে-আমাকে দেখেছ, সে যেন তোমার কাছে মিথ্যা না হয়।

বিমলবাবু যখন রাখালের খোজ করিতেছিলেন, সে তখন কলিকাতার বাহিরে। রেণু ও ব্রজবাবুকে বৃন্দাবনে পৌছাইয়া দিতে গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া বিমলবাবু সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিমলবাবু অভিযোগ করিলেন, একটা দিন অপেক্ষা করলে আমার সঙ্গে ব্রজবাবুর দেখা হতো। তুমি কেন তার ব্যবহার করলেন রাজু? তোমাকে তো আমি চিঠি লিখেছিলাম।

—ওঁরা যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়াবেন বলেই তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন!

—তার কারণ?

—তা' জানিনা! তবে কাকাবাবুর চেয়ে রেণুই বেশি ব্যস্ত হয়েছিল।

—বুঝেচি।

বিমলবাবু কতক্ষণ মৌন রহিয়া পরে বলিলেন, বৃন্দাবনে কোথায় তাঁদের রেখে এলে?

—গোবিন্দজীর মন্দিরের কাছাকাছি একটা গলিতে। বাড়ীখান বড়, অনেকঘর ভাড়াটে থাকে। এঁরা নিয়েছেন দুখানি শোবার ঘর, একটু রান্নার জায়গা। ভাড়া সামান্যই।

বিমলবাবু চিন্তিতমুখে বলিলেন, তুমি ছাড়া তো তাঁদের দেখাশোনা কেউই রইলোনা। আমার মনে হয়, অন্ততঃ কিছুদিনও এ সময় বৃন্দাবনে গিয়ে তোমার থাকা দরকার।

—কিন্তু তার ফলে আমার জীবিকা যে এখানে অচল হয়ে দাঁড়াবে!

বিমলবাবু নতুনসুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। রাখাল বলিল,—আপনি অদৃষ্ট
মানেন কি জানি না, আমি কিন্তু মানি।

সিয়ালিলেই কথার উত্তর না দিয়া বিমলবাবু বলিলেন, তুমি বোধহয়
শুনেছ—তারক হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। প্র্যাক্টিস বন্ধ হচ্ছে না। মনে হয়
ওর উন্নতি হবেই। ছেলেটির বড়ো ধর্ম্ম আকাজ্জা খুব। অনেক
আশা করেছিলাম, ওর হাতে রেকর্ড দেবো। কিন্তু ব্রজবাবুর সঙ্গে ত
এ বিষয়ে আলোচনারই সুযোগ হল না।

রাখাল বিস্মিত হইয়া বিমলবাবুর পাশে বসিয়াছিল।

বিমলবাবু পুনরায় বলিলেন, তোমার নতুন নামও তাই হচ্ছে ছিল।
শুনলে হয়তো ব্রজবাবুও রাজি হতেন।

রাখাল মৃদুভাবে কহিল, কিন্তু তারক কি রাজি হয়েছে?

—তাকে এখনো বলা হয়নি। তবে তোমার নতুন নাম তাকে আভাসে
কতকটা জানিয়ে রেখেচেন।

রাখাল আবার বলিল, আপনার কি মনে হয়, সে এ প্রস্তাবে সন্মত
হবে?

বিমলবাবু বলিলেন, সন্মত না হবার তো কারণ দেখি না। রেণু সকল
দিক দিয়েই যোগ্যপাত্রী। একমাত্র ত্রুটি, তার বাপ এখন দরিদ্র। কিন্তু
মায়ের যা কিছু আছে, রেণুই পাবে। তারক নিজে তোমার নতুন
নামকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাঁরই কাছে সে রয়েছে, সুতরাং কোনও
দ্বিধা দিয়েই তার অমত করার কারণ দেখা যায় না।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, তোমাকে
একটি কাজ করতে হবে।

রাখাল বলিল,—কি বলুন।

—তারকের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাবটা তোমাকেই তুলতে হবে।

রাখাল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, আপনি কি শোমেননি, কেন বিবাহ করতে একেবারেই অসম্মত।

—তাকে রাজি করাবার ভার আমার। তুমি তারকে কাছে টাউ উত্থাপন করে তার মতামতটা আমাকে জানালে, আমি নিজে বুদ্ধি বনে গিয়ে রেণুকে সম্মত করিয়ে আসতে পারবো।

রাখাল বলিল, আপনি ভুল করেন। রেণু বা তারক কেউই এ বিবাহে সম্মত হবে বলে মনে হয়না।

বিমলবাবু বলিলেন—এ রেণু কথা থাক। তারক কেন রাজি হবেনা বলেত ?

—সে আমি—কি করে বলবো ? তবে সম্ভবতঃ হবেনা বলেই মনে হয়।

—তুমি একবার প্রস্তাব করেই দেখনা

—আচ্ছা।

বাসায় ফিরিয়া বাহিরের পরিচ্ছদ না ছাড়িয়াই বিছানার উপর লম্বা হইয়া রাখাল শুইয়া পড়িল। চক্ষু বুজিয়া সম্ভব অসম্ভব কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে থাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল খেয়াল রহিলনা।

বুড়ী নানী কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছে। কাজ করিতে আসিতে পারেনা। তার দৌহিত্রকে কাজে পাঠায়। নানীর নাতির বয়স বেশী নয়। বছর তেরো চৌদ্দ হইবে। নাম নীলু। খুব হাসিখুশি স্মৃতিবাজ ছেলেটি, সর্বদা কণ্ঠে গুন গুন করিয়া গানের সুর লাগিয়াই আছে। কাজকর্ম বেশ চটপট করিতে পারে। তবে, প্রায় প্রতিদিনই রাখালের দুটা একটা চায়ের পেয়ালা দিриচ, না হয় কাচের প্লেট বা কাচের গ্লাস তার হাতে ভাঙিয়া থাকে। যখন সে অপ্রতিভ মুখে লম্বা জিভ কাটিয়া রাখালের সম্মুখে

আসিয়া দাঁড়ায়, রাখাল তাহার চেহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারে আজ আবার কাছে জিনিস একটা গেল। কাচের ভাঙা টুকরাগুলি সাবধানে ফেলিয়া দিতে খলিয়া রাখাল তাহাকে ভবিষ্যতে ক্লাচের সামগ্রী মতকভাবে নাড়াচাড়া করিবার মত্পদেশ দেয়। তৎক্ষণাৎ প্রবলভাবে মাথা হেলাইয়া সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া আবার তিন লাফে নীলু ছুটিয়া চলিয়া যায়। রাখাল তাহার নানী বুড়ির নাতিকে আদর করিয়া ডাকে—নীলু থুড়ো।

বেলা চারটার সময় নীলু আসিয়া এখন রাখালকে ডাকিয়া জাগাইল, চোখ রগড়াইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার খেয়াল হইল, আজ খাওয়া হয় নাই। বিনলবাবুর সহিত দেখা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া কাপড়-জামা না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়াছিল, কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে টের পায় নাই।

ঘড়ির গানে চাহিয়া রাখাল নিজের 'পরে বিরক্ত হইল। আজকাল তাহার যেন কী হইয়াছে। ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, বেশভূষা, শরীর-স্বাস্থ্য কোনও দিকে আর মনোযোগ নাই। এমনকি সবদিন খাওয়াদাওয়ারও খেয়াল থাকেনা তার। এ ভাল নয়। গরীব মানুষ সে। এ রকম খামখেয়াল বড়মানুষদেরই সাজে। যাদের প্রতিবারের পেটের অন্ন প্রতিদিনের উপার্জনের উপর নির্ভর করে, তাদের এ অস্থমনস্কতা শোভা পায়না। বারংবার সুদীর্ঘ কামাই করার দরুণ তাহার টিউশনীগুলি একে একে গিয়াছে। কেবল একটিমাত্র টিউশনী আজও কোনওক্রমে টিকিয়া আছে, সে কেবল রাখাল তাহাদের সময়-অসমনয়ের একমাত্র বিশ্বস্ত কাজের মানুষ বলিয়া। টিউটররূপে তাহার মূল্য না থাকিলেও, বন্ধু হিসাবে, বিশ্বস্ত কাজের লোক হিসাবে মূল্য আছে। নিজের লেখাপড়ার কাজও এইসব রকমটে বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। যাত্রার পালা লেখা ও বেনামীতে নাটক রচনায় বহুদিন আর হাত দিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের ও

পোষ্ট অফিসের পাশ বহিতে জমার ঘর শূন্য হইয়া আসিয়াছে। খাবারের দোকানে, মুদ্রীর দোকানে এবং গোয়ালার কাছে কিছু কিছু টাকা বাকি পড়িয়াছে। যদিও সে, আজকাল আর নিজের পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিচ্ছদের সৌখীন বিলাসে একেবারেই মনোযোগী নয়,—তবুও দর্জি ও ধোবার বিল বোধহয় বেশ কিছু জমিয়াই আছে।

নীলুর ডাকে রাখাল উঠিয়া ‘মুখ ধুইতে ধুইতে বলিল,—নীলুখুড়ো, ঠোত্‌টা ধরিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত চায়ের জলটি চড়িয়ে দাও দিকি।

নীলু ঘরের সম্মুখে দালানে এঁটোবাসন দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইয়া রাখালের নিকটে আসিয়াছিল। উদ্ভিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, আপনার কি অসুখ করেছে?

রাখাল তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—কে বললে রে?

—কিছু খান্নি যে!

রাখাল হাসিয়া বলিল, না, অসুখ করেনি। এমনিই আজ খাইনি। তুমি এখন একটা কাজ করো তো নীলুখুড়ো! চায়ের জলটা চড়িয়ে দিয়ে ঐ মোড়ের দোকান থেকে গরম শিঙাড়া কিছু নিয়ে এসো। চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।

নীলু ঠোত্‌ জালিয়া চায়ের জল বসাইয়া খাবার আনিতে চলিয়া গেল, রাখাল চা তৈয়ার করিতে বসিল। একবার মনে হইল, এত হাস্যামা না করিয়া সারদার কাছে গিয়া বলিলেই ত’ হয়—আজ অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভাত খাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে। বাস্, তার পরে আর কিছু ভাবিতে হইবেনা।

কল্লনায় সারদার স্তম্ভিত ক্রুদ্ধ মুখের অন্তরালে যে ব্যাকুল স্নেহের সংগুপ্তরূপ রাখালের চোখে ভাসিয়া উঠিল, তাহা স্মরণ করিয়া বুকের ভিতর হইতে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। না, সারদার

নিকট যাওয়া উচিত নয়। বেচারী নিরুপায় বেদনায় মর্স্যাহত হইবে মাত্র। রাখাল জানে, সারদার কী বিপুল আকাঙ্ক্ষা, দেবতাকে নিজের হাতে সেবায়ত্ত করিবার। উন্মাদচিত্তে চায়ের সবজ্ঞান লইয়া রাখাল পেয়ালায় চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

সারদা ও সবিতাতে আলাপ চলিতেছিল। সবিতা বলিলেন, তোমাদের সোনাপুরের গল্প বলো সারদা, শুন।

সারদা হাতে সেলাইয়ের কাজ করিতে করিতে জবাব দিল,—
আপনাকে যে একবার দেখেছে না, তাকে আর টিনিয়ে দিতে হবেনা যে, রেণু আপনারই মেয়ে!—কেবল চেহারাতেই সে আপনার মেয়ে হয়নি, বুদ্ধিতে, মর্যাদাশীলতায়, মনের অভিজাত্যে সে আপনারই প্রতিচ্ছবি।

সবিতা বলিলেন, সারদা, এমন ক'রে কথা কহিতে শিখলে তুমি ক'র কাছে? এ'তো তোনার নিজের ভাষা নয়!

সারদা লজ্জিত হইয়া মাথা অবনত করিল।

—রেণুর সম্বন্ধে এ সকল কথা তুমি আর কারো সাথে আলোচনা করেচ বুঝি?

সারদা সলজ্জ সঙ্কোচে বলিল, হ্যাঁ। সোনাপুরে দেবতার সঙ্গে রেণুকে নিয়ে আমাদের আলোচনা হতো।

সবিতা হাসিয়া সারদার মাথায় পিঠে সম্মেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, আমি জানি।

সারদা উৎসাহিত হইয়া বলিল, সত্যি মা, এত বেশি সাদৃশ্য বড় দেখা যায়না! রেণু যেন একেবারে আপনারই ছাঁচে গড়া।

সবিতা ব্রহ্মগলায় বলিয়া উঠিলেন,—না না, এমন কথা মুখে এনোনা সারদা, আমার মতন যেন কিছুই না হয় তার।

সারদা একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আচ্ছা, ওকথা থাকুক এখন।
কাকাবাবুর গল্প করি, কেমন?

সবিতা বলিলেন—বলো।

—কাকাবাবু মানুষটি বড় ভাল, কিন্তু মা সংসারে থেকেও তিনি
সংসার-উদাসীন। গোবিন্দ—গোবিন্দ করেই পাগল। ইহ-সংসারে
গোবিন্দ ছাড়া কিছুই প্রতি তাঁর আসক্তি আছে বলে মনে হয়না।

সবিতা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, নিজের মেয়ের প্রতিও না?

সবিতার শঙ্কাকুল মুখের পানে তাকাইয়া সারদা কৈফিয়তের সুরে
বলিল,—তিনি সংসারের সকল ভাবনা ইষ্টদেবের পায়ে সঁপে দিয়েছেন।
তাঁর মেয়েও বোধহয় তার বাইরে নয় মা।

সবিতা পাষণ প্রতিমার কায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

সারদা সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আকুলি ব্যাকুলি করেও তো মানুষ
নিজে কিছুই পারেনা। তার চেয়ে ভগবানের উপরে নির্ভর করে থাকাই
তো ভালো মা।

সবিতা আর্ন্তকণ্ঠে বলিলেন, সারদা, তুমি বুঝবেনা। তুমি নিজে সন্তানের
মা হওনি যে! সন্তান যে কী, তা' পুরুষ মানুষ বোঝেনা, যে-মেয়েরা
মা হয়নি, তারাও ঠিক বুঝতে পারেনা। রেণুর সম্বন্ধে আজ আমি কি
করে তোমার কাকাবাবুর মত নিশ্চিত থাকবো? চব্বিশ ঘণ্টা ওই
গোবিন্দ—গোবিন্দ করে দিনপাত করাতেই ত' সংসারের সর্বনাশ
ঘটেচে, ব্যবসার সর্বনাশ ঘটেচে। এখনও কি চৈতন্য হোলোনা?
মেয়েটার মুখ চেয়েও ধর্মের ঝোঁক থেকে এখনও একটু নিবৃত্ত হতে
পারলেননা?

সারদা ভীতচখে সবিতার আরক্তিম মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।
সবিতা উত্তেজিত অথচ অত্যন্ত মৃদুগলায় বলিতে লাগিলেন, এতকাল

ভাবতাম আমার স্বামীর মত স্বামী কখনো কারো হয়নি, হবেনা। এখন আমার সে ভুল ভেঙেচে। এখন বুঝেচি, আমার স্বামীর মত আত্মসমর্পণ মাত্রা সংসারে অল্পই। নিজের স্ত্রী নিজের সম্বন্ধে প্রতিও যে-মানুষ অচেনার মত উদাসীন, এমন মাত্রার কী প্রয়োজন ছিল বিবাহ করার! বিবাহও করেছেন ওঁর গোবিন্দেরই তত্তা। বুকলে সারদা, তোমরা বাকি ওঁর মহত্ব বলে ভাবো, সেটা ঠিক তার উল্টো।

—ক'র মহত্ব উল্টো, নতুন-মা? রাখাল ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল।

সবিতা ঘাট ফিরাইয়া শান্তগলায় বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর।

মূহূর্ত্তনধ্যে রাখালের হাস্যপ্রসন্ন মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সবিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, আমার রাজু তার কাকাবাবুর এতটুকু নিন্দে সহিতে পারেনা।

রাখাল গম্ভীর মুখেই বলিল, সেটা তো একটুও আশ্চর্য্য নয় মা। সংসারে কাকাবাবুরও যে নিন্দে হতে পারে, এইটাই কি সব চেয়ে আশ্চর্য্য নয়?

সবিতা বলিলেন, রাজু, আমি তোর কাকাবাবুর নিন্দে করিনি। কিন্তু আজ যে—

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আর কিছু বলবেননা মা। আমি আগেকার মানুষ, আগকের খবর জানিনে, জানতে চাইওনে। যেটুকু আগের খবর জানি সেটুকু পাছে ভেঙে যায় সেই ভয়েই এখন সশঙ্ক হয়ে আছি।

সবিতা ক্ষণকাল রাখালের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, —পাগল ছেলে, (এক কালের জানা কখনও চিরকালের হতে পারেনা। জোর করে তা' করতে গেলে, হয় চোখ বুজে অন্ধ হয়ে থাকতে হয়, না হয়

চরম ক্ষতির দুঃখ ভোগ করতে হয়।) সংসারের এই নিয়ম।—সবিতার কণ্ঠস্থের গভীর স্নেহ উৎসারিত হইল।

রাখাল আর কথা কহিল না। সারদা উঠিয়া বাইতেছে দেখিয়া তাকে জিজ্ঞাসা করিল, তারক এখন বাড়ী আছে কি জানো সারদা?

সারদা বলিল, আজ তো কাছারী নেই। 'সম্ভবতঃ' নিচেয় তাঁর আফিস-কামরাতেই আছেন।

রাখাল বলিল, তারকের সাথে একটু দরকারী কথা আছে। আমি চললাম নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন,—চা গেয়ে যেও রাজু। সারদা, তুমি যে কচুরী তৈরি করেছো, রাজুকে চায়ের সঙ্গে দিতে ভুলোনা।

সারদা হাসিমুখে বলিল, সে তো উনি খেতে চাইবেননা মা, খেলেও নিন্দেই করবেন।

রাখালের মন আজ ভাল ছিলনা। অন্তঃসময় হইলে সারদার এই কথা লইয়াই হয়তো তাকে ক্ষেপাইবার জন্ত অনেক কিছু বলিত। চিন্তা আজ অগ্রসর বলিয়াই বোধহয় বিরসকণ্ঠে বলিল, না, ঘরের তৈরি খাবার খাওয়া আমার অভ্যাস নেই সারদা, ইচ্ছেও নেই। বাঁদের জন্ত তৈরি করেছো, তাঁদেরই খাইয়ো।

সারদা বিস্মিত নয়নে রাখালের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার বিবর্ণ মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ানাত্র রাখালের মনের মধ্যে বেদনা ধ্বং করিয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা সারদার পানে তাকাইয়া সম্ভ্রম সাহসনার স্বরে বলিলেন, ওর কথায় মনে দুঃখ পেওনা সারদা। আমার 'পরে' রাগ করেইও তোমাকে কঠিন কথা শুনিয়া গেল। নানা কারণে রাজুর মনের অবস্থা এখন ভালো নেই মা।

অকারণে আকস্মিক ভৎসিত হইয়া সারদা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।
সবিতার সাধনাবাক্যে রুদ্ধ বেদনা সংদম মানিলনা। হঠাৎ বর বর করিয়া
ছুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অশ্রুপ্লাবিত সারদা আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল,—আমি কী দোষ
করেছি মা, দেবতা যখনই যার উপরে রাগ করেন, আনাকেই বিঁধে বিঁধে
কঠিন কথা শুনিতে চলে যান!

সারদাকে কাছে টানিয়া লইয়া সবিতা বলিলেন, ওখে তোনাকে
আপনতঃ ভালই মনে করে না। তোনাকে সত্যিকারের মনে করে বলেই না
তোনার পরেই ওর যত আঘাত! ওর যে আপন বলতে সংসারে
কেউ নেই সারদা।

সারদার উবেলিত অশ্রুধারা তখনও সংবত হয় নাই। বাষ্পরুদ্ধ
কণ্ঠে অভিমানের স্বরে বলিল, আমারই যেন সংসারে সব-কেউ আছে
মা। আমি তো কই যখন তখন কাউকে এমন করে কথার খোঁচায়
বিস্মনে!—

সাবিতা হাসিয়া বলিলেন, সকলের প্রকৃতি তো সনান হয়না মা!

সারদা বলিয়া, উনি জানেন, আমি সবকিছু সহিতে পারি কিন্তু গুঁর
ঐ একটা বিদ্রোহ কিছুতেই সহ্য করতে পারিনে! এ জেনে শুনে তবুও
উনি আনাকে এমন করে বলেন।

সারদা চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল।

২

রাখাল তারকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সেক্রেটারিয়েট
টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট তারক মোকদ্দমার কাগজপত্র
দেখিতে অধিনিবিষ্ট। রাখালের জুতার আওয়াজে অল্প নাথা তুলিয়া
তাকাইতে গিয়া চকিত হইয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, একি! রাখাল যে!

টেবিলের কাছাকাছি একখানি চেয়ারে বসিতে বসিতে রাখাল বলিল,
কেন, আসতে নেই নাকি ?

—থাকবেনা কেন, আসোনা বলেই তো আসায় আশ্চর্য্য হচ্ছি।

—আসি তো প্রায়ই।

—তা' জানি। কিন্তু সে তো আমার কাছে নয়। অন্তর মহলে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, অন্তরেই ডাক পড়ে, তাই সেখানে আসি।

তারক রহস্ততরল কণ্ঠে কহিল, আজ কি সদর থেকে ডাক
পেয়েছো নাকি ?

—না, আজ সদরকে আদায়ই প্রয়োজন।

—নিশ্চয় কোনও মামলার ব্যাপার নয় আশাকরি।

—মামলাই বটে। দুনিয়ায় কোন্ ব্যাপারটা মামলার অন্তর্গত নয়
বলতে পারো ?

তারক হাসিতে লাগিল।

রাখাল বলিল, শুনলাম, বেশ ভালো রকম প্র্যাক্টিস্ হচ্ছে তোমার।

মুহূঃ ক্রকুন্ধিত করিয়া তারক বলিল,—তোমাকে কে বললে ?

—যেই বলুক, কথাটা তো সত্যিই। এবার ~~কিছু~~ জনেদের মধ্যে
মিষ্টান্ন বিতরণের ব্যবস্থা করো একদিন।

তারক বলিল, পাগল হয়েচো তুমি। কোথায় প্র্যাক্টিস্ ? এখন
তো শুধু সিনিয়রের দরজায় ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকা, আর তাঁর যত কিছু
খাটুনির বোঝা গাধার মতন বওয়া।”

রাখাল বলিল, তাই নাকি ?—তা'হলে বিমলবাবু ভুল বলেচেন
বোধহয়।

তারক চকিত হইয়া বলিল, বিমলবাবু তোমাকে একথা বলেচেন
নাকি ?

—হ্যাঁ।

—তাঁর সঙ্গে কবে দেখা হোলো? কি বলেছেন বলত? তারকের কণ্ঠস্থের আগ্রহ ফুটিয়া উঠিল।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে অনেক কথা। তুমি এখন ব্যস্ত রয়েছে। শোনবার সময় হবে কি?

—হবে—হবে। তুমি বলো।

তারকের চোপে-মুখে ব্যগ্র কৌতূহল লক্ষ্য করিয়া রাখাল মনে মনে হাসিলেও মুখে নির্বিবকার ভাব বজায় রাখিয়া বলিল,—চলো মাননের পার্কে বসে কথা কইগে।

তারক বলিল, বেশ, তাই চলো।

ব্রীফের তাড়া ফিপ্র হস্তে গুছাইয়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে তারক বলিল, —বোসো, বাড়ীর ভিতর গিয়ে একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি। চা পেয়ে ঐক্ধারেই বেকনো যাবে।

রাখাল বলিল, আমি যে এইমাত্র বাড়ীর ভিতরে বলে এসেছি, চা খাবোনা।

তারক সংক্ষেপে বলিল, তাহোক। চায়ের ব্যাপারে ‘না’ কে ‘হ্যাঁ’ করলে দোষ নেই।

তারক দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে রাখাল দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

গায়ে, মুগার পাঞ্জাবী পায়ে গ্রিসিয়ান শ্লিপার চড়াইয়া তারক ফিরিয়া আসিল। তার পিছু পিছু কি ট্রে’তে করিয়া চা এবং দুই প্লেট্ কচুরী লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। রাখাল বিনা বাক্যব্যয়ে চায়ের পেয়ালা ও কচুরীর প্লেট্ তুলিয়া লইয়া সদ্যবহার সজ্জা করিয়া দিল। অল্প সময়েরই মধ্যে প্লেট্ শূন্ত করিয়া বলিল, তারক, তোমাদের চা-দায়িনীকে একবার স্মরণ করতে পারো?

তারক চায়ে চুমুক দিতে দিতে দিতে হাঁকিল,—শিবুর মা,—এদিকে শুনে যাও,—

ঝি আসিলে রাখাল বলিল, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বলো, রাজ্জুবাবু আরও খানকয়েক কচুরী খেতে চাইছেন।

ঝি চলিয়া গেল। তারক খাইতে খাইতে হাসিয়া বলিল, রাজ্জুবাবু খানকয়েক কচুরী খেতে চাইছেন শুনলে এখনি এক ঝুড়ি কচুরী এসে পড়বে কিন্তু বাড়ীর ভিতর থেকে।

রাখাল দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলিল, আর তারকবাবু খেতে চেয়েছেন শুনলে একগাড়ী কচুরী আসবে বোধ হয়?

—কচুরীর ‘ক’ও আসবে না! শুধু সংবাদ আসবে, ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে গরম কচুরী এখনি কিনে আনিয়া দেওয়া হচ্ছে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।

রাখাল হাসিয়া ঝুটুটি করিল। বলিল,—তাই নাকি?

তারক বলিল—একটুও বাড়িয়ে বলিনি।

আধঘোমটা টানা প্রোটা দাসী শিবুর মা অহেতুক অতি-সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া এক প্লেট গরম কচুরী আনিয়া রাখালের সামনে ধরিয়া দিল। তারক হাসিয়া বলিল, দেখলে তো? একেবারে উজ্জন হিসেবে এসে গেছে।

রাখাল মুহূ হাসিয়া শিবুর মাকে উদ্দেশ্যে করিয়া বলিল, আমি তো রান্ধস নই বাছা। এতগুলো কচুরী এনেছ কেন?—তা’ এনেছো বখন, খাচ্ছি সবগুলিই। কিন্তু, কচুরি তুমি বাপু ভালো তৈরি করতে পারোনি, বুঝলে? যা’ ঝাল দিয়েছ’—পেটের ভিতর পর্য্যন্ত জ্বালা করছে। একটু ঝালটা কম দিলেই ভালো করতে—

শিবুর মা অবগুণ্ঠনটি আরও খানিক টানিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া অশ্রুট কণ্ঠে কহিল,—কচুরী ত’ আমি তৈরি করিনি। দিদিমণি করেছেন।

—ও ! তাই কচুরীতে এত ঝাল !

তারককে লইয়া রাখাল যখন পার্কে গিয়া বসিল, অপরাহ্ন হইয়াছে ।

তারক বলিল, বহুদিন বাদে তোমার সঙ্গে পার্কে বেড়াতে আসা হল আজ ।

প্রত্যুত্তরে রাখাল একটু শুষ্ক হাসিল । তারক তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ঈর্ষ্য অশ্রুচন্দ্র অল্পভব করিলেও বাহিরে সহজভাবে বজায় রাখিয়া বলিল,—হ্যাঁ, কি বলবে বলছিলে ? বিমলবাবুর কাছে তুমি কি শুনেছ আমার সম্বন্ধে ?—

রাখাল বলিল, শুনেচি, তুমি খুব ভালো কাজকর্ম করছো । তোমার ভবিষ্যৎ অতিশয় উজ্জ্বল । তোমার মত উद्यোগী ও পরিশ্রমী যুবার জীবনে উন্নতি অনিবার্য ।

রাখালের কণ্ঠে বিদ্রূপের স্বর না থাকিলেও তাহার বলিবার ভঙ্গীতে তারক উহাকে উপহাস বলিয়াই মনে করিল । ভিতরে ভিতরে অলিয়া গেলেও বাহিরে শান্তভাবেই বলিল, তোমাকে ডেকে বিমলবাবুর হঠাৎ এসব কথা বলার মানে কি ?

—তা' কী করে জানবো !

তারক গম্ভীর হইয়া পড়িল । জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর কিছু বলবার আছে কি ?

রাখাল বলিল, আছে ।

—সেটা বলে ফেলো । বিকাল বেলায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে পার্কে হাওয়া খাওয়ার উপযুক্ত বড়মামুষ আমি নই । দেখেইচ ত তুমি, কাজ ফেলে রেখে উঠে এসেচি ।

তারকের উদ্ভাষ রাখাল হাসিল । বলিল, ওকালতী পেশা যাদের,

তাদের অতো অধৈর্য্য হতে নেই হে। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল,—
একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্তই তোমায় এখানে ডেকে
আনলাম তারক !

তারক নির্বাক রহিল।

রাখাল গম্ভীর মুখে বলিল, তোমার বিবাহের প্রস্তাব এনেচি।

রাখালের মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তারক বলিল,—
পরিহাস করচো ?

—পরিহাস করবার জন্ত তোমার কাজের ক্ষতি করে
এখানে ডেকে আনিনি। সত্যিই আমি তোমার বিবাহের প্রসঙ্গ
তুলতে এসেচি।

—তা'হুল ওটা আর না তুলে এইখানেই সাদ করে ফেলা ভালো।
কারণ, বিবাহ করার মত সঙ্গতি ও সন্মতি কোনোটাই আমার হয়নি।
দেবী আছে।

রাখাল বলিল, ধরো এ' বিবাহে যদি তোমার সঙ্গতির অভাব শূন্য
হয়ে যায় !

—তা'হলেও নয়। কারণ, আমি নিজে উপার্জনশীল না হওয়া
পর্যন্ত বিবাহের দায়িত্ব নিতে নারাজ।

—ধরো এ-বিবাহ দ্বারা যদি তোমার উপার্জনের দিক দিয়েও সম্ভব
উন্নতি ঘটে ? তা'হলে তো আপত্তি নেই ?

তারক সন্দেহ নয়নে রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—পাত্রীটি
কে ? কোনও উকীল-ব্যারিষ্টারের মেয়ে বুঝি ?

—না। নিতান্ত সঙ্গতিহীন নিরাশ্রয়ের কন্যা।

—তবে যে বললে—এ বিবাহে—

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। দরিদ্রের কন্যা বিবাহ করেও, সম্পত্তিলাভ

একেবারে বিচিত্র নয়। ধরো, তার কোনো ধনী আত্মীয়ের বাবতীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে—

—কে সে মেয়েটি ?

—তুমি রাজী কিনা আগে বলো।

—পরিচয় না জেনে বলতে পারবনা।

—কি পরিচয় চাও, জিজ্ঞাসা করো। মেয়ের বংশপরিচয়, রূপ, গুণ, শিক্ষা ?—

তারক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, ভাবীপত্নী সম্বন্ধে সবই জানা দরকার।

রাখাল অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—পাত্রী সুন্দরী বললে অল্প বলা হবে, পরমাসুন্দরী। গুণবতী বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছে। পিতা এককালে ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন বটে, বর্তমানে কপর্দকশূন্য। পিতৃ সম্পত্তি না পেলেও পাত্রী মাতৃদ্বয়ের অধিকারিণী। সে ধনের পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নয়। কুলে মেলে বর্ষে গোত্রে তোমাদেরই পাল্টি ঘর। সকল দিক দিয়ে যে কোনও সুপাত্রের যোগ্য পাত্রী।

—পাত্রীর পিতার নাম, ধাম ও উপস্থিত পেশা কি জানতে পারি ?

—তারই উপরে কি তোমার মতামত নির্ভর করছে ?

—না,—হ্যাঁ, তা সম্পূর্ণ না হোক, কতকটা নির্ভর করে বৈকি !—

রাখাল আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, পরে আন্তে আন্তে বলিল, পাত্রীর পিতা তোমার অচেনা নয়। আমি ব্রজবিহারীবাবুর মেয়ের কথা বলছি—

তারক চমকাইয়া উঠিল। বলিল, সে কী ? তুমি কোন্ মেয়েটির কথা বলছো ?

—রেণুর।

—তুমি কি উন্মাদ হয়েছে রাখাল? তারকের কণ্ঠে তীব্র বিষ্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

রাখাল তারকের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—উন্মাদ হলে তো ভালো হতো। কিন্তু হ'তে পারছি কি?

উত্তেজিত কণ্ঠে তারক বলিল, হ'তে আর বাকীই বা কি?—নইলে নতুন-মার মেয়ে রেণুর সঙ্গে কখনো আনার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারো?—

রাখাল বলিল, তা, এতে তোমার এত বিস্মিত বা উত্তেজিত হওয়ার কী আছে?

—যথেষ্ট আছে! এ' নিশ্চয় তোমার ষড়যন্ত্র!—তুমি নতুন-মাকেও বোধ হয় এই পরামর্শ দিয়েচো।

রাখাল নির্লিপ্তভাবেই বলিল, না। আমার পরামর্শের অপেক্ষা রাখেননি। ওঁরা বহুপূর্ব থেকেই রেণুর জন্ত তোমাকে পাত্র নির্বাচন করে রেখেছেন। আমি জানতামনা এ খবর।

তারক দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেই পারে না।—মিথ্যে কথা।

রাখাল স্থির স্বরে বলিল, দেখ তারক, তুমি বেশ জানো, আমি মিছে কথা বলিনে।

তারকের চড়া গলা এবার নিম্নগ্রামে নামিয়া আসিল। বলিল,—তুমিই কেন রেণুকে বিবাহ করো না।

রাখাল উত্তর দিল, আমি যোগ্যপাত্র নই। রেণুর অভিভাবকেরা একথা জানান।

তারক সবিস্ময়কণ্ঠে বলিল—আর হতভাগ্য আমিই বুঝি হলাম সবরকমে তাঁদের কন্ঠার অযোগ্যপাত্র?

—তুমি পাশকরা বিধান ছেলে। বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান।

—হ্যাঁ, অনেকগুলি বাণ তো ছুঁড়ে নারলে, কিন্তু এটা কি বিবেচনায় এলোনা যে, ঐ নেয়েকে আমি আমার পিতৃবংশের কুলবধূরূপে গ্রহণ করতে পারিনি। গরীব হতে পারি, কিন্তু মর্যাদাহীন এখনো হইনি।

রাখাল ক্রোধস্তম্ভিত কণ্ঠে হাঁকিল—তারক,—

—সত্য বলতে ভয় করবো কিসের জন্তে? তুমি নিজে কি ঐ মেয়েকে বিয়ে করে আনতে পারো?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তারকের পানে তাকাইয়া রাখাল বলিল,—সেই মেয়েরই মায়ের আশ্রয়ে থেকে, তাঁরই সাহায্য নিয়ে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে বুঝি তোমার বংশমর্যাদা ও কোলিন্যের গৌরব উজ্জ্বল হয়ে উঠছে?—তারক, নিজের মনুষ্যত্বকে দলিত করে যদি উন্নতির রাস্তা তৈরি করো, সে উন্নতি তোমাকে অবনতির অতলেই ঠেলে নিয়ে যাবে জেনো।

তারক ফিপ্তের মত লাকাইয়া উঠিল। বলিল,—শাট্ আপ। মুখ সামলে কথা কও রাখাল। তুমি জানো কি এদের প্রত্যেকটি পয়সা আমি হিসেব করে শোধ করে দেবো? এই সর্ব্বেই আমি কর্ত্ত্বরূপে এ সাহায্য গ্রহণ করেছি ওঁদের কাছে।

রাখাল হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওঃ, তাই নাকি? তবে আর কি? কর্ত্ত্ব শোধ যখন করে দেবে, তখন ওঁদের সঙ্গে তোমার কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক আর কী থাকতে পারে। কি বল? নাহয় কিছু সুদ ধরে দিলেই হবে।

তারক রুদ্ধ গলায় বলিল, দেখো রাখাল, এসব বিষয় নিয়ে বিক্রপ কোরনা। নিজে যা' পারোনা, অত্বে তা করবার জন্ত বলতে তোমার লজ্জা করেনা?

সে কথাটির জবাব না দিয়া রাখাল বলিল, তোমার সম্বন্ধে তাহলে দেখছি ভুল করিনি। আমি জানতাম তুমি এই রকমই কিছু বলবে।

তবু, বখন শুনলাম, নতুন-মা নাকি তোমাকে এ সম্বন্ধে আগেই একটু জানিয়ে রেখেচেন, তখন আশা করেছিলাম, হয়তো বা তোমার অমত না-ও হতে পারে !

তারক দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নতুন-মা কোনও দিন এমন কথা আমাকে বলেননি, বলতে সাহসও করবেননা জেনো। তিনি জানেন, তারক রাখাল নয়। এ-প্রস্তাব রাখালের কাছে করতে পারেন, কিন্তু তারকের কাছে নয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তারক দ্রুতপদে হন্ হন্ করিয়া পার্ক হইতে বাহির হইয়া গেল।

বৎসর ঘুরিয়া নূতন বৎসর আসিয়াছিল ; তাহাও আবার শেষ হইতে চলিল । সংসারের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছে অনেক ।

বিনলবাবু শেষবার সিঙ্গাপুরে গিয়া প্রায় দেড় বৎসর আর কলিকাতায় ফিরেন নাই । এই বছর-দুইয়ের মধ্যে রাঞ্চালকে প্রায় বার সাতেক ছুটিতে হইয়াছে বৃন্দাবনে । ইহাতে তাহার নিজের ক'জ-ক'র্মের ক্ষতি হইয়াছে বথেষ্ট । দিনের দিন সে ঋণজালে জড়াইয়া পড়িতেছে ; অথচ উপায় কিছু নাই ।

রেণুদের আর্থিক সাহায্য করিবার জন্ত সবিতা নানা উপায়ে বহু চেষ্টাই করিয়াছিলেন, সফল হন নাই । প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা মূল্যের যে-সম্পত্তি মাত্র একবটি হাজার টাকায় রনণীবাবুর সাহায্যে তিনি নিজের নামে খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা রেণুরই উদ্দেশে । ঐ সম্পত্তি খরিদকালে, নয় হাজার টাকা রনণীবাবুর নিকট হইতে সবিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন এই সূত্রে যে, সম্পত্তিরই আয় হইতে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হইবে । উচ্চহারের সুদ সনেত নয় হাজার টাকা রনণীবাবুকে, সম্পত্তির আয় হইতে একযোগে পরিশোধ করাও হইয়া গিয়াছে । কিন্তু বাহার জন্ত এত আয়োজন, সেই-যখন সম্পত্তি স্পর্শ করিলনা এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন যে স্পর্শ করিবে এরূপ আশাও রহিলনা, তখন সবিতা একেবারেই ভাঙিয়া পড়িলেন । তিনি নিজের সমস্ত অলঙ্কার, ব্রজবাবুর শিল্-মোহর করা সেই গহনার বাস্তু সনেত ব্যাঞ্জে গচ্ছিত রাখিয়াছেন রেণুরই নামে । কিন্তু, আকাশ-কুসুম রচনার ক্ষমতা নাই যে তাঁহার বুথা হইতে চলিয়াছে !

মনে করনা করিয়াছিলেন, উচ্চশিক্ষিত, চরিত্রবান্, স্বাস্থ্যসবল বুকের হস্তে কত্কা অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া, আপনার সমস্ত অর্থ-সম্পদ যৌতুক দান করিবেন। সে অর্থ তো রেণুরই পিতৃধন। তাহারই পিতৃ-প্রদত্ত ও নাতামহপ্রদত্ত যে বহুমূল্য অলঙ্কার রাশি, দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস্ত্বেই আবদ্ধ রহিল, কোনওদিন সবিতার অঙ্গে উঠিগনা,—এতদিন আশা ছিল, তাহা বুঝি সার্থক হইবে নবোঢ়া রেণুকে অলঙ্কৃত করিয়া। বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহার প্রাণাধিকা রেণু, পরিপূর্ণ দাম্পত্য সৌভাগ্যে সুখী হইয়া স্বচ্ছলতার মধ্যে পরিতৃপ্ত জীবন বাপন করিবে। দূর হইতে তাহা দেখিয়া তাঁহার অভিশপ্ত মাতৃজীবন চরিতার্থ হইবে। কিন্তু ভাগ্য বার মন্দ, সকল ব্যবস্থাই বুঝি এমনি করিয়াই তার ব্যর্থ হয়!

এতদিনে সবিতা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিয়াছেন, স্বামী ও কন্তার জীবনে তাঁহার তিলমাত্রও স্থান নাই। না অন্তরে, না বাহিরে।

আজ, যৌবনের অন্তাচলে, দেহকামনা-বিরহিত প্রেম আপনি আসিয়া উপনীত হইয়াছে দুয়ারে। সবিতা জানে ইহার মূল্য, জানে ইহা কত দুর্লভ। ইহাকে উগযুক্ত সম্মান ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করিবার মনোবৃত্তি বুঝি আজ আর নাই। আজ তাঁহার সমস্ত হৃদয়-মন মাতৃত্বের মমতারসে সিক্ত হইয়া সন্তান পালনের আনন্দ ত্বায়া তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু...কোথায় সে মেহপাত্র?

অতিরিক্ত মানসিক উদ্বেগ ও বিক্ষোভে সবিতার স্বাস্থ্যে ইদানীং ভাঙন ধরিয়াছিল। তাহার উপর দেহের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞারও অন্ত নাই।

সারদা প্রায়ই অনুবোধ করিত। কিন্তু তাহার নিজের হাতে প্রতিকারের উপায় নাই। তারক কিছু বলেন। তাহার প্রাণকাটস্

উত্তরোত্তর জমিয়া উঠিতেছে, আপন উন্নতির একান্ত চেষ্টা লইয়াই সে অহোরাত্র নিমগ্ন।

বিকালবেলায় সবিতা ভাঁড়ার ঘরে কুট্‌না কুটিতে বসিয়া একখানি ডাকের চিঠি খুলিয়া নীরবে পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার মুখে বিষ্ময় ও বেদনা বিমিশ্র স্কন্ধ হাসির রেখা। বিমলবাবু সিদ্ধাপুর হইতে লিখিয়াছেন,—

সবিতা, সারদা-মায়ের সংক্ষিপ্ত পত্রে জানিলাম, তোমার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হইয়াছে। অথচ এ সম্বন্ধে তুমি নাকি সম্পূর্ণ উদাসীন। সারদা-মা জানাইয়াছেন, সময় থাকিতে সাবধান না হইলে সম্ভবতঃ কঠিন ব্যাধিতে তোমার শয্যাশায়িনী হওয়ার সম্ভাবনা।

তুমি তো জানো, ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া, অকর্মণ্য জীবন বহন করার দুঃখ, মৃত্যুরও অধিক। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এভাবে চলিলে তুমি হয়তো সেই অতি দুঃখময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইবে।

কাহারও ইচ্ছার উপরে হস্তক্ষেপ করা আমার প্রকৃতি নয়। তোমার ইচ্ছার উপর তাই আমি নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই। হিতার্থী বন্ধুহিসাবে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি,—অতিরিক্ত মানসিক সংঘাতে তুমি এতদূর বিচলিত হইয়াছ যে, জীবিত নল্লগ্নের পক্ষে স্বাস্থ্য যে কত বেশি প্রয়োজনীয়, তাহাও বিস্মৃত হইয়াছ। অন্তর্গূঢ় মর্মবেদনার আত্মসংবিৎ হারাইয়া দেহের উপর অবস্থা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। এ ভুলও ভবিষ্যতে একদিন নান্নব আপনাই বৃদ্ধিতে পারে। কিন্তু তখন হয়তো এত বিলম্ব হইয়া যায় যে, প্রতিকারের উপায় থাকেনা। তাই আমার অনুরোধ, শরীরের অবত্ন করিওনা।

সর্বশেষে লিখিয়াছেন,—“তারকের বিবাহের কথা সম্ভবতঃ সে তোমাকে জানাইয়া থাকিবে। এ বিবাহে তোমার মতামত কি

জানিতে ইচ্ছা করি। আমার সম্মতি এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া সে পত্র লিখিয়াছে। পাত্রীটি তারকের সিনিয়র উকীল শিবশঙ্কর বাবুর ব্রাতৃপুত্রী। এই বিবাহ তাহার প্রণকৃটিসের উন্নতির অনুকূল হইবে সন্দেহ নাই।” ইত্যাদি।

সবিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া, কুটনা কুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অন্তর অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

বৈকালে সারদা মহিলা-শিক্ষা-মণ্ডলীর স্কুল হইতে বাটী ফিরিলে সবিতা বলিলেন, একটা সুখবর শুনেচ সারদা?

আগ্রহে উন্মুখ হইয়া সারদা জিজ্ঞাসা করিল, কী সুখবর মা?

—আমাদের তারকের বিয়ে।

—উৎসুক হইয়া সারদা কহিল, কবে মা? কোথায়? কনেটি কেমন দেখতে?

—তা’তো কিছু জানিনে মা। শুনলাম হাইকোর্টের মস্ত উকীল শিবশঙ্করবাবু,—যাঁর জুনিয়র হয়ে তারক কাজ শিখচে, পাত্রী তাঁরই ভাইঝি।

—সে কি? আপনি এর কিছু জানেন না? তবে জানে কে মা?

সারদার কণ্ঠে বিস্ময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, সময় হলেই সকলে জানতে পারবে সারদা। আমি সিদ্ধাপুর থেকে খবর পেলাম, তারকের বিয়ে।

সারদা মুখ অন্ধকার করিয়া বলিল, উঃ কি অদ্ভুত মানুষ এই তারকবাবু।

সবিতা স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, ও আমার একটু লাজুক ছেলে। তুমি দোব নিওনা সারদা। বরং উছোগে লাগো এখন থেকে।

সারদা নিরুত্তরে মুখ হাঁড়ি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বছর দেড়েক হইল সারদাকে একটি নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্কুলে সবিতা ভর্তি করিয়া দিয়াছেন। সেখানে সে লেখাপড়া, নানাবিধ অর্থকরী গৃহশিল্প, শিশুপালন ও শুশ্রূষা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে কাজ শিখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক একটি বিষয় শিখিবার নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর বা কয়েক মাস করিয়া সময় আছে। বর্তমানে লেখাপড়া ও দার্জিকর্ষ বিভাগে সারদার দ্বিতীয়বর্ষ চলিতেছে। বেলা নয়টার সময় স্কুলের গাড়ী আসে, ফেরে বেলা পাঁচটার। অপরাহ্নে সবিতা তাহার খাবার লইয়া বসিয়া থাকেন। সারদা ফিরিলে দ্রুত তাড়া দিয়া তাহাকে কাপড় বদলাইয়া, হাত-মুখ ধোওয়াইয়া, নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করিয়া তবে তাঁহার স্বস্তি। তারকের সম্বন্ধেও তাহাই। কোর্ট হইতে ফিরিবার পূর্বে তাহার বিশ্রামের ও জলযোগের ব্যবস্থা নিজহাতে করিতে না পারিলে সবিতা তৃপ্তি পাননা।

তারক প্রতিবাদ করে, অভ্যুযোগ করে, কিন্তু সবিতা কর্ণপাত করেননা। সারদা বলে, মা, আপনার সেবার ভার নিতে আপনার কাছে এলান, কিন্তু আপনিই যে শেষে আমার সেবা হাতে তুলে নিলেন। আমি সত্যিই এ সহিতে পারিনে। আপনার ঘাড়ে পরিশ্রমের ভার চাপিয়ে স্কুলে যেতে আমার বাধে।

সবিতা হাসিয়া বলেন, মা, এই কাজেই আমার বেশি তৃপ্তি। স্কুল তোমার কোনও নতেই ছাড়া হবেনা, আমি বেঁচে থাকতে! জীবনে তোমার অবলম্বন তো চাই। শিক্ষা না পেলে আত্ম-নির্ভরতার শক্তি পাবে কোথা থেকে? একদিন হয়তো তোমাকে একলা বেঁচে থাকতে হবে এই পৃথিবীতে। নিঃস্বের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না শিখলে, ছুঃখের অধি থাকেনা নেয়েদের, এতো তোমার অজানা নেই সারদা।

সেইদিন রাত্রে তারক খাইতে বসিলে, সবিতা নিত্যকার মত খাওয়ার তদারক করিতে সামনে বসিয়াছিলেন। সবিতা এক সময় বলিলেন, তারক, তুমি নাকি বিয়ে করছ বাবা ?

তারক চমকিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—কার কাছে শুনলেন ?

সবিতা শান্ত হাসিয়া বলিলেন, সিদ্ধাপুরের চিঠি এসেছে আজ।

সারদা মিষ্টান্ন পরিবেশন করিতেছিল। কহিল, আমাদের বাড়ীর বিয়ের খবর আমাদেরই কাছে পৌছায় তারকবাবু, সমুদ্র পারের ডাক নারকৎ।

সারদার বিজ্ঞপে হাড়ে হাড়ে চটিয়া উঠিলেও তারক তাহা প্রকাশ করিতে পারিলনা। সবিতার পানে তাকাইয়া কৈফিয়তের সুরে কহিল, আমার সিনিয়র উকীল শিবশঙ্কর বাবু পীড়াপীড়ি করে ধরেছেন তাঁর ভাইঝিকে বিয়ে করার জন্ত। আমি এখনও মতামত জানাইনি। এ বিয়ে হবে কি হবেনা তার কিছুই ঠিক নেই। কাউকেই এখনো বলিনি। কেবলমাত্র বিমলবাবুকে লিখেছিলাম, পরামর্শ চেয়ে।

সবিতা বলিলেন, এ সম্বন্ধ তো তোমার পক্ষে ভাল বলেই মনে হচ্ছে বাবা। তুমি আত্মীয় বন্ধুহীন, এ রকম মুরুবির খন্ডর পাওয়া ভাগ্যের কথা। পাত্রী যদি তোমার অপছন্দ না হয়, শুভকর্মে দেৱী না করাই ভালো।

তারক সন্তুচিত হইয়া বলিল, কিন্তু এ বিয়েতে নানা বাধা আছে না। আমি মনে করছি, শিববাবুকে জবাব দেবো, এ বিয়ে সম্ভব হবেনা।

সবিতা বলিলেন, বাধা কিসের? আমাকে জানাতে কি তোমার সঙ্কোচ আছে বাবা ?

তারক ব্যস্ত হইয়া কহিল, না না, আপনার কাছে বলতে আবার বাধা কি? আপনি আমার না। আমি জানাব-জানাব ভাবছিলাম, আজই আপনাকে নিজেই এ সকল কথা বলতাম।

সারদার মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, মা, আমি তা'হলে এখন উপরে চল্লাম।

সারদা চলিয়া গেল।

তারক কণ্ঠস্বর নিচু করিয়া বলিল, আগার সঙ্গে শিবশঙ্কর বাবু তাঁর ভাইঝির বিবাহ দিতে খুব ইচ্ছুক হয়েছেন। কিন্তু তাঁর কয়েকটি সৰ্ত্ত আছে। সেই সৰ্ত্তে আমি এখনও সম্মতি দিতে পারিনি। যদিও শিবশঙ্করবাবুর সাহায্যেই আমি এই অল্প দিনের মধ্যেই 'বারে' এতটা নাম করতে পেরেছি এবং তিনি সহায় থাকলে আমি যে খুব শীঘ্রই উন্নতির মুখে এগিয়ে যেতে পারব, এও ঠিক, কিন্তু—

তারক কথা অসমাপ্ত রাখিয়া চুপ করিল।

সবিতা তারকের পানে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাইয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারক আশ্তে আশ্তে বলিল,—শিববাবুর প্রধান ও প্রথম সৰ্ত্ত, বিবাহের পর কিছু দিন, অন্ততঃ বছরখানেক আমাকে তাঁর কাছে গিয়ে থাকতে হবে।

—কেন ?

—তাঁর ভাইঝিটি পিতৃহীনা। শিববাবুর নিজের মেয়ে নেই, কাজেই—

—বুঝেছি, ভাইঝিটিকেই নিজের মেয়ের মত মাছুষ করেছেন। কাছ ছাড়া করতে চান না বোধ হয়—

—হ্যাঁ। নিজের মেয়ের অধিক ভালবাসেন তাকে, তাই বলছিলেন—তুমি আগার বাড়ীতে এসে যদি থাক, তোমার কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে। পরে তোমার পৃথক সংসার পেতে দেওয়ার দায়িত্ব আগার রইলো।

সবিতা বলিলেন, এতে তোমার অসুবিধার কী আছে ?

তারক আনত আনত করিয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, অসুবিধা ঠিক

আমার নিজের নেই বটে বরং সর্বদা তাঁর কাছে থেকে কাজকর্ম শেখা ও পৃথক্ কেম্ পাওয়ার দিক দিয়ে সুবিধাই হবে বলে নম্নে হয় ; কিন্তু, আমি বাই কি কর মা ? ধরুন, আপনার দেখাশোনা —

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ওঃ, এইজন্ম । আমার সম্বন্ধে তুনি কিছু ভেবোনা তারক । আমি ত আজই সকালে ভাবছিলাম,—কিছুদিন বাইরে কোথাও গেলে হয় । জীবনে এ পর্য্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ ঘটেনি । ভাবচি এবার তীর্থে বেরুব ।

—একলা যাবেন ?

—আমি যদি বাই, সারদাকেও সঙ্গে নেব, কিংবা ওদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিংএ ওকে রেখে যাবো ।

তারক অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, ফিরবেন কতদিনে ?

সবিতা স্নান হাসিয়া বলিলেন,—হয়তো কলকাতায় আর নাও ফিরতে পারি । যদি ও-অঞ্চলে কোনও দেশ ভালো লাগে, সেইখানেই একখানি ছোট খাটো বাড়ী কিনে বাস করবো ভেবেচি ।

তারক চুপ করিয়া রহিল ।

সবিতা বলিলেন, ওদের পাকা কথা দিয়ে দিও ।

তারকের খাওয়া শেষ হইয়াছিল । আসন হইতে উঠিতে উঠিতে বলিল, ভেবে দেখি ।

সেইদিন রাত্রে সবিতা শয়ন করিলে সারদা যখন তাঁহার মশারীর ধার গুলি বিছানার তলায় গুঁজিয়া দিতেছিল, সবিতা বলিলেন, সারদা তোমাদের স্কুলের পরীক্ষা কবে ?

সারদা বলিল, আড়াইমাস পরে ।

সবিতা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি কিছুদিন তীর্থভ্রমণে বেরুবো মনে করেছি,—তুমি বাবে আমার সঙ্গে ?

সারদা উৎসাহিত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ না—যাবো। একমাত্র কাশী ছাড়া আমি জীবনে আর কোনও তীর্থে যাইনি। গয়ায় একবার গিয়েছিলাম বটে, সে—খুব ছোট্ট বেলায়, এগারো-বারো শতাব্দীর বয়সে। স্বামীর পিণ্ড দান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যথেষ্ট বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

সারদা বলিল, কবে আমাদের বাওয়া হবে না ?

—তারকের বিয়েটা চুকে বাক্। তারপরে কলকাতার বাবা একেবারে তুলে দিয়ে চলে যাব ভাবচি।

সারদা বলিয়া উঠিল, আনাকেও সঙ্গে রাখবেন ত ?

—না, না, তোমাকে কলকাতায় আবার ফিরতেই হবে।

—কেন না ? সারদার কণ্ঠস্থরে উদ্বেগ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—তুমি বে-প্রয়োজনে শিক্ষা নিচ্ছ সে বে শেষ হয়নি না। ফিরে এসে বোর্ডিং থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে তারপরে আবার কাছে গিয়ে থাকবে।

সারদা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া স্নানকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, আবার তীর্থভ্রমণে গিয়ে কাজ নেই না।

সবিতা বলিলেন, কেন ? দেশ দেশান্তরে ঘুরে এলে অনেক কিছুই জানতে পারবে, শিখতে পারবে।

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল,—না না, যাবোনা। তারা যদি আমায় দেখে ফেলে !

—সবিতা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি ! সে আবার কারা ?

সারদা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, আমার বাপের বাড়ীর লোকেরা।

সবিতা বুঝিলেন সমস্তই। প্রশ্ন করিলেন না কিছু। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তা' নাই গেলে তীর্থে। এখান থেকেই পড়াশুনা করো।

অকপটব্যাকুলতার সারদা বলিয়া উঠিল, আপনার কাছছাড়া হতে আমার একটুও ভরসা হয়না মা! বোর্ডিংএ একলা থাকতে ভয় করবে না তো?

—ভয় কিসের? সেখানে তোমার মতো ক—ত মেয়ে রয়েছে। আমার রাজু কলকাতায় রইলো, তারকও থাকলো, ওদের বলে যাবো তোমার গৌজ খবর নেবে। যখন যা' দরকার হবে, ওদের জানাতে পারবে।

প্রায়াক্ষকার গৃহে সবিতার শয্যাপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সারদা নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে অশ্রুট স্বরে ডাকিল—মা,—

—বলো সারদা, আমি জেগেই আছি।

বিছানার ভিতর হইতে সবিতা জবাব দিলেন।

—আমার নিজের কথা সমস্ত আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে আপনার কাছে।

—আজ অনেক রাত হ'য়ে গেছে মা। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।

—বাই।—আমি বিধবা হয়েছিলাম মা এগারোবছর বয়সে। শ্বশুরবাড়ী আর বাইনি। ছোট বেলাতেই মা মারা গিছিলেন। বাপ আবার বিয়ে করে—

সবিতা বাধা দিয়া বলিলেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবেনা সারদা। আমি সমস্তই জেনেচি।

পরদিন সবিতা বিমলবাবুকে পত্র লিখিতেছিলেন, “বহুদূরে কোথাও চলিয়া যাইবার জন্ত আমার মন নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। অনেক চিন্তা

করিয়া শেষ পর্যন্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হইব স্থির করিয়াছি। এখানে ফিরিবার আর কচি নাই। অনির্দিষ্ট ঘুরিতে ঘুরিতে 'বেদেশ ভাল লাগিবে, সেইখানেই বাস করিব মনে করিতেছি।' কলিকাতার বাসা আর রাখিবার প্রয়োজন নাই। তারকের ভাদী স্বর্গের তারককে নিজের বাটীতে রাখিতে চাহেন। তাহার আইন-ব্যবসায়ের সকল রকম সাহায্য এবং ভবিষ্যতে সংসার পাতিয়া দিবার দায়িত্ব লইতে তিনি প্রস্তুত। আমি তারককে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইতে পরামর্শ দিয়াছি।

সারদার শিক্ষা যতদিন না সমাপ্ত হয়, সে উহাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বোর্ডিং হাউসেই থাকিবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে, সে যদি ইচ্ছা করে, আমার নিকটে গিয়া বাস করিতে পারে।

ব্যবস্থা কিছুই করিতে পারিলামনা আমার রাজুর। জানিতে পারিয়াছি, সে কিছুদিন হইতে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ, আমার কিংবা অল্প কাহারও সাহায্য গ্রহণে সে একেবারেই প্রস্তুত নয়। তাহাকে অনুরোধ করিতেও ভরসা পাই না। প্রত্যাখ্যানের দুঃখ আর সর্বত্র বাড়াইয়া লাভ নাই। রাজুকে যে সঙ্গে লইয়া যাইব—তাহারও উপায় নাই, কারণ, তাহাকে প্রায়ই বৃন্দাবনে যাইতে হয়। কখন যে বৃন্দাবন হইতে ডাক আগিবে কিছুই ঠিক নাই।

তারকের পক্ষে এসময় কোর্ট কামাই করা যে অসম্ভব, তুমি জানো। সুতরাং পুরাতন দরওয়ান মহাদেব ও শিবুর না ঝিকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিব স্থির করিয়াছি। কিছুদিন তো ঘুরিয়া বেড়াই, তাহার পর যেখানে হোক স্থির হইয়া বসিব।”

কি যেন একটা উপলক্ষে সারদাদের স্কুল সেদিন মধ্যাহ্নেই বন্ধ হইয়া বাওয়ায় সারদা বাড়ী ফিরিয়া আসিল বেলা একটায়। সন্ধ্যা তখন

দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছেন। তারক কোটে। সারদা একা বাড়ীতে বসিয়া ইতিহাসের পড়া তৈয়ারি করিতে লাগিল।

সদর দরকার কড়ানাড়ার আওয়াজের সহিত ডাক শোনা গেল—
নতুন না—

বই মুড়িয়, রাখিয়া দ্রুতগদে নামিয়া আসিয়া সারদা ছয়ার খুলিয়া দিল।

রাখাল বলিল,—একি? তোমার স্কুল নেই আজ?

সারদা জবাব দিল,—ছিল। ছুটি হয়ে গেছে।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, কিসের জন্ত ছুটি?

সারদা দুষ্ঠামির হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি আজ এখানে আসবেন বলে।

রাখাল গভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, এ সব কথা বলতে, মুখে কি একটুও বাধেনা?

সারদা চপলকণ্ঠে উত্তর দিল—একটুও না।

সারদার পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে রাখাল বলিল,
নতুন-না কী করছেন? তাঁর সঙ্গে একটু দরকার আছে।

সারদা বলিল, তাহ'লে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

—কেন? তিনি কি বাড়ী নেই!

—না, দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। আজ উপোস করে আছেন কিনা!

—কিসের উপোস?

—তা' তো বলেননা কিছু। বলেন ব্রত আছে।

—এত ব্রতই বা আসে কোথা থেকে? পাঁজিগুলো পুড়িয়ে না ফেললে আর রন্ধে নেই দেখছি?

—আমি জানি দেবতা, আজ মায়ের কিসের উপোস।

—কিসের বাঁলো ত?

—আজ তাঁর মেয়ের জন্মতিথি।

—তাই নাকি? তোমাকে নতুন-মা বলেছেন বুঝি?

—পাগল হয়েছেন! সেই মানুষই বটে। অনেকদিন আগে আমাকে বলতে শুনেছিলাম মাঝী পঞ্চমী রেণুর জন্মতিথি।

রাখাল হাগিয়া বলিল, স্ততরাং এদিন নতুন-মা উপবাস অনিবার্য!

সারদা বলিল, হ্যাঁ। শুধু তাই নয়,—লক্ষ্য করে দেখেছি, এই দিনটিতে মা গরীব দুঃখীদের প্রচুর দান করেন। টাকা পয়সা, নতুন কাপড়, কসল, আলোয়ান এসব তো দেনই, তা'ছাড়া পছন্দমত অনেক সুন্দর সুন্দর রঙীন শাড়ী, ডুরে শাড়ী, ব্লাউস্ সেমিজ এই সব কিনে ভিখিরী মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বাড়ী থেকে এসব কিছু করেননা, অল্প কোথাও গিয়ে দিয়ে আসেন। যেমন কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বর কিংবা গঙ্গারঘাট এই রকম কোথাও—

রাখাল কিছু বলিলনা। গম্ভীর মুখে কি বেন চিন্তা করিতে লাগিল।

সারদা বলিল, শুনেছেন কি?—মা যে কল্‌কাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্ত অতঃপূর্বে চলে যাচ্ছেন।

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল—কোথায় যাচ্ছেন?

সারদা বলিল, আপাততঃ তীর্থভ্রমণে। তারপর যে-কোনও দেশে হোক থাকবেন।

রাখাল প্রশ্ন করিল, কবে যাবেন?

সারদা বলিল, তারকবাবুর বিয়েটা চুকে গেলেই।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া বলিল, তারকের বিয়ে নাকি? কোথায়?

সারদা সবিস্তারে তারকের বিবাহ সংবাদ রাখালকে জানাইল।

রাখাল বলিল,—তারক ঘরজামাই থাকতে রাজী হল?

বছর দুই নাত্র!—তারপরে শিববাবু তাঁকে আলাদা একখানি বাড়ী দিয়ে পৃথক সংসার করে দেবেন কথা দিয়েছেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা'হলে তারক শুধু এক রাজকন্যাই নয়, অর্দ্ধেক রাজক শুদ্ধ পাচ্ছে বলা?

সারদা পরিহাসের সুরে বলিল—শুনে আপনার নিশ্চয়ই আপশোস হ'চ্ছে—না দেবতা?—

রাখাল সে-পরিহাসের জবাব না দিয়া অগ্নমনস্ক চিত্তে কি যেন ভাবিতে লাগিল। সারদা হঠাৎ মিনতির সুরে বলিল, দেবতা, আপনিও কেন বিয়ে করুননা?

রাখাল এবার উচ্চ হাসিয়া বলিল, তারকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিয়ে করব নাকি?

সারদা বলিল, বাঃ, তা' কেন? চিরকাল কি এমনি একলা মেসে পড়ে থাকবেন? সংসার পাতবার কি সাধ হয়না?

রাখাল বলিল, সাধ থাকলেও সকলেই কি সংসার করতে পারে সারদা?

—কেন পারবে না? দীন-দুঃখীরাও ত' তাদের নিজের মতন সংসার পেতে নেয়।

—কিন্তু এও তো দেখা যায় সারদা, গরীবদুঃখী হয়তো অভাব অনটনের মধ্যেও সংসার করবার সুযোগ পেলো, কিন্তু মহাধনী প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও সে সুযোগ পেলোনা। সকলের ভাগ্যে সব সুখ সাধ পূর্ণ হয়না। ধরোনা, তোমারও তো চেষ্টার ক্রটি হয়নি কিন্তু তুমিই কি সংসার করতে পাচ্চো?

স্বচ্ছন্দস্বরে সারদা জবাব দিল, আমার কথা ছেড়ে দিন। অতো অল্প বয়সে বিধবা যদি না হতাম, আজ তো আমার মস্ত সংসার হতো।

তার পরেও তো আবার খোদার উপরে খোদকারীর দুর্বুদ্ধি নিয়ে নূতন করে সংসার পেতেছিলাম! সইলনা তা কি করবো?

রাখাল বলিল, তা'হলেই বোঝো,—ভাগ্য ফলতি সর্বত্র!

সারদা রাখালের বুদ্ধিতে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, আপনি বিয়ে করার পরে যদি সংসার গড়ে না উঠতো, অথবা সংসার পাতবার মুখে বোটি যদি মারা যেতো বা অল্প কিছু হতো—তা'হলে ওকথা মানতাম। আপনি তো আজ পর্যন্ত কোনো চেষ্টা করেননি?—

রাখাল বলিল, চেষ্টা করলেই কি হয় নাকি? বিয়ে হওয়া-না-হওয়াটাও যে ভাগ্যেরই উপরে নির্ভর করে এটা বুঝি তুমি মানতে চাওনা? দেখ সারদা, ঐ সব ইতিহাস ভূগোল পড়া, আর গাল্চে সতরঞ্চীর টাঙ্গা-পড়েন্ শেখা দিনকতক বন্ধ রেখে তোমার একটু লজিক পড়া দরকার।

—কিছু দরকার নেই। করুন দেখি তর্ক, কেমন না আপনাকে হারিয়ে দিতে পারি, দেখে নিন।

রাখাল হাতজোড় করিয়া বলিল, আমি হার স্বীকার করে নিচ্ছি!—একে জ্বীলোক, তায় অল্পবিদ্যা,—এ যে কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তা সকলেই জানে। তর্কশাস্ত্র প্রণেতাগণ স্বয়ং এলেও হার মানবেন, আমি তো তুচ্ছ। ওকথা রেখে কাজের কথার জবাব দাও দিকি। নতুন-না যে কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়ে তীর্থযাত্রা করছেন, তোমার ব্যবস্থা কি হচ্ছে?—তুনিও কি নতুন-মার সঙ্গেই যাচ্ছে?

সারদা হাসিয়া বলিল, ধরুন, যদি তাই বাই,—তাতে খুশী হবেন না অখুশী?

রাখাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল, খুশী না হলেও অখুশী হবারই বা আমার কি অধিকার?

—অধিকার যদি পান, তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল—ও জিনিষটা অত তুচ্ছ নয়!—অধিকার এমন বস্তু, যা' দানের সাহায্যে এলে, দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই মর্যাদা হারায়। অধিকার কোনে আপনি সহজভাবে জন্মায়, সেখানেই তার জোর থাকে!

—সারদা পুলিল—তবে আর আমারও অনধিকার চর্চায় কাজ নেই। কিন্তু, মোটের উপরে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আমি মার সঙ্গে বিদেশে গেলে আপনি একটুও খুশী হননা।

—সে শুধু তোমারই ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য সারদা।

রাখালের কণ্ঠের স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল! বলিল, এতে আমার নিজের কিছু স্বার্থ আছে মনে করোনা।

সারদা উদাস ভাবে অতৃদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—সংসারে কার যে কোথায় স্বার্থ, কি করে বুঝব বলুন?

রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিল—আমি মিথ্যে বলিনি সারদা—

সারদা এবার হাসিয়া ফেলিল! স্নিগ্ধ নধুর সে হাসি! বলিল, শুনুন, নতুন-না বলেছেন, যতদিন না পড়াশুনো শেষ হয়, আমাকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে রাখবারই ব্যবস্থা করে যাবেন।

রাখাল বলিল,—সেই বেশ সুব্যবস্থা।

সারদার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল! অনুযোগের স্বরে বলিল,—কিন্তু আমার যে এ ইস্কুল-ফিস্কুল মোটে ভাল লাগেনা দেবতা।

—কী ভালো লাগে বলো।

সারদা নতমুখে নিরন্তর রহিল।

রাখাল বলিল, মোটা মোটা বই পড়ে থিওরেটিক্যাল জ্ঞান লাভের চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হাতে কলমে কাজ শেখা তো বেশ ইন্টারেস্টিং। ওটা তোমার ভাল লাগা উচিত।

সারদা নতচখেই বলিল,—আমার কিছুই শিখতে ভালো লাগেনা।

রাখাল বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কী তোমার ভালো লাগে সারদা?

বিষম স্বরে সারদা বলিল, সে বলে লাভ নেই। আপনি শুনে হয়তো ঠাট্টা করবেন।

রাখাল বলিল, সারদা, তোমার জীবনের সুখ-দুঃখে কথা নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবো, এতবড় পাষাণ আমি নই।

অপ্রতিভ হইয়া সারদা বলিল,—না দেবতা তা' নয়। আমার কী যে ভাল লাগে, আমি নিজেই তা' বুঝতে পারিনা। তবে এইটুকু বলতে পারি, নির্দিষ্ট সময়ে যন্ত্রের মত ইস্কুলে গিয়ে পড়াশোনা; শিল্পকর্ম বা ধাত্তীবিজ্ঞা শেখার চেয়ে, বাড়ীতে ঘর-সংসারের কাজ করতে আমার অনেক ভালো লাগে। সংসারকে নিখুঁত শৃঙ্খলায় সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি রাখতে আমার উৎসাহের অন্ত নেই। একজ্ঞ আমি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী। দেখেছেন তো, নতুন-মার পুরানো বাড়ীতে থাকতে, ভাড়াটেদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আমার কাছেই থাকত, খেলা করত, ঘুমাত, গল্প শুনত, পড়াশুনা করত।

অলক্ষণ থামিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সারদা বলিল,—নিজের হাতে আপন জনেদের সেবা যত্ন করার মধ্যে যে কত তৃপ্তি, কত আনন্দ—তা' মেয়েমানুষ ভিন্ন আর কেউ বুঝবেনা।

রাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল, সারদা, তুমি নিজের সংসার বলতে কিছু পাওনি বলেই সংসারের দিকে তোমার এত আকর্ষণ।

সারদা বলিল—হয়তো তাই হবে। সেইজন্যই তো মিনতি করে বলছি দেবতা, আপনি বিয়ে করুন। সংসারী হোন। আমি আপনার সংসার নিয়ে থাকব। আপনাদের দুজনকে প্রাণ চেলে সেবা যত্ন করব। নিজের হাতে স্বন্দর করে ঘর-সংসার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখব, দেখবেন

লোকে স্তূথ্যতি করে কিনা। তারপর খোকাথুকুদের মানুষ করার ভার পুরোপুরিই নৈব.আমার হাতে। এই যে সেলাই বোনা, শিশুপালন এত কষ্ট করে শিখচি, একি সত্যিই হাসপাতালে বা লোকের দোরে দোরে চাকরি করে ঝেঁড়াব বলে? তা' মনেও করবেননা।

রাখাল বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সারদার কথাগুলি শুনিতেছিল।

সারদা বলিতে লাগিল, ইস্কুলের এত কড়া নিয়ম আমার আদপেই বরদাস্ত হয়না। তবুও জোর করে শিখচি কেন জানেন? সংসার করবো বলে। আমি আপনার বিয়ে দেবই। নিজে মেয়ে পছন্দ করব। সংসার পাতবো নিখুঁত করে, মানুষ করবো ছেলেমেয়েদের,—ভগবান না করুন—যদি সংসারে অভাব অনটন ঘটে, তারজন্তু কারুর কাছে গিয়ে হাত পাততে হবেনা, নিজেই সেটুকু পূর্ণ করে নিতে পারবো।

রাখাল বলিল,—তুমি কি এই কল্পনা নিয়েই শিক্ষায় প্রবেশ করেছো সারদা?

রাখালের মুখের পানে তাকাইয়া সারদা বলিল, আপনি থাকতে সত্যিই কি আমি অন্যের জন্তু পরের দুয়োরে হাত পেতে চাকরী করতে বেরবো ভেবেছেন? কেন? কী দুঃখে যাব? বয়ে গেছে আমার—

সারদার কণ্ঠের প্রগাঢ়তায় রাখালের অবিশ্বাস করিবার মত কিছুই রহিলনা।

সারদার মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া রাখাল ধীরকণ্ঠে বলিল, সারদা, তুমি কি বলতে চাও—সমস্ত জীবনটা তোমার এমনি করে পরের সংসারেই বিলিয়ে দিয়ে যাবে? নিজের সংসার, নিজের স্বামী, নিজের সন্তান না পেলো জীবনে সংসারের সাধ কি সম্পূর্ণ সার্থক হয়?

সারদা মৃদুস্বরে বলিল, এ আমি আপনাকে তর্ক করে বোঝাতে পারবনা দেবতা,—আমি জেনেচি, স্বামী, গৃহস্থালী, সন্তান মেয়েদের জীবনে—

আকাঙ্ক্ষার সানত্রী। যে-মেয়ে সত্যি করে একে ভালোবাসে, সে কখনো এতে এতটুকু কালি লাগতে দিতে পারেনা। কোনও মেয়েই চায়না, তার নিজের সন্তানের কপালে বাপ মায়ের কোনও রকম কলঙ্কের ছাপ থাকুক। যে জন্তুই হোক, আর যার দোষেই হোক, একথা ত' কোমোদিন ভুলতে পারিনে যে, আমার জীবনে অশুচির ছোঁয়া লেগেচে। নিজের স্বামী পুত্রকে খাটো করে নিজে স্ত্রী হবো—মা হবো—এত বড় স্বার্থের আমি নই। নাই বা পেলাম স্বামী, সন্তান, যাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁর সন্তান কি নিজের সন্তানের চেয়ে কম মেরের? তাঁর সংসার কি নিজের সংসারের চেয়ে কম আনন্দের?

রাখাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সারদা আস্তে আস্তে বলিল, দেবতা, আমি নিকোপ নই। আপনি বিয়ে করুন। আপনার বৌকে আমি ভালবাসতে পারব। আমি ঈর্ষাকে ঘৃণা করি। তা'ছাড়া সব চেয়ে বড় কথা কি জানেন?—সে-ই যে আনাকে সব দেবে। আপনার সংসার—আপনার সন্তান—আনার আনন্দের সকল অবলম্বন যে তারই হাত থেকে পাবো!—আমার জীবনের সত্যিকারের সার্থকতা, সে যে তারই দান!

নিরুত্তর রাখাল একই ভাবে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে রাখাল নিঃস্তুকতা ভঙ্গ করিয়া মুখ তুলিয়া অশ্রুট কণ্ঠে বলিল—তোমার অমরোদ আজ সত্যিই আমার ভবিষ্যৎ জীবন নব্বন্ধে ভাবিয়ে তুললে সারদা!—আমি দেখব চিন্তা করে,—আজ চললাম। নতুন-না এলে বোলো, আমি এসেছিলাম।

তার পক্ষের বিবাহ নিষিদ্ধে চুকিয়া গেল।

বিমলবাবু কলিকাতায় আসিয়াছেন। সবিতা প্রস্তুত হইয়াছেন বিমলবাবুর সহিত তীর্থভ্রমণে বাহির হইবার জন্ত। আগামী কল্যাণীয়া রওনা হইবেন। পুরাতন দরওয়ান মহাদেও ব্যতীত বিমলবাবু দাসী ও রাধুনী সঙ্গে লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রাখালকে ডাকাইয়া সবিতা তাহার হাতে ব্রজবিহারীবাবুর শিল্পোহর-করা গহনা সমেত বাজ্জিটি তুলিয়া দিয়া বলিলেন,—এ গহনা রেণুর। সে না নিতে চায়, সংসারে মাতৃহীনা মেয়েদের মধ্যে এ তুমি বিধিয়ে দিয়ো রাজ্জু। এ সমস্ত আটকে রেখেছিলাম যার জন্ত, সে-ই যখন চরন দারিদ্র্য মাথায় তুলে নিল, আমি আর এ বোঝা ব'য়ে মরি কেন? দেড়লক্ষ টাকা দামের যে সম্পত্তি আমার নামে ছিল—সে কেনা হয়েছিল রেণুরই বাপের উপার্জনের টাকায়। সে সম্পত্তি রেণুর নামে ট্রান্সফার করে রেজেষ্ট্রী করে দিয়েছি। এই নাও সেই দলিল ও কাগজপত্র। সে না গ্রহণ করে, এ সম্পত্তির যে ব্যবস্থা তুমি নিজে ভাল বুঝবে, তাই কোরো। আর এই হাজার কয়েক টাকার কোম্পানীর কাগজ ও আমার এই হার, বালা, চুড়ি, বা বিয়ের সময় আমার বাপের দেওয়া। এ আমি, তোমার ঘর করতে যে আসবে, অর্থাৎ আমার বোমাকে—আমার খোতুক দিয়ে গেলাম। এ তার স্বাশুড়ীর আশীর্বাদী। ফিরিয়ে দিয়োনা বাবা।

সারাদা দূরে দাঁড়াইয়া রাখালের মুখের পানে চাহিয়া মৃত হইল।

রাজু বিপন্ন হইয়া বলিল,—নতুন-মা, আপনার ছেলের শিখো-বুদ্ধির খবর আপনার অজানা নয়।—এতবড় গুরু দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে যাচ্ছেন কেন? আমি কি পারব এ সবার ব্যবস্থা করতে? তার চেয়ে বরং তারকের কাছে এসব গচ্ছিত রেখে যান; সে আইনজ্ঞ মানুষ, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার বোঝে-সোঝে ভাল, তার হাতে থা'লে সুব্যবস্থা হতে পারে।

সবিতা বলিলেন,—আমাকে কি তুই নিশ্চিত হয়ে যেতে দিবিবে রাজু? তারপরে গাঢ় কণ্ঠে বলিলেন,—যে উদ্দেশ্য নিয়ে—তোমার কাকাবাবুর হাত থেকে এ সমস্ত একদিন নিজের হাতে নিয়েছিলাম, তা' সার্থক হোলোনা। তোমার কাকাবাবুর ডুবে যাওয়া কারবারের তলায় এগু'ল সেদিন চলিয়ে গেলেই ভাল হত। হয়ত, এরচেয়ে সাধুনা পেতাম তাতে।

রাখাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, কিন্তু সে যাই বলুন—নতুন-মা, আমি কিছ' এসব আর্থিকব্যাপারে নিতাস্তই অজ্ঞ। আমাকে দিয়ে—

সবিতা ধীর কণ্ঠে বলিলেন, ভয় পেয়োনা রাজু! তুমি এ সম্বন্ধে সো-
জ্ঞানস্বাই করবে, সেইটাই হবে এর সুব্যবস্থা আর শুভ ব্যবস্থা।

সবিতারা প্রথমেই যাত্রা করিলেন দ্বারকা। সেখান হ'তে বহু স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে গুজরাট রাজপুতানা প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া আগ্রায় আসিয়া পৌছিলে, বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, নথুরা বৃন্দাবন দেখবেনা সবিতা? এখান থেকে খুব কাছে—

সবিতা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রভাস দেখলাম, দ্বারকা দেখলাম, নথুরা-বৃন্দাবনই বা বাকি থাকে কেন,—চলো যাই।

নথুরায় বিমলবাবুর পরিচিত এক ধনী শেঠের প্রাসাদে তাঁহারা আসিয়া টাটিলেন। শেঠজী কারবার সূত্রে বিমলবাবুর সহিত বিশেষ পরিচিত।

তিনি তাঁহার সুরমা 'গেট্‌ হাউস্‌'এ বা অতিথিভবনে বিমলবাবুদের থাকিবার বন্দোবস্ত তো করিয়া দিলেনই, নিজের একখানি মোটরকারও বিমলবাবুর নব্বদা ব্যবহারের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিলেন।

মথুরা হইতে মোটরযোগে বৃন্দাবনে গিয়া বিমলবাবু বলিলেন, সবিতা, ব্রজবাবুদের স্ত্রী দেখা করতে যাবে নাকি ?

সবিতা বলিলেন, পাগল হয়েচ। আমরা দেবদর্শন করতে এসেছি, তাই দেখে ফিরে যাব।

মাস্ত দিন বৃন্দাবনের নানা স্থানে ঘুরিয়া ক্লান্ত বিমলবাবু বৈকালে বলিলেন, চলো এইবার মথুরায় ফেরা যাক।

সবিতা বলিলেন, শুনেচি, বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর আরতি ভারী সুন্দর। আরতিটা দেখে গেলে হয়না ?

বিমলবাবু বলিলেন, বেশতো, আরতি দেখেই ফেরা যাবে। বিস্তৃত একটি মাঠের পাশে গাছতলায় মোটর রাখিয়া তাঁহারা সতরঞ্চি বিছাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। মহাদেও দরওয়ান বিমলবাবুর চায়ের সরঞ্জামপূর্ণ বেতের বাস্ক গাড়ী হইতে নামাইয়া ষ্টোভ্‌ জালিয়া গরমজল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। সবিতা চা খান্না। কিন্তু নিজহস্তে চা তৈয়ারী করেন। এলুমিনিয়াম কেটলী হইতে ফুটন্ত জল চীনা মাটির চা-পাত্রে ঢালিয়া, চিনি, চা, দুধ প্রভৃতি, মহাদেও সবিতার সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিল।

ক্লান্ত কণ্ঠে সবিতা বলিলেন, মহাদেব, তুমিই আজ চা তৈরি কর। আমি ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়েচি।

বিমলবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তোমার শরীর খারাপ ঠেকছে নাকি ? তা'হলে আজ আর মন্দিরে ভীড়ের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই।

সবিতা বলিলেন, না, এমন কিছুই হয়নি। আরতি দেখব, সম্ভব যখন করেচি, না দেখে ফিরে যাবনা।

প্রান্তরের প্রান্তে সূর্য্য অস্তাচলে নামিয়া গেলেন। গাঢ় রাঙা আলোয় নীল আকাশ সবুজ মাঠ আরক্তিম হইয়া উঠিল। কুন্ডায়ামী পাখীর কলকোলাহলে বন্দাবনের গাছপালা ও কুঞ্জ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সবিতা শুদ্ধ ভাবে মাঠের দূর প্রান্তে অগমনস্থ দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া আছেন। বিমলবাবু নীরবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা বনাইয়া আসিল। কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বিমলবাবু বলিলেন,—চলো, এইবার মন্দিরে যাই। পরে গেলে ভীড়ে হয়তো তোমার ঢুকতে কষ্ট হতে পারে।

সবিতা স্তম্ভোখিতের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন,—চলো।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিলেন, দেখো, একটু পরেই না হয় মন্দিরে যাব আমরা। আরতির কঁাসর ঘণ্টা বেজে উঠুক আগে। ভীড়ে এমন আর কি কষ্ট হবে?

বিমলবাবু প্রতিবাদ করিলেননা।

গাড়ী এদিক সেদিক খানিক ঘুরিবার পরই আলোকিত গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। বিমলবাবুরা মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দজীর আরতি হইতেছে। সবিতা বিগ্রহ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্রে আরতি দর্শন করিতেছেন। কিন্তু, তাঁহার দৃষ্টি বিগ্রহের প্রতি স্থির নয়, আশে পাশে চঞ্চল।

হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল সেই বারান্দারই এককোণে ব্রজবাবু যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নিম্পলক নয়নে আরতি দর্শন করিতেছেন। ওষ্ঠাধর মৃদুমৃদু কাঁপিতেছে, নামজপ করিতেছেন সম্ভবতঃ।

আরতি সমাপ্ত হইলে ভীড় কনিয়া গেল। বিমলবাবু অগ্রসর হইয়া ব্রজবাবুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন।—সর্পদষ্টবৎ সরিয়া গিয়া ব্রজবাবু

বলিয়া উঠিলেন, গোবিন্দ গোবিন্দ । একী ! প্রভুর মন্দিরে আমাকে প্রণাম ! পূর্ণিপাপে লাপী হলাম যে !

বিমলবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, আমি জ্ঞানতামনা মন্দিরে প্রণাম করতে নাই । ক্ষমা করুন ।

—গোবিন্দ গোবিন্দ, আপনি আমাদের বিমলবাবু না ? চলুন, চলুন, আঙিনায় তুলসী কুঞ্জের দিকে গিয়ে বসি ।

বিমলবাবু বলিলেন, চলুন ।

ব্রজবাবু বিগ্রহ মূর্তির সম্মুখে নাট্যাদি প্রণিপাতে শুইয়া পড়িয়া বারংবার আপনার নন্দনাকর্ণ মলিয়া হরতো বা বিমলবাবুর প্রণাম জনিত অপরাধেরই সার্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ।

সবিতা স্থিরনয়নে ভূপতিত ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া নিম্পন্দেয় স্থায় দাড়াইয়া রহিলেন ।

সুদীর্ঘ প্রণাম অন্তে উঠিয়া ব্রজবাবু, সবিতা ও বিমলবাবু সহ মন্দিরের অন্তদিকে গিয়া দাড়াইলেন ।

ব্রজবাবুর চেহারার পরিবর্তন হইয়াছে । মুখমণ্ডল ও মস্তক ক্ষৌর নগ্নিত । শীর্ষে দুগ্ধধবল শিখাগুচ্ছ ছাড়া আর কেশের চিহ্ন মাত্র নাই । কণ্ঠে তুলসী কাঠের গুচ্ছবদ্ধ মালা । নাসিকা ও ললাটে তিলকরেখা, হাতে হরিনামের ঝুলি, গায়ে নামাবলী । গৌরবর্ণ দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ রোদ্রদগ্ধ তামাটে হইয়া বার্কক্যভারে সম্মুখের দিকে অনেকটা নত হইয়া পড়িয়াছে ।

বিমলবাবুর কুশল প্রশ্নের উত্তরে ভাবগাঢ়কণ্ঠে ব্রজবাবু বলিলেন,—
বিমলবাবু, গোবিন্দ এই দীনহীনকে অনেক কৃপা করেছেন । যে-জন ব্রজধামে এসেছে, ব্রজরেণু মেখেছে, যমুনায় অবগাহন করে শ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন স্পর্শন করেছে, তার কি আর কোনও

অকুশল থাকে? বৃন্দাবনে সবই কুশল। ইহলোকে আর আনার কোনও কামনাই নেই। এখানে আমি কৃষ্ণানন্দে বিভোর হয়ে আছি।

সবিতা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, রাজুর কাছে শুনেচি, তুমি এখানে নাকি কোন্ বৈষ্ণব বাবাজীর আশ্রয়ে দীক্ষা নিয়েচ? সদাসর্বদা বোধহয় তাদের নিয়েই মেতে আছে মেজকর্তা?

আনতা আমতা করিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, তা' কতকটা বটে। কি জানো নতুন-বৌ, আনার শেষের দিনগুলি গোবিন্দ তাঁর চরণ ছায়ায় টেনে এনে বড় করুণাই করেছেন। এখানে সংসারের সকল দুঃখতাপ নতাই জুড়িয়েচি।

সবিতা স্তম্ভিত বিষয়ে ব্রজবাবুর পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,— মেজকর্তা, এ যে তোমার রেসে হেরে সর্ব্বশাস্ত হয়ে মদের নেশায় নশ্‌গুন্‌ থাকে। এ আনন্দের দান কি তা' জানো?

মন্দিরের অস্থধারে গোল করতাল যোগে একদম কীর্ত্তনিয়া গাহিতেছিল—

“প্রেমানন্দে ভগবৎ স্বধার সাগরে
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে ভগ্নি না সঞ্চারে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-নন,
কৃষ্ণ যে স্থথের নিধি পরম রতন ॥
কুল, শীল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, লোকলজ্জা, তয়,
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয়,
মদিরা-মদার্ক বেন কটির বসন
আছে কি না আছে তার নাহি বিবেচন ॥”

ব্রজবাবুর দুই চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বিহ্বল

কণ্ঠে কহিলেন, বতুন-বো, এ মদের নেশা ঘেন আর না ছোটে এই কামনাই হোয়া।

সবিতা কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, তোমার মেয়ে? আমার—রেণু?

—কে আমার মেয়ে? আর আশ্বিনের মোহ রেখোনা নতুন-বো। এখানে সমস্তই তুঁছ তুঁছ। ‘আমার’ বলে কিছুই নেই। সেই একমাত্র ‘আমি’ ব্রজবান্দন শ্রীকৃষ্ণই এখানে সব। রেণুকে তাঁরই চরণে অর্পণ করেচি। বতদিন ওকে নিজের বলে ভেবেচি, ভাবনায় হয়ে পড়েচি দিশেহারা। এবার দিনভূনিয়ার মালিক যিনি, তাঁর হাতে তোমার রেণুকে তুলে দিয়ে—নিশ্চিন্ত হয়েছি। তিনি যে ব্যবস্থা করবেন, কাকুর সাধ্য নেই তা’ রদ করবার। (ধরোনা কেন আমাদের কথাই) মাহুঘের ব্যবস্থা, মাহুঘের ইচ্ছা, মাহুঘের মালিকানা খাটলো কি? আড়াল থেকে সেই পরমরসিক হেসে যেদিকে অঙ্গুলি হেলালেন, সেই দিকেই উল্টে গেল পাশা। পুতুলবাজীর পুতুল আমরা। নিজেদের কোনও ইচ্ছাই মাহুঘের খাটেতে পারেনা, একমাত্র তাঁর ইচ্ছা ছাড়া।

সবিতা কি ঘেন জবাব দিতে যাইতেছিলেন, কে ডাকিল, বাবা—

কণ্ঠস্থের চমকিত হইয়া সবিতা পিছন কিরিয়া দেখিলেন,—রেণু। শীর্ণ মুখ, কক্ষ কেশ, চেহারায় দারিদ্র্যের কক্ষতা স্পষ্ট। পরনে একখানি আধময়লা ছাপা বন্দাবনী শাড়ী, তারও কণ্ঠে তুলসীর কণ্ঠী—ললাটে ও নাসিকাগ্রে চন্দন তিলক।

সবিতা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কণ্ঠার পানে তাকাইয়া নিখর হইয়া গেলেন।

রেণু সবিতার দিকে না তাকাইয়া—ডাকিল, বাবা, ঘরে চলো, রাত হয়ে যাচ্ছে।

ব্রজবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, তোর নাকে চিন্তে পারলিনে রেণু?

মাথা হেলাইয়া রেণু বলিল দেখেচি। মন্দিরে তো প্রণাম কর্তে নেই।

মায়ের মুখের পানে একবার শান্ত নির্লিপ্ত দৃষ্টিপাত করিয়া আবার ব্রজবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল,—চলো বাবা। একাদশীর উপোস করে রয়েছে সারাদিন, কখন একটু প্রসাদ পাবে?

কন্নার আকৃতি দেখিয়া সবিতার অন্তরে যে আন্তরিক গুমরিয়া উঠিতেছিল, কন্নার কথাবার্তার ভঙ্গীতে তাহা যেন আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল।

মাতার প্রতি কন্নার এই পরের মত আচরণে ব্রজবাবু মনে মনে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিলেন। হয়তো বা সেইজন্তই সবিতাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, নতুন-বৌ, গোবিন্দের কুটীরে একদিন তোমরা সেবা করতে আসতে পারবে কি?

সবিতা রেণুর নির্লিপ্তমুখের পানে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রজবাবুকে জবাব দিলেন, না মেজকর্তা, তোমার গোবিন্দের কুটীরে আমার মতন মহাপাপীর প্রবেশের উপায় নেই।

জিত কাটিয়া ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ! দীনদয়াল দীনবন্ধু—পতিতপাবন তিনি। তিনি যে অশরণের শরণ নতুন-বৌ—

উচ্ছ্বসিত কান্না প্রাণপণে দমন করিতে করিতে সবিতা বলিলেন, শুধু তোতা পাখীর মত মুখেই এ-সব আওড়ে গেলে মেজকর্তা! তোমাদের ধর্ম, তোমাদের যা' তৈরি করেছে, সে তোমরা নিজচক্ষে দেখতে পাচ্চোনা তাই রক্ষে। বেধর্ম্মে ক্ষমা নেই সেধর্ম্ম অধর্ম্ম থেকে কতটুকু আর উচু? সবিতা অরিতপদে মন্দিরের বাহিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিমূঢ় ব্রজবাবুর সামনে আসিয়া বিমলবাবু বলিলেন,—আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল, কখন আপনার স্তুবিধা হবে জানতে পারলে—

ব্রজবাবু বলিলেন, যখন আপনার স্তুবিধা হবে, তখনই।

বিমলবাবু বলিলেন, বেশ, কাল দুপুরে আমি আসব। আপনার বাসাটা—

—এই মন্দির থেকে বেরিয়ে বাঁহাতি রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাইনে গলিতে। ঘনশ্যামদাস বাবাজীর কুঞ্জ বললে সকলেই দেখিয়ে দিতে পারবে।

রেণু বলিল, বাবা, কাল যে শ্রীগুরু মহারাজের কুঞ্জে অহোরাত্র নামকীৰ্ত্তন আর বৈষ্ণবসেবা আছে। কাল সারাদিন আমরা তো সেখানেই থাকবো।

ব্রজবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েচিস মা। ভাগ্যিস! বিমলবাবু, কাল আমায় নাপ করতে হবে;—কাল আমি সারাদিন আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীবৈকুণ্ঠদাস বাবাজীর শ্রীকুঞ্জে থাকবো। আপনি পরশু সকালে এলে অম্লবিধা হবে কি?

বিমলবাবু বলিলেন, কিছুনা। তা'হলে পরশু সকালেই আমি আপনার কাছে আসব। নমস্কার!—

ব্রজবাবু বলিলেন, গোবিন্দ! গোবিন্দ!

মোটরে উঠিয়াই আসনের উপর ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়া সবিভা বলিলেন, আর নানাস্থানে ছুটে বেড়াতে ভালো লাগেনা। এইবার বিশ্রাম চাই দয়াময়।

বিস্মিত বিমলবাবু সবিভার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—
বৃন্দাবনেই থাকবে স্থির করলে নাকি?

—না—না—না! এখানে আমি একদণ্ডও টিকতে পারবোনা!—
কণ্ঠস্থরে একটু জোর দিয়াই বলিলেন—আমাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চলো।

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বিমলবাবু বলিলেন, সে কি?

—হ্যাঁ,—কাল সকালেই যাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলে। একদিনও আর বিলম্ব নয়—সবিতার কণ্ঠে আকুল মিনতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

বিমলবাবু বলিলেন, এমন অধীর ছোয়োনো সবিতা। কাল ত যাওয়া হতে পারেনা। এ রেলের পথ নয়, জাহাজের পথ! কলকাতা হয়ে যেতে হবে। তাছাড়া—ব্রজবাবুকে কথা দিয়ে এলাম, পরশু সন্ধ্যাে তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করব। সুতরাং কালকের দিনটা অপেক্ষা না করে তো উপায় নেই। অবশ্য, পরশু রাত্রের ট্রেনেই আমরা মথুরা ছাড়তে পারবো—

সবিতা বালিকার ছায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, না না, আমি পারবো না। আমার দম আটকে আসচে এখানে। এদেশ থেকে আমাকে তুমি চিরদিনের মতো বহু দূরদেশে নিয়ে চলো। বহুদূরে—যেখানে রীতি, নীতি, সমাজ, মানুষ সবই অস্তরকম। আমি মুছে ফেলব আমার সমস্ত অতীত! তাকে এমন করে—আমার জীবন দখল করে থাকতে আর দেবনা আমি।

বিমলবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। সবিতার মনের অবস্থা বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পরদিন প্রাতে বিমলবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, সবিতার শয়ন কক্ষের দ্বার তখনও বন্ধ। বিমলবাবু চিরদিনই একটু বেশি বেলাতে ওঠেন। কিন্তু সবিতার ভোরে ওঠাই অভ্যাস। এত বেলাতেও সবিতার শয়নকক্ষের দ্বাররুদ্ধ দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বারে ধাক্কা দিবেন কিনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দুয়ার খুলিয়া সবিতা বাহির হইলেন। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি ও কালিমা চোখে-মুখে নিবিড় রেখার ফুটিয়া উঠিয়াছে। মরণাপন্ন রোগী লইয়া সুদীর্ঘ রজনী মৃত্যুর সহিত যুদ্ধিবার পর প্রভাতে নারীর মূৰে

চেহারা খেমনাদলীয়া যায়, এক রাত্রিতেই সবিতার মুখে যেন সেই ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে !

বিমলবাবু একবার সবিতার পানে তাকাইয়া ব্যথিত দৃষ্টি অন্তদিকে ফিরাইয়া লইলেন । কিছুই প্রশ্ন করিলেন না ।

সবিতা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখচি । তুমি চা' পাওনি নিশ্চয় । কাপড় কেচে এসে আমি তৈরি করে দিচ্ছি এখুনি ।

বিমলবাবু বলিলেন, ঠাকুর চা করে দিচ্ না আজ, সবিতা ।

সবিতা বলিলেন, না না, সে ভাল তৈরি করতে পারে না । আমার দেয়ি হবেনা বেশি ।

তারপরে নিজেই কৈফিয়তের ভঙ্গীতে সহজ গলায় কহিলেন, রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি । কাল মেজাজ এমন বিগড়ে গেছলো, মাথা ধরে উঠে রাস্তার ঘুমটি মাঝে থেকে মাটা হোলো আর কি । বাই, চট্ করে স্নানটা সেরে আসি ।

সবিতা গামছা হাতে লইয়া স্নানক্ষেত্র দিকে চলিয়া গেলেন । বিমলবাবু অন্তমনস্ক চিন্তে ভাবিতে লাগিলেন, কতখানি নিদারুণ হতাশা ও মর্শ্মবেদনায় মানুষের চেহারা একরাত্রে মধ্য এতখানি স্নান ও বিশুদ্ধ হইতে পারে ।

চা ঢালিতে ঢালিতে সবিতা অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিলেন,—কাল রাত্রে বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলেচি । বুঝেচ ?

বিমলবাবু বলিলেন, কিসের ?

—ওই ওদের সম্বন্ধে !—

এই অমুদ্রিষ্ট সর্বনাম যে কাহার উদ্দেশে উচ্চারিত হইল বিমলবাবু

বুঝিতে পারিলেন। কতখানি গভীর বেদনার ফলেই আভি প্রিয়নাম আজ সর্বনামে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল। বলিলেন, কি স্থির করলে সবিতা ?

—সিঙ্গাপুরে যাওয়াই স্থির করলাম।

—আরও দিনকতক তীর্থভ্রমণে বেড়ানো যাক—তারপরেও যদি যেতে ইচ্ছে কর, যাবে। কেমন ?—

—না, আর তীর্থে নয়। (মাহুষের হাতে গড়া এই পুতুল খেলার তীর্থে ঘুরে ঘুরে শুধু ঘোরারই নেশায় খানিক সময় কাটে মাত্র। অন্তরের প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার উত্তর মেলেনা। এ খেলায় আর ঘারই মন ভুলুক, যে সত্য চায়, তার মন ভোলেনা।) এবারে বিশ্রাম চাই।

বিমলবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, কিন্তু যেখানে বিশ্রামের আশায় যেতে চাইছো, সেখানে গিয়ে যদি তা' না পাও ?

—সে ভয় কোরনা। এবার আমার আর ভুল হবেনা। তোমার হাত দিয়ে ভগবান আমার জীবনের দিনান্তে, যে-সামগ্রী আমাকে পাঠিয়েছেন, তা' সামান্য নয়। (বোঁটা থেকে যে-ফুল ছিঁড়ে পড়ে গেছে মাটিতে, সে ফুল আর কখনো শাখার বাঁধনে ফিরে আসেনা। আলেয়ার পিছনে ছুটে বেড়ানো যে, শুধু দুঃখই বাড়ানো,) এবার তা আমি বুঝতে পেরেছি।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে কাটিয়া গেল। বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,— তাহ'লে টেলিগ্রাম করে দিই, সিঙ্গাপুরের জাহাজে দু'টো কেবিন্ রিজার্ভের জন্ত ?

সবিতা মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

পরদিন সকালে বিমলবাবু মথুরা হইতে মোটরযোগে যখন বন্দাবনে

রওনা হইলেন, সবিতাকে বলিলেন, ব্রজবাবু তোমাকে তাঁর বাসায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। একবার ঘুরে আসবে নাকি ?

সবিতা অস্বস্ত হইলেন। বিমলবাবু একাই বাহির হইয়া গেলেন। বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর ঠিকানা খুঁজিয়া বাসায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, রেণু পূর্বদিন রাত্রি হইতে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। চিকিৎসা ও শুক্রবার উপযুক্ত নোবস্তু কিছুই হয় নাই। রোগীকে হরিনাম সংকীৰ্ত্তন শোনানো হইতেছে!—ব্রজবাবু ঠাকুরঘরে হত্যা দিয়া পড়িয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আসিয়া মুমূর্ষু কন্ঠার ওষ্ঠাধরে একটু করিয়া চরণামৃত দিতেছেন, পুনরায় ব্যাকুলচিত্তে ছুটিয়া গিয়া বিগ্রহের সম্মুখে আছড়াইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার গুরুদেব বৈকুণ্ঠদাস বাবাজীর কুঞ্জে সংবাদ পাঠানোয়, তিনি আশ্রমের একজন বৈষ্ণবী সেবাদাসী পাঠাইয়া দিয়াছেন, রোগিনীর শুক্রবার জন্ত। সে মথুরা জেলার যুবতী। বাংলা ভাষা ভাল বুঝিতে পারেনা। শুক্রবা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নাই। অসাড়প্রায় রোগিনীকে পিপাসায় জলদান এবং বৈকুণ্ঠদাস বাবাজীদত্ত কবিরাজি বড়ি ও ঠাকুরের চরণামৃত সেবন করাইতেছে। রোগিনীর শয্যা ও বস্ত্রাদিতে উপযুক্ত পরিচ্ছন্নতার অভাব বিমলবাবুর চোখে পড়িল।

ব্যাপার দেখিয়া বিমলবাবু সমস্ত সবিতাকে আনিবার জন্ত মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। রেণুর অবস্থা যে শঙ্কাজনক তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সংবাদ শুনিয়া সবিতা যেন পাথর হইয়া গেলেন।

বিমলবাবু তাঁহাকে লইয়া কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে ছুটিলেন।

মোটরে উপবিষ্টা সবিতার মুখের পানে তখন তাকানো যায়না। তাঁহার মধ্যে যেন একটা বিরাট ঝড় শুরু হইয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ বাদে, জলমগ্ন ব্যক্তির জায় ছট্‌কট করিয়া বন্ধ শাসে। একবার সবিতা বলিয়া উঠিলেন,—উঃ, গাড়ীখানা এত আস্তে চলছে কেন ? আমাদের নিখাম বন্ধ হয়ে আসচে যে !

বিনলবাবু দুই একটি সময়োপযোগী কথা কহিলেও, তাহা সবিতার কানে পৌঁছিল না। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, দরাময়, তোমরা তো অনেক দেশের অনেক ইতিহাস পড়েচ। নিজের না তার সম্ভাবনার এমন দুর্গতির কারণ হয়েছে, পড়েচো কি কোথাও—

বিনলবাবু নিরুত্তর রহিলেন।

পথে একজায়গায় একটি কূপের সামনে মোটর থামিল, ব্যাডিয়েটরে জল ভরিয়া লইবার জন্য। পথিপার্শ্বে দূরে কৃষিজীবীদের কুটার হইতে বালকগণের কাতরকন্দন ধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

সবিতা আচমকা ভীষণ শিহরিয়া উঠিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো, কী হোলো ওদের ? ওয়ে কান্নার শব্দ,—না ?—শুনতে পাচ্চ কি ?—

বিনলবাবু সবিতার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, ও কিছু নয়। ছোটছেলে এমনিই কাঁদচে বোধহয়। কিন্তু, তুমি যদি এমন নার্ভাস হয়ে পড়ো সবিতা, কী করে সেখানে রোগীর শুশ্রূষার দায়িত্ব নেবে ?

সবিতা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, আমি একটুও অস্থির হইনি। যেটুকু হয়েচি, সেখানে গেলে—তাকে একবার বুকে পেলে আমার স-ব ঠিক হয়ে যাবে। এই পনেরো বছর আমার বুকের ভিতরটা খালি হয়ে রয়েছে যে। করুক সে আমার উপরে রাগ, করুক ঘৃণা। করবারই তো কথা।...যতাই বা কিছু ভুল করে থাকিনা, তবু আমি তার না।, এটা কি আর সে বুঝবেনা ? নিশ্চয়ই বুঝবে, দেখে নিও। ও

তার রাগ নয়, ঘৃণা নয়, মার ওপর অভিমান ! মেয়ে যে আমার ছোটবেলা থেকেই ভারি অভিমানী !

বিমলবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া অন্তরিকে তাকাইয়া রহিলেন ।

যথাসম্ভব দ্রুত তাঁহারা বৃন্দাবনে ব্রজবাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন ।

বার্তা সম্মুখে দড়ির খাটিয়া ও গেরুয়াধারী বৈষ্ণবদল দেখিয়া বিমলবাবু শঙ্কিত নেত্রে সবিতার পানে তাকাইলেন । স্থির ধীর মুখের 'পরে আর সে চাক্ষুশ ও উদ্বিগ্ন ব্যাকুলতার লেশমাত্র নাই । সেখানে গাঢ় বিষমভাষ অথচ অতিশয় কঠিন একটি যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে । বিমলবাবু চমকিয়া উঠিলেন । মনে পড়িল, সর্বপ্রথম যেদিন তিনি সবিতাকে দেখিয়াছিলেন, সেদিন সবিতার মুখে এই রকম আশ্চর্য্য কঠিন, অথচ নিগূঢ় বিষাদ-ব্যঞ্জক ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন ।

সবিতা এতটুকুও অস্থিরতা প্রকাশ করিলেননা । মোটর হইতে নামিয়া বাসার ভিতরে চলিয়া গেলেন । সত্য শোকাহত ব্রজবাবু অশ্রু-ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন—এসেচো নতুন-বো ! এঁরা সব ব্যস্ত হয়েছেন রেগুকে নিয়ে যাবার জন্য । আমি বলেছি, তা' হয়না । যার ধন সে আসুক, তারপরে তোমরা যা' খুসি কোরো । তোমার গচ্ছিত সামগ্রী আমি রাখতে পারলান না, হারিয়ে ফেললাম ! আমাকে মাপ করতে পারবে কি ?

সবিতা কথা कहিলেননা । কম্পিত অধর প্রাণপণে দাঁতে চাপিয়া নির্ঝাঁকমুখে অপরিচ্ছন্ন মেঝের একপাশে বিছানাটির পানে তাকাইয়া রহিলেন । ভূমিতলে মলিন শব্যায় মলিন বস্ত্রাবৃত নিম্পন্দ শীতলদেহ পড়িয়া আছে । আশে-পাশে জলের লোটা, চরণামৃতের ভাণ্ড, কবিরাজী বড়ি, থল ছুড়ি—প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ।

সবিতা অগ্রসর হইয়া কম্পিত হস্তে শবদেহের মুখ হইতে মলিন

আচ্ছাদন উঠাইলেন। অতিশয় শীর্ণ, বিবর্ণ, রক্তলেশহীন মুখ, কালিমালিপ্ত নিম্নলিত চক্ষু গভীরভাবে কোটরে বসিয়া গিয়াছে। চোয়ালের ও কণ্ঠার হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। তৈলহীন রুক্ষ কেশের রাশি ঘাড়ের নিচে স্তূপীকৃত। স্নেহময়ী জননীর চোখে যেন সে মুখে বিশ্বের গভীরতম দুঃখ ও বেদনার নিগূঢ় ছায়া স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

মৃত্যু-মলিন মুখখানির পানে বহুক্ষণ অশ্রুহীন নিম্পলক-নেত্রে তাকাইয়া থাকিয়া সবিতা অবনত হইয়া কন্ঠার তুব্বার শীতল ললাটে গভীর চুম্বন আঁকিয়া দিলেন।

শববাহীদল অগ্রসর হইয়া আসিলে আপনা হইতেই তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রজবাবু তাঁর আজীবনের সংযম সাধনা ও ভগবদ্ভজ্ঞান ভুলিয়া—আজ শিশুর মায়ের কাঁদিয়া মাটাতে লুটাইয়া পড়িলেন, মাগো,—তোর এ বুড়ো বাপকে কার কাছে রেখে গেলি—

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া কলিকাতা হইতে রাজু আসিয়াছে।

তার পাওয়া গিয়াছে ব্রজবাবুর কনিষ্ঠা পত্নী অর্থাৎ রেণুর বিমাতা আসিবে। সম্ভবতঃ ব্রজবাবুর ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্তই তিনি আসিতেছেন, এইরূপ সকলের অনুমান।

এই কয়েকদিনেই সবিতার দেহে আকস্মিক বার্দ্ধক্যের চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চোখে-মুখে অনিদ্রা ও গভীর শোকের ঘন কালি পড়িয়াছে। শুষ্ক ওষ্ঠাধরে লাবণ্যের লেশমাত্র নাই। মুখভাব অসাড়।

শোকজীর্ণ ব্রজবাবুর সেবার সকল ভার সবিতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া অহোরাত্র সেই কাজের মধ্যেই আপনাকে নিমগ্ন রাখিয়াছেন।

দরের মেঝেয় বসিয়া সবিতা কুলায় করিয়া খই বাছিতেছিলেন,

রক্তবাবুর নৈশাহারের জন্ত। পরণের শাড়ীখানি অতিশয় মলিন, স্থানে স্থানে তেল, ঘি কালি ও কাদার দাগ লাগিয়াছে। মাথার সীঁথি এলোমেলো অম্পষ্ট, রুক্ষ কেশপাশে ছোট-ছোট জট বাঁধিয়াছে।

বিনলবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সবিতা মুখ উচু করিয়া বলিলেন, তুমি আর কতদিন এখানে থাকবে ?

বিনলবাবু বলিলেন, যতদিন বলা।

সবিতা বলিলেন, ছোট-গিন্নি আসছেন আজ। বোধহয় তাঁর আসার আগেই আমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। কি বল ?

বিনলবাবু বলিলেন, সে তুমি নিজে বিবেচনা করে দেখ।

সবিতা বলিলেন, কিন্তু, আমি যে বুঝতে পাচ্ছি, তারা একে শাস্তিতে থাকতে দেবেনা। এখান থেকে একে কলকাতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার নতুনবেই আসছে।

বিনলবাবু বলিলেন, তাতে ক্ষতি কি ?

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয়না। এই অসহায় অক্ষম রোগে শোকে জীর্ণ মানুষটাকে তার শেষ আশ্রয় বৃন্দাবন থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার নত নিষ্ঠুরতা আর হতে পারেনা। অন্তরের টান থাকলে ছোট গিন্নি এইখানে থেকেই স্বামীর সেবা করতেন।

বিনলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

সবিতা বলিলেন, এই ধূলোময়লার দেশে তোমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে পাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও। আমি এইখানেই র'য়ে গেলুম।

বিনলবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

বিনলবাবু চলিয়া যাইতেছিলেন, পিছন হইতে সবিতা ডাকিলেন,
—শোনো,

